শ্রেষ্ঠ গল্প

জয়া মিত্র

দি সী বুক এজেন্সী
২০১এ, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট, কলকাতা- ৭

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৬১

দি সী বুক এজেন্সী-র পক্ষে ২০১এ মুক্তারামবাবু স্ট্রিট, কলকাতা- ৭
থেকে জয়ন্ত সী কর্তৃক প্রকাশিত এবং কমলা প্রেস, ২০৯এ বিধান সরণি,
কলকাতা- ৭ থেকে মুদ্রিত।

নবনীতা দেবসেন
প্রিয় সহযাত্রিণীকে

সূচি

উন্নয়ন ও ঘরের লক্ষ্মী ৯
চক্রবৎ ১৮
একজন যশোদাদি ৩৩
কুরুক্ষেত্রের আগে ৪৪
দেশভ্রমণ ৫৩
ঘৃণার সমস্যা ৫৯
অমরলতা ৭০
অস্বচ্ছ ৯২
তাম্রসরস্বতী ১০০
সূর্য ও শাদাপাখিটি ১০৭
দিনগুলি ১১৬
খেয়া ১২৪
ছকের বাইরে ১৩৩
স্বজন বিজন ১৪৫
পুরনো বাসন ১৫৭
শেল্টার ১৭১
সহযাত্রিণী ১৮৩

উন্নয়ন ও ঘরের লক্ষ্মী

সকালে ঘুম ভাঙলেও উঠতে যেন আর ইচ্ছে করে না উষালতার। ইচ্ছে মানে কি আর মনের ইচ্ছে। মনের ইচ্ছের কথা বুঝবে বা ভাববে এমন সময় না পেতে পেতে মনের ভেতরে যেন আর কোন ইচ্ছেই নেই। শরীরের ইচ্ছে হয় না, উঠতে চায় না শরীব। সারাদিন একটার পর একটা ছ'টা বাড়ির বাসনমাজা কাপডকাচা ঘরমোছা, দুটো বাড়ির আবার বাগানে জল দেওয়া, একবাড়ি ছাড়া আর বাকি সব কটারই মসলা পেশা—সারাদিন কোন মতে একরকম চলে। কিন্তু রাত্রে একবার গা এলিয়ে দিলে শরীর যেন সারাদিনের ব্যথাগুলো টের পায়। সেই ব্যথার শরীর আর সকালবেলা উঠতে, আবার একটা ঘষটানি খাওয়ার দিন শুরু করতে চায় না। কোলের কাছ ঘেঁষে সম্রাট শুয়ে আছে। রোগা কোলপোঁছা ছেলে, সারাদিন একা একা ঘরের উঠোনে নিজের মনে খেলে বেড়ায়—ঘুমন্ত মুখখানা দেখলে মনে বড় মায়া লাগে। মায়ের গায়ে মিশে শুয়ে থাকে। তার ওপরে মিঠুন। এটাও রোগা, তার ওপরে আবার লম্বা হয়ে উঠেছে। সম্রাটের বয়স পাঁচ পুরো হয়ে গেছে, এখনও রাত্রে মায়ের গা একটু না চাটলে তার ঘুম আসে না। ঘ্যানঘ্যান করবে, কাঁদবে—কিন্তু সব পাট চুকিয়ে উষালতা এসে না শোওয়া পর্যন্ত তার এই ছেলেটা কিছুতে ঘুমোবে না। এমন তো নয় যে শুলেই এক ঘুমে রাত কাবার, রাত্রি একটার সময়ে রাস্তার কলে জল আসে। তখন উঠে হাঁড়ি কলসি বালতি নিয়ে লাইন দাও, জল ধরো। তারপর আবার এসে শোও না হয় সাড়ে চারটে পাঁচটা পর্যন্ত। তবু তাতেও তারা আপত্তি করে না। সকাল আটটার জল তারা কেউ ধরতে পারত না—যারা বাবুদের বাড়ি কাজ করে। ঘরে থাকা ছোটছোট মেয়েরা কোনদিন বা ধরত, কোনদিন বা ধরতে পারত না। তার চেয়ে এই ব্যবস্থা ভালো—সকালে খানিক আর রাতে খানিক। এক এক দিন তো টিভিতে 'বই' দেখতে দেখতেই বারোটা বেজে যায়। আজকাল আবার এই একটা নেশা হয়েছে। তাও উষালতা যায় মাসে দশে। রাতের ঘুমটুকু না হলে সারাদিনের খাটনি আর খাটতে পারে না সে।

বাকি চার ছেলেমেয়ে যেমন তেমন করে মেঝের বিছানায় এখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তাদের মাথার কাছে, ওপাশের খাটিয়ায় সুবলও। তার মুখের পাশ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ে বালিশের একটুখানি জায়গা ভিজে গিয়েছে। আলো ফুটে উঠেছে বাইরে। উষালতা তার ছোট দুই ছেলেকে নিয়ে চৌকির ওপরে শোয়। তার বড় সাপের ভয়। মন্ত্র পড়ে ঘরের চারদিক অবশ্য বন্ধন করে দিয়ে গেছে তার জ্যাঠশ্বশুর।

আশপাশের পাঁচটা গাঁয়ের মধ্যে সে বড় গুণিন। তার মন্ত্র কেটে ঘরে ঢুকবে এমন সাধ্য কোন সাপের নেই, তবু ঊষালতা মেঝের বিছানায় শুতে পারে না। সে যখন তেরো বছরের মেয়ে, তার মাকে কেটেছিল সাপে। বর্ষার শুরুতে মহাজনের জমিতে ধান রুয়ানোর কাজ ছেড়ে দশটার সময়ে জলদি করে ঘরে ফিরে এল। বড় মেয়েকে ডেকে বলল,

—ভাতের হাঁড়িটো কড়াই দিয়ে চাপা আছে। বাইর করে ভাইবুনগুলাকে ডাইকে খাওয়ায় দে, নিজে খা। জলদি কর—

কিছু না বুঝেই ভাইবোনদের দু'জনকে ডেকে ভাত, সজনে শাক, কুচো মাছের ব্যঞ্জন খাইয়ে দিয়েছিল ঊষালতা। তখনও গাঁয়ে গাঁয়ে ক্ষেতে এমন পোকামারা বিষের চল হয়নি, ধানক্ষেতের জলে ঘুঘি পেতে এক এক মুঠো কুচো মাছ পাওয়া যেত। বর্ষার সেই ব্যঞ্জন তেঁতুল দিয়ে রাঁধত মা। তো সেই খাবার তারা খেতে খেতেই, মা ঘরের দরজার কাছে শুয়ে পড়েছিল। বলেছিল,

—ঊষি রে, সাপ কাইটেছে আমাকে, আমি আর বাঁচব নাই। টুকু জলদি জলদি খাঁয়ে লিয়ে আমার পাশটিতে আসে বস বিটি—ভাত ছাড়ে উঠো নাই মা, আমি মইরলে উ ভাতটো খাতে পাবি নাই। হাঁড়িটো ফেইলতে হবে—

ফেলা যাবে জেনেও আর ভাত মুখে দিতে পারেনি সেই তেরো বছরের ঊষালতা। তার কোলে সবচেয়ে ছোটভাই ছিল যার বয়েস তখন পুরো তিন বছরও হয়নি। তার আছাড় খেয়ে পড়ে কান্নার মধ্যেই মায়ের মুখ-চোখ কালো হয়ে গিয়েছিল। ফেনা ভাঙছিল মুখে।

মায়ের সেই মুখ জীবনে আর ভুলতে পারল না ঊষালতা। সেই মরামুখই সাপের ভয় হয়ে সারাজীবন তার সঙ্গে রয়ে গেল। কোনওদিন মেঝেতে ছেলেদের সঙ্গে বিছানায় শুলে চমকে আতঙ্কে ঘুম ভেঙে গিয়েছে।

পাঁচ বছর হয়ে গেল তবু এই ঘর যেন এখনও অভ্যাস হল না তার। কখনও একদণ্ড চুপ করে বসলে, কোনদিকে চোখ পড়লে বুকের মধ্যে যেন এখনও হু হু করে ওঠে ছেড়ে আসা পুরনো গাঁ-ঘরের জন্য। চাষিবাসী লোক তারা, কেমন সুন্দর ছড়ানো জায়গার মধ্যে ছিল তাদের গ্রাম। দুটি বাখলে ত্রিশ-বত্রিশ ঘর লোকের বাস—সবাই আপন লোকজন। নিজেদের দু'বিঘা জমি ছিল, আর বাকিটুকু অন্যের কি মহাজনের জমিতে ভাগে খাটা। কষ্টেমষ্টে চলে যেত। কিন্তু কী যে এক রাস্তা তৈরি শুরু হল, বর্ধমান নাকি দুর্গাপুর থেকে সব গাড়ি আর ট্রাক যেন একেবার সাঁই সাঁই করে বিহার কি দিল্লি পৌঁছে যেতে পারে। সে হোক, রাস্তা হোক, গাড়ি যাক তাতে তাদের কী! কিন্তু সেই রাস্তা যাওয়া ঠিক হল তাদের গাঁ দিয়ে, তাদের আশপাশের আরও ছ'টা গাঁয়ের ওপর দিয়ে। প্রথমে তো তারা বিশ্বাসই করেনি। কতখানি দূরে মাটি খুঁড়ে মাটি ফেলে ফেলে জমি উঁচু করার কাজ হচ্ছিল, সেখান থেকে সেই রাস্তা তাদের এসব গাঁয়ে আসবে কেন? যখন কিনা চারধারে এতবড়

খোলামাঠ পড়ে রয়েছে—সে তারা ভেবে পাচ্ছিল না।

তবু তাদের গ্রাম ছাড়তে হল। একা তাদের নয়—বুড়াবাটি জোড়গাছা বালিডি মোট ছয়টি গাঁয়ের লোককে। আর কেমনভাবে ছাড়া! হ্যাঁ, বলেছিল বটে লোকজনা যে সরকার এবারে মানবে না, গ্রাম ছাড়তেই হবে। তবু তাবা বিশ্বাস করেনি। প্রধানের কাছে গিয়েছিল কয়েকজনা মিলে। প্রধান ভরসার কথা কিছু শোনায়নি। বলেছিল,

—তোরা বসতি করছিস বটে, কিন্তু জমি তো তোমাদের লয, জমি গবমেন্টের। এত দিন গরমেন্টের দরকার লাগে নাই তোমাকে থাকতে দিয়াছে, এখন তার দরকার, তার রাস্তা যাবেক, তাহলে উঠতে তো হবেকই। যাদের হাতে দলিল আছে, টাকা ওণে দিয়ে যারা জমি কিনেছিল এখানে, ক্ষতিপূরণ পাবে—

শোন একবার কথা। বাড়িঘর করেছে বাপ-ঠাকুরদায়। হ্যাঁ গরিব বটে তারা ঠিকই, লেখাপড়ি মালিকানা নাই জমির, কিন্তু কতকাল ধরে যে বাস করে আসছে—তার কি কোন জোর নাই? এই গাঁ, এখানে কতদিনের তাদের ঘরদুয়ার, ভাঙলেই হল? সংসার নিয়ে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে তারা যাবে কোথায়? কেন ঐ যে অতবড় টাড় মাঠ পড়ে আছে, রাস্তাটা একটু সরিয়ে সেখান দিয়ে নিতে পারে না সরকার? সব জমিই যদি তার তো? সে সব কথা বলবে কাকে, আর কে শুনবে? ভরা ভর্তি বর্ষার মধ্যে মস্ত বড় বড় গাড়ি এনে ধাক্কা দিয়ে ভেঙে দিল তাদের ঘর। রাত্তির তিনটের সময়ে, সব লোক ঘুমে, তার মধ্যে দরজায় ধাক্কা দিয়ে সকলকে বলল,

—শিগগির ঘর থিকে বেরোও, নইলে চালচাপা হয়ে মরবে—

কী করে যে প্রাণটুকু নিয়ে ছুটে বাইরের মাঠে এসে দাঁড়িয়েছিল তারা! বাচ্চাকাচ্চা বুড়াবুড়ি সব নিয়ে সেই উর্পঝরণ বৃষ্টির মধ্যে। চারিদিকে কান্নাকাটি, মেঘের ডাক, বৃষ্টির আওয়াজ আর তার মধ্যে সেই দানোর মতো বিরাট যন্ত্রগাড়িটার ধাক্কায় তাদের ঘর গেরস্থালি ভেঙে পড়তে লাগল। সেই কাদার স্তূপের মধ্যে থেকে পরদিন হাতড়ে হাতড়ে একটি একটি করে বাসন, জামা মায় কাঁথাকানি যে যখানি পারল কুড়োল। কী বা কুড়াবে। একটি কত কালের ঘর, তার যে কত মায়া। কতদিনের কতো যত্নে একটি একটি করে রাখা গৃহস্থালির জিনিসকটি। আর নিজেদের ঘরবাড়ি। বাড়িই তো সংসার।

তারপরে সুবলের এই জ্যাঠার গাঁয়ে এসে ওঠা। বাকি সব যে যেদিক পারল গেল। সেই বৌ হয়ে আসা ইস্তক যাদের সঙ্গে ওঠাবসা তারা যে যেথায় পারল গেল—। একটি রাত্তিরের ধাক্কায় সব শেষ। জনমেও বুঝি আর দেখা শুনা হবে নাই।

কেউ গোবিন্দপুর কেউ শীতলা কেউ কালিপাহাড়ির দিকে। এই জোড়বাড়ি গাঁ একেবারে রাস্তার ধারে। কেমন চিপাচিপি। সামনে জমি আছে কি নাই, তার পরই রাস্তা। সারাদিন ধাঁ ধাঁ গাড়ি চলে সেইখানে। বুকের মধ্যে ধড়মড় করে। এক পাশে

পলিটেকনিকের টানা উঁচু দেওয়াল, অন্য দিকে আগে যেগুলি ফাঁকা মাঠ ছিল, বর্ষায় চাষ হত বলে বর্ষায় মাঠের আলে আলে আর শুকনো দিনে মাঠের মাঝখান দিয়ে হন্‌হনিয়ে হেঁটে হাউসিং-এর বাড়িগুলিতে কাজ করতে আসত তারা একঝাঁক মেয়ে বৌ, সেই মাঠগুলোতেও মাটি ভর্তি করে কত নতুন নতুন খুপরি খুপরি কোয়াটার হয়েছে। উষালতা মাঝে মাঝে ভাবে মাঠ ভরে কেবল বাড়িঘর আর রাস্তা করলে লোকে খাবে কি? ধান চালও তো লাগবে—ইটকাঠ কি খাওয়া যায়?

ক্ষেতে মাঠে কাজ করা অভ্যাস বদল করে কোয়াটারের বাবুদের বৌদিদের সংসারের কাজ শিখতে হয়েছে নতুন করে।

এখন নিজের কাজপাট সেরে এসে উঠোন ঝাঁট দিয়ে উনুনে আঁচ দেয় সে। বড় দুই ছেলে গোবিন্দা আর রাজেশকে ডাকাডাকি শুরু করতে হয়। ততক্ষণে সুবল মাঠ হয়ে আসে। ছোট মেয়েটা উঠে পড়ে। হাঁড়িতে জল আর চিনি ফুটতে দিয়ে উষালতা এবার শব্দ করে গেলাস কটি মেঝেতে নামায়। ওই শব্দ পেলে তবে তার ছেলেরা কাঁথা ছেড়ে উঠে আসবে। মুখে কোনমতে একটু জল দিয়েই চায়ের গরম গেলাসগুলো নিয়ে বসবে জড়ো হয়ে। সুবলও বসবে ওদের সঙ্গেই—যেন সেও, তখনকার মতো, উষালতার ছেলেমেয়েদেরই একজন। মনে মনে জিভ কাটে উষালতা—ছি ছি, গুরুজন হয় না! তার ছেলাপিলার বাপ—তাকে নিয়ে এমন কথা মনে করতে আছে? কিন্তু রোগা ছোট্ট চেহারার মানুষটা যেমন করে চায়ের গেলাসটি বাড়িয়ে গুটিসুটি হয়ে বসে থাকে তা দেখে ওই কথা তো মনে আসবেই। এখন দেখে কেউ বিশ্বাস করবে যে নেশা করে এসে এক একদিন রাত্রে কী হাঙ্গামা করে ওই লোক? ওই পাকানো চিমড়ে চেহারায় অত জোর যে তখন কোথা থেকে আসে তাও ভাবা যায় না।

অবশ্য এ পাড়ায় ঐটাই চাল। পুরুষমানুষরা হাতে দুটো পয়সা পেলেই নেশা করে আসবে আর শুরু হবে চিৎকার চেঁচামেচি। এমনিতে দেখ ভিজে ভালোমানুষ গোছের লোক এক-একটা—আর ভালোমানুষ না হয়ে ডাকাবুকো হবার জন্য যে দম চাই তা থাকবে কোথা থেকে? কী খাবার জোটে সারাদিনে যে দম হবে? কিন্তু সেইসব লোকই এক একদিন নেশা করে এসে কী মেজাজ! আর যত দাপট তো ঘরের বৌদের ওপর। যে বৌগুলোর বয়স কম, সাধ আহ্লাদ আছে, তারা এক একজন মারও খায় খুব। ঘরে শ্বশুর-শাশুড়ি থাকলে কি ছেলেপুলে ডাগর হলে অবশ্য তেমন বাড়াবাড়িটা হয় না।

উষালতার গোবিন্দ আর রাজেশ সেয়ানা হয়ে উঠেছে। এখানকার ওদের বয়সী ছেলেরা অনেকে রাস্তার ওপারের বিস্কুট কারখানায় কাজ করে, কিন্তু রাজেশ যেতে রাজেশকে তারাই তাড়িয়ে দিয়েছে, গেট পেরিয়ে ভেতরে যেতে দেয়নি। কারখানায় কাজ পাবে শুধু যারা এখানকার ছেলে—রাজেশরা তো বাইরে থেকে, ভিন্ন গ্রাম থেকে এসেছে। ওদের বয়সে বাবুদের ছেলেরা যখন ফিটফাট জামা পরে ব্যাগ কাঁধে

নিয়ে ইস্কুলে যায়, উষালতার সাত-আট বছরের ছেলেরা গাঁয়ের যে ক'জনার ছাগল আছে সেগুলো চরাতে নিয়ে যেত। নিজেদের গাঁয়ে থাকলে হয়ত এতটা লাগত না তার মনে। সেখানে তো সবাই অমন এইখানে চোখের সামনে উয়াদের দেখা যায় যে। কাজ সেরে বাবুদের বাড়ি থেকে পাওয়া ভাত তরকারি নিয়ে বাড়ি আসত উষালতা। তিনটের ভোঁ পড়ত নীল ফ্যাক্টরিতে, তারও খানিক পর খিদেয় জ্বলতে জ্বলতে বাড়ি ফিরত দু'জনে। সম্রাট জন্মায়নি তখনও, মিঠুন কোলে। বছর ফিরতে রাজেশকে গরু চরানোর কাজ দিল উমেশ গোপ। মাসে আট টাকা মাইনা আর ডেলি এক কোঁচড় মুড়ি। রাজেশ হুঁশিয়ার ছেলে, সাবধানে গরু নিয়ে যায় আসে। গোবিন্দা একটুকু বোকা। সুঝবুঝ কম। এক বছর বয়সে টাইফয়েড জ্বর হয়েছিল বলেই বোধহয়—ওর মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি কম। তাছাড়া গোবিন্দা হবার আগে নিজের পুরোন সংসারে সেবার বড় খাবার কষ্ট করেছিল উষালতা। একদিকে তখন দুই বছরের রাজেশ দিনরাত দুধ চাটে, না পেলে কামড়ে কেঁদে পাগল করে দেয়। তার ওপর সে বছর ফাগুনের শেষ থেকে আষাঢ় পর্যন্ত একছিটে বৃষ্টি হয়নি। পুকুর ডোবার তল পর্যন্ত ফেটে চাকলা চাকলা মাটি উঠে যাচ্ছিল যেন রোদে আর ঘামাচিতে মা বসুমতীর গায়ের চামড়া ফেটে খস্‌টা উঠে গেছে। শামুক গুগলির চিহ্ন নেই, মাঠের আনাচে কানাচে কোথাও একগোছা শাক নেই, যেখানে যা ছিল খিদের জ্বালায় সব শেষ করেছে মানুষ। তারপর, শুধু সজনে পাতা সিদ্ধ করে খেয়ে মানুষ ক'দিন থাকে? তার মধ্যে, গোবিন্দ আটমাসের পেটে, শাশুড়ি মরল। লোকে বলল বটে শোথ, আসলে তো সবাই জানে অসুখের নাম—না খাওয়া। হাত-পা ফুলে ঢোল, মাথার সমস্ত চুল পড়ে গেছিল, চোখে কিছু দেখে না। কেবল উষালতাকে ডেকে কাছে বসাত, পেটে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখত। সে মরতে জ্ঞাতি-কুটুমকে ভোজ দিতে হয়েছিল—ওই তিরিশ চল্লিশজনা লোকের ভাত ডাল কুমড়োর তরকারি, তেঁতুলের অম্বল। না করবার উপায় নেই, মরা মানুষের আত্মাটি মুক্তি পাবে না, অন্ধকার হলে এই কুলি বাখলের ধারে ধারে কেঁদে ফিরবে। কাজেই ধার ঋণ করে হলেও শ্রাদ্ধের ভোজ দিতেই হবে।

তো সেই ভোজের শেষে তেঁতুলের টক দিয়ে বেশ করে মাখা একবাটি ভাত খেয়ে উষালতার দাস্তবমি শুরু হয়েছিল। গাঁয়ের বুড়িরা পাঁচজনে ছুটে আসে সেই রাত্রে। তাকে উড়িপড়ি গাল দেয়, আবার তার মধ্যেই জন্মানো ছেলের নাড়িও কাটে। উষালতা বেহুঁশ ছিল। পরে সে কথা নিয়ে হাসাহাসি, সুবলের গ্রাম সম্পর্কে বোন শিবানী ঠাট্টা করে বলেছিল,

—ছেলের নাম দে ভাতকুমার।

ননদ ভাজ দু'জনেই হেসে কুটিপাটি হয়েছিল। তা, কী করবে সে! অতদিন পরে অমন ঝরঝরে সাদা ভাত তারই উঠোনে বসে অতগুলি লোক খেয়ে যাচ্ছে, সে আর লোভ সামলাতে পারেনি। নিজের ঘরে বসে দুবেলা পেট পুরে ভাত খাওয়া,

ছেলাপিলার সামনে ভাতের থালা ধরে দেওয়া—তার চেয়ে বেশি সুখ আর কীসে?

শীতের সকাল, তোলা জল কনকনে ঠাণ্ডা—চাষের বাটি কেটলি ধুতেই হাতের আঙুল কালায়। এদিকে রোদ উঠতে না উঠতেই আটটা। সব বাড়ির বৌদিদিদের মুখ গম্ভীর হবে, রাগ করবে দেরি হয়েছে বলে। তাদেরও তো আবার অফিস ইস্কুলের ভাত দিতে হবে। কিন্তু সেই বা আর কত শিগ্‌গির করবে? এই পাকা দেড়ক্রোশ রাস্তা হাঁটতে হয় তাদের, পথের পাথরের টুকরো ঠাণ্ডার দিনে পায়ের তলায় বিঁধতে থাকে যেন বিষের মতো। পা ফেলা যায় না মাটিতে। কয়েকজনের পায়ে হাওয়াই চটিও আছে, আবার উষালতার মতো দু-চারজনের খালি পা। তবু গ্রাম আর রাস্তার মাঝখানে সরু লম্বা জমিটুকু দেখে চোখ জুড়োয় তাদের সকলের। একফালি জমি, কিন্তু একেবারে ঝুলে পড়েছে ধানে। চলতে চলতে মুখে মুখে হিসেব করে তারা।

আজ বুধবার, মাঝে আর তিনটে দিন—রবিবার কাজের বাড়ি থেকে ছুটি নেবে বলা আছে সবারই। সকাল থেকে লেগে পড়লে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা পড়ার আগেই ধান উঠে যাবে মাঠ থেকে। কী বা ধান, কতটুকু জমি। হয়তো দেড়-দুমাসেরই খোরাকি হবে। কিন্তু তবু তো নিজেদের হাতে আজ্ঞানো ধান। পাঁচটা-ছটা বাড়িতে হাড়ভাঙা খাটনির পরও এটুকু করতে পেরেছে তারা। মরদরা মাটি ভেঙেছে, চাষ দিয়েছে। ছোট ছোট বাচ্চাগুলোও নিড়ানি দিয়েছে। আর মাঠও যেন হেসে উঠেছে এখন। এটুকু কি হত নাকি? মাঠের ধানের তিষ্ঠা থাকলে কী হবে। তাদের কারও জমি আছে এককাঠা? গাঁয়ের মেম্বার ভূপতিবাবু ব্যবস্থা করল বলে, তবেই তো। এসব সরকারি জমি। রাস্তার দু'পাশে ছড়ানো যতদূর ছাড়া জমি, সবই সরকারের—একথা তো প্রধানও বলেছিল। তবে সরকারের জমিতে রাস্তা ঘেঁষে দোকান চালা এটা সেটা আছে। তাছাড়া ভূপতিবাবুও তো সরকারেরই লোক। সব জায়গায় যত কিছু টিপছাপ তার ওপর পঞ্চায়েত মেম্বার বলে ভূপতিবাবু সই করে দিলে তবেই কেবল সে কথা সরকারের ঘরে চলে। তা সে রাস্তার ধারে দুটা জলের কল বসানোই হোক আর সদর হাসপাতালে রুগী ভরতি করাই হোক। সব জায়গায় উনার মান্যি খুব। সেই ভূপতিবাবু নিজেই ব্যবস্থা করেছে, গেল বছরও করেছিল। জোড়বাড়ি, বালিডি আর ধর্মনগর—এই তিনটি গ্রাম থেকে আসা যে লোকগুলি এই আনাচ আনাচে বসতি করে আছে, তাদের মাটির জন্য বড় আকুলি বিকুলি। তেমনই পঁচিশ ঘরকে ওই জমি চাষ করতে দিয়েছিল। ঘরপ্রতি দুশো টাকা করে নিয়েছিল অবশ্য, কিন্তু এধার-ওধার পয়সা না খাওয়ালে জমি দেখাশোনার লোকেরাই বা মানবে কেন? দুশো টাকা জোগাড় করা কি মুখের কথা। কী করে যে জোগাড় করেছিল সে তারাই শুধু জানে। এই নতুন গ্রামে এসে বাড়ি করা, সংসারের যৎসামান্য সামান কেনা—সেও তো করতেই হয়েছিল। তারপর তিন-চার বছর ধরে সেই ধার শোধ করা। গত বছর থেকে আবার এই দুশো টাকা করে—উষালতা, সুবালা, আশা,

শিবানী, প্রায় সকলেরই একটা না একটা বাবুঘর থেকে কারও পনের টাকা কারও কুড়ি টাকা কাটা যাচ্ছে এখনও। টাকা কাটা যাওয়া মানে পেটকাটা—আর কি? তা হোক তবু—আর তিনটে দিন পর এই মাঠভর্তি ধানও তাদের নিজেদের হবে, এই সুখের আশাতেই তো সবকষ্ট হাসিমুখে সয়ে নেওয়া যায়। ভূপতিবাবু বলেছে, কোন তাড়া নেই, নিশ্চিন্তে ধান তোল। গোড়া থেকে ওপর পর্যন্ত সব দিক বেঁধেছেঁদে কাজ করেছি আমি।

পঁচিশটা ঘর থেকে দুশো করে টাকা—কম নাকি!

গেল বছর বর্ষার শুরুটা ভালো ছিল, ভালো জল হয়েছিল। কিন্তু থোড়ে দুধ এসে যাবার পর আর জল হল না। মাঠ ভর্তি ধান 'চিটা' হয়ে গেল। এ বছর তেমন নয়, এ বছর মা লক্ষ্মী হাত উপুড় করে দিয়েছেন।

—কী লো তোদের পায়ে যে খিল লাগে যাছে, চলতে পাছিস নাই? পিছন থেকে খরখর করে ওঠে ভাদুর মায়ের গলা, বিটুদের ঘরে বাসন ধুয়া ঘর মুছা কইরে মাসিমার ঘরকে পহুঁচতে আমার দশটা বাইজে যাবেক। যে মুখ উয়ার বৌটোর—

—কইরবে কেনে নাই—তুমি না গেলে বুড়িটো শুকায়ে থাকে। উ ঘ্যাসের রান্না লিবে নাই আর উয়ার বৌ উনান ধরাইতে জানে নাই।

—বুঝ কেনে ইয়াদের! হামদের ঘরের পাঁচ বছরীটাও উনান ধরাইতে পারে।

দ্রুত পা চালিয়ে আসা দলটা হাউসিং কমপ্লেক্সে ঢুকে নানা পাড়ায় ছড়িয়ে যায়।

একবাড়ির বাসন, আরেক বাড়ির বাসন—মনটা উসপিশ করে উঘালতার। আজ গোবিন্দাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবার কথা ছিল। বারেবারে সুবলকে বলে এসেছে, কিন্তু তার কি খেয়াল হবে? অদ্ভুত লোকটা—ওই ধানের মরসুমে ক'দিন যা কাজ পেল করল, না হয়তো গলি-বাখলে কোথাও বসে রইল থুম ধরে। কত লোক বাজারে মোট বয়, মিস্তিরির জোগাড়ের কাজ করে—এর সে সব কিছু না। অথচ নিজেদের গাঁয়ে কত নাম ছিল সুবলের। মহাজন প্রত্যেক বছর সুবলকেই ডেকে পাঠাত। লোকে বলত সুবল মাঠে নামলে লক্ষ্মী এসে সেই মাঠে বসেন। কিন্তু কি হল তাতে? সেই যে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে আচমকাই ঘুম ভেঙে দেখল রাক্ষুসে মেসিনগুলোকে আর চোখের সামনে ঘরদুয়ার ধম্ ধম্ ভেঙে পড়া—লোকটা কেমন জবুথবু হয়ে গেছে। কোনও কাজ আর করতে চায় না উৎসাহ করে। এখানে এসে প্রথম প্রথম তবু হাউসিংয়ের সব কোয়াটারে বাগানের কাজ করত। মাটি কোপানো, ঘাস লতা ছেঁড়া, মাচাবাঁধা—কিন্তু চোখটাও যেতে বসেছে। আগাছা বলে ভালো গাছ তুলে দিয়েছে ক'বার। তা ভিন্ন, উৎসাহ নাই। মাসে দশে একদিন গেলে কি হয়। অন্য লোকে রোজ আসে, খোঁজখবর নেয় কাজের, তারাই পায়। একদিনের হাজরি পঁচিশ টাকা। অত বাড়ি—বাগানও আছে। কোথাও না কোথাও রোজই হয়। কিন্তু এর উৎসাহই নাই। অবশ্যি কাজ করলেই বা কী! যা পয়সা পাবে তার একটিও তো ঘরে আসবে না, সংসারেরও কাজে লাগবে না। সব দিয়ে আসবে ভাটিখানার দুয়ারে।

কিন্তু গোবিন্দটাকে তো আজ নিয়ে যেতে হত। ব্যান্ডেজ বদল করে দেবে কম্পাউন্ডার বাবু। ক'দিন দিয়েছিল হাউসিংয়ের রাস্তার মোড়ে চায়ের দোকানের কাজে। সুধবুধ কম ওই ছেলের, গুছিয়ে করতে পারে না, এক সস্‌প্যান ভর্তি চা হাত টলে গায়ে উল্টে গেছে। দোকানদারেরই কি বিবেচনা, অতটুকু ছেলেকে কি ওই জ্বলন্ত উনান থেকে সস্‌প্যান ভর্তি চা নামাতে দেয়? একটা পা পুরোটা আরেকটা পায়ের পাতা যেন সেদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। আজ একমাসের ওপর ভুগছে। সবাই বলেছিল, পোড়া রুগী হাসপাতালে দে। তুই সারাদিন ঘরে রহিস নাই, কে দেখ-ভাল করবে? কিন্তু হাসপাতাল ঢের দূর—কম সে কম দশ কিলোমিটার। তারপর সেখানে ধনুষ্টংকার কলেরা রুগীদের সঙ্গে একটা ছোট ঘরে একসাথেই রাখে পোড়া রুগীদেরও। ছেলে ভয়ে কেঁদেকেটে অস্থির। বাড়িতে নিযে এসেছে। কিন্তু এখনও পা শুকোচ্ছে না। হাঁটাচলা করতে পারে না। বারোটা ইঞ্জেকশন দিতে বলেছিল, মোটে পাঁচটা দেওয়াতে পেরেছে। যা দাম! একটা ধার পুরো শোধ না হতে কী করে আরেকটা ধার চাইবে? সেইজন্যই রবিবারে ধানকাটার ছুটি নেবে বলে আজ ছুটি নিতে পারল না। এতরকম ঝামেলা যদি নিত্যদিন লেগে থাকে সংসারে, কী করে কোনদিক সামলায় উষালতা? নিজের হাড়ভাঙা খাটনি, অসুখ-বিসুখ, ক্লান্তি—সে তো ভাবনার মধ্যে আনতেই পারে না। একদিন বেলা পর্যন্ত, যতক্ষণ শরীর চায়, পড়ে ঘুমোতে এত ইচ্ছে হয়। কিন্তু মরণকাল ছাড়া সে বোধ হয় আর কপালে ঘটবে না কোনদিন।

তিননম্বর বাড়ির ঘর মোছা শেষ করে ফিনাইল জলটা নালিতে ঢালবে বলে বালতি হাতে বাইরে এসেছিল উষালতা, দেখে শিবানীর মেয়ে আন্না রাস্তা দিয়ে দৌড়ে আসছে কী একটা বলতে বলতে। তার বুক ধড়ফড় করে ওঠে, হে ভগবান, গোবিন্দা—

ওপাশের বাড়ি থেকে সুবালা, তিনতলা দালান থেকে সিন্ধুবালা রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে তাড়াতাড়ি। ততক্ষণে আন্না আরও একটু কাছে চলে এসেছে, তার কথাগুলো এবার খানিকটা বোঝা যাচ্ছে।

—ও মাসি, শিগ্রি চলো গো, দ্যাখো ধানের কী সর্বনাশ হল।

প্রাণপণ ছুটেও তারা সবাই যতক্ষণে ধর্মনগরের কাছে রাস্তায় উঠতে পেরেছে ততক্ষণে গোটা ছয়-সাত ট্রাক ঘিরে লোকজন জড়ো হচ্ছে সবে। পাশের জমির অর্ধেক ধান চাপা পড়েছে পাথরকুচির নিচে। একের পর এক ট্রাক এগিয়ে আসছে, ডালা খুলে হড়হড় করে পাথরকুচি ঢেলে দিচ্ছে জান্ত ধানগাছের ওপর। চারপাশে জলজ্যান্ত সবাই দাঁড়িয়ে আছে হতভম্ব। সামনের ট্রাকটার পাশে, দূর থেকে বোঝা যায়নি, পুলিসের কালোগাড়ি। বন্দুক হাতে দুটো পুলিস দাঁড়িয়ে আছে তথায়। কারুর মুখে কোন কথা সরে না। সিন্ধুবালা বুড়ো হয়েছে বলেই তো নিজেকে আর সামলাতে পারে না। হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে উঠে ফরসা পোশাক পরা যে বাবু গোটা

কাজটার তদারকি করছিল, তার পায়ের ওপর গিয়ে পড়ে,

—ও বাবু, পাকা ধানগুলার বুকে পাথর কেনে চাপাচ্ছ গো? একেবারে তৈরি ধান।

বাবু ওর দিকে তাকিয়েও দেখেনা, পুরো জটলাটার দিকে তাকিয়ে ধমকে ওঠে,

—কারা ধান লাগিয়েছে এখানে? সরকারি জমি দখল করে? এ জমিতে ধান লাগানো না, বাড়িঘর করা বারণ, এ জমি দখল করা বে-আইনি জানো? সবসুদ্ধ আমি বেঁধে চালান দিতে পারি—

পুরো ভিড়টা থমকে যায়। সিন্ধুবালা উঠে দাঁড়িয়ে, এক দু-পা পিছিয়ে আসে। তবু কান্না থামাতে পারে না,

—ও বাবুগো, অপরাধ হয়ে গেছে আমাদের, নাক কান মলছি। তবু একটা দিন সময় দাও গো, পায়ে পড়ি, আমরা কাইটে লুব ধানটো। ধানের চালের ভাত তো তোমরাও খাও বাবু—ধান লক্ষ্মী, তার বুকে পাথর চাপাতে নাই। দয়া কইরে কেবল আইজকার দিনটি দাও বাবু--

এবার আরেকজন মোটামতো বাবু এগিয়ে আসে।

—সরকারের কাজ কি তোমাদের বে-আইনি কাজের জন্য আটকে বসে থাকবে? এখন ধান লক্ষ্মী—লক্ষ্মীকে নিজের ঘরে বসানোর কথা মনে ছিল না?

—এখান দিয়ে হাইটেনশান ইলেকট্রিক লাইন যাবে। এই এক-একদিনের খরচ জানো? তোমাদের মত লোকেদের বে-আইনি কাজের জন্য দেশের উন্নতির কাজ আটকে থাকবে? যত্তোসব—

খালি ট্রাকগুলো চলে যাচ্ছে। গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিস দুটো এগিয়ে আসে। একজন পিঠের বন্দুকটা খুলে মাটির ওপর দাঁড় করায়। হাত নাচিয়ে জটলাটাকে বলে,

—চলো হটো হটো—ভিড় ফরসা করো! নিজের নিজের কাজে যাও—

জটলাটা একটু সরে গিয়ে খানিক ছড়িয়ে দাঁড়াল। খালি ট্রাকগুলো চলে যায়, একইঞ্চি স্টোনচিপ্‌স বোঝাই নতুন ট্রাক এসে পৌঁছোতে থাকে। খড়খড় করে পাথরকুচি ঢালার শুকনো শব্দ হয়।

রবিবাসর প্রতিদিন

চক্রবৎ

শেফালি বৌদির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কী কাণ্ড, প্রায় সাতাশ বছর পর দেখা হল আর বৌদি চিনতে পারল, পেছন দিক থেকেও! মালিনীদের বাড়ি যাবার মুখে মনে হল বেশ বাদলার বিকেল, কটা গরম সিঙাড়া নিয়ে গেলে হত। শক্তিদা দারুণ পছন্দ করে এসব এলোমেলো খাবার। সেই সিঙাড়া কিনতে ওদের রাস্তার মোড়ের দোকানটায় ঢুকেছি, পেছন থেকে—

তুমি শ্রীরূপা না? বলে যিনি ডাকলেন আমি ফিরে তাকিয়ে প্রথমে তাঁকে একটুও চিনতে পারলাম না। একটুক্ষণ দুজনে মুখোমুখি দাঁড়ানো থতমত খাওয়া হাসি কেননা আমি যে শ্রীরূপা তাতে সন্দেহ নেই, ওঁকে যে চিনতে পারছি না সে কথাও স্পষ্ট। তারপর সেই কয়েক সেকেন্ড সময় ভেঙে ওই জোড়া ভুরু, সেই ভ্রূর ঠিক দুআঙুল ওপর থেকে শুরু হওয়া সুঘন চুল, নুনগোলমরিচের মত মেশানো তার রঙ এখন— যেন অন্য এক জন্মের পলিমাটি ভেঙে ওই ভ্রূ-কপাল উঠে আসে।

বৌদি শেফালি বৌদি

চিনতে পেরেছ?

কী কাণ্ড! তুমি এখানে—এতো বছর পর! তুমি কি এখানে থাকো এখন?

না না, এখানে শোভনা ফ্ল্যাট কিনেছে, ওর ওখানে আসছিলাম।

বুবুনের মেয়ের মুখেভাত, তাই নেমন্তন্ন করতে।

কী??

হ্যাঁগো।

এতবড় হয়েছে বুবুন? তার মেয়ের মুখেভাত!

কতো বছর গেল খেয়াল আছে?

অনেকদিন, তাই না? কেমন আছে ও বাড়ির সবাই? ওখানেই থাকো এখনো? পুরোনহাটে?

শোন কথা। আর কোথায় যাবো? নিজেদের ঘরবাড়ি ফেলায়?

মাসিমা আছেন এখনো? কেমন আছেন বাকি সকলে?

সে জানতে হলে আসতে হবে। শোন শোন এখন তুমি খুব বিখ্যাত লোক হইছ জানি—টিভিতে তোমারে দেখায়, কাগজে নাকি ছবি বেরোয় কিন্তু মনে আছে পাড়ার লোকে ভাবত বুবুন তোমার ছেলে! তার মাইয়ার মুখে ভাত, যাও ত' বুঝি

কেমন তুমি ধর্মমা।

দিন তাবিখ জেনে রাখলাম। কি জানি চলে যেতেও পারি! এখন আর সেই অনুভূতিটা হযত নেই, কিন্তু স্মৃতি আছে। ভোব হতে না হতে দরজা ঠেলতে থাকত, আধঘুমন্ত উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিযে এসেই শুয়ে পড়তাম আবার আর দুষ্টু দুর্দান্ত গোলগাল বাচ্চাটা নিজের মনে ঘরময় হামাগুড়ি দিত। টুল ধরেধরে উঠে দাঁড়াত কিন্তু টুলটা ছেড়ে দিয়ে নিজে থেকে বসতে পারত না। মেঝেয় বিকট শব্দ করে টুলটা ঠেলে নিয়ে ঘুরতে থাকত। খানিকক্ষণ একা একা এইসব করেই বিরক্ত হয়ে যেত সেই ছোট্ট থাপুসথুপুস বুবুন, চৌকির মাথার দিকে এসে নির্বিকারভাবে আমার ঝুলে থাকা চুলের গোছা কিংবা বেণী মুঠো করে ধরে উঠে দাঁড়াবে। তারপর ও হাতের নাগালে পাবে নিজের উদ্দিষ্ট জিনিসটা—আমার মুখ। ছোট ছোট আঙুলগুলো ক্রমাগত আমার নাকের মধ্যে, বন্ধ চোখের পাতার নীচে ঠোঁটের ভেতরে ঢুকে খোঁচাতে থাকবে, যতক্ষণ না শেষঘুমেব মাযাটুকু ছেড়ে উঠে পড়ি আর ওর সঙ্গে খেলায় যোগ দিই।

বাড়িটার সামনের দিকে একটা টানা বারান্দার ওপরে পাশাপাশি দুটো ঘরের সদর দরজা—একটা আমার একটা বাড়িঅলার, এক্ষেত্রে বাড়িওয়ালির। বড় ঘরটার এপাশে আর একটা দরজা, তারপরেও একই রকম লম্বা ঢাকা ভেতরের বারান্দা। এল্ অক্ষরের মত সেই বারান্দার এক মাথায় ছোট একটা রান্নাঘরে আমার ঘরকন্নার আয়োজন, অন্য মাথায় ওঁদের আরো ঘর, রান্নাঘর। রান্নাঘর থাকা সত্ত্বেও অবশ্য ওদের অনেকটা রান্নাই হয় বারান্দার একটা কোনা ইট দিয়ে ঘিরে নিয়ে তারমধ্যে। তোলা উনুনে। বড় ঘরের ভেতর দিকের দরজার গোড়ায় একটা মোড়া নিয়ে বসে থাকেন বাড়ির গিন্নি। বহুকাল হল বিধবা তিনি। শুকনো চেহারায় জড়ানো থান। দুয়েকের তিন ছেলে তিন মেয়ে এক ছেলের বৌ আর বছর দুই হল কে নাতি নিয়ে গোছানো সংসার তাঁর। বড় ছেলের বয়স পঞ্চাশের কোঠায়। বিয়েথা করেন নি। সকালে কারখানায় যান, সন্ধ্যায় কীর্তন ও কথকতা করেন, রাত্রে আফিং খান। একটি টগর ফুলের মালা পরে অনেক রাত্রে ফিরে মালাটি ভিতরের বারান্দায় একটা পেরেকে ঝুলিয়ে রাখেন। সকালে যতক্ষণ বাড়িতে থাকেন সেটি পরেই থাকেন। সাড়ে আটটায় স্নান করতে যাবার সময়ে সেটি খুলে দেন। তাঁর মা ডেকে বলেন,

নিতাই, এই মালাটা লইয়া যা, পুকুরের জলে ফেলবি। নিতাই একটু আনুনাসিক সুরে বলে,

এখন আমি পারুম না। আগে চা খামু, এখন আমার ঘুম ছাড়ে নাই।

আমার রান্নাঘর থেকে শুনি এই কথোপকথন। রোজ, সত্যি কথা বলতে কি এই কথাগুলো শুনে আমি বুঝতে পারি সাড়ে আটটা বাজল। নিতাই এবাড়ির ছোট ছেলে। তার যে কোন কথার তার মা একটু সমর্থন করেন। নিতাইয়ের বয়েস বছর পঁচিশেক হবে। স্কুল পাস করে সে আর পড়াশোনার দিকে যায়নি। কারখানার

খাটনির কাজও সে করতে পারবে না। মায়ের সে কোলপোঁছা ছেলে। সে তাই সকাল বিকেল পাড়ার রকে বসে স্কুলের মেয়েদের আওয়াজ দেয় বাকিটা বাড়িতে বৌদির স্বভাব আচার আচরণের খুঁত ধরতে মাকে সাহায্য করে। নিতাইয়ের মা অর্থাৎ বাড়িওয়ালিকে ডাকি মাসিমা বলে। নতুন বিয়ে হয়ে আসা কমবয়েসি মেয়ে আর কি বলেই বা ডাকবে। একসময়ে তাঁর স্বামী আসামে চাকরি করতেন, তাই ওঁর মুখে আসামের মাছপচানো 'এঞ্জি' দিয়ে রান্নাকরা আর কলাপাতা পোড়ানো ক্ষার দিয়ে কাপড় কাচার কথা শুনতে পাই। সঙ্গে সঙ্গে এও শোনা যায়, আইজকালের মাইয়ারা পাউডার সাবান শ্যাম্পু ছাড়া টাকার ছালায় বইয়া বিবিগিরি করে।

এসব কথা উনি আমাকে বলেন না কিন্তু যে স্বরগ্রামে বলেন তা বাড়ির যে যেখানে আছে সবাইয়ের কানে ঢুকতে পায়। মাসীমার সারাদিনের কথাবার্তার বারোআনাই রান্নাখাওয়া সম্পর্কে। অমুকটার সঙ্গে অমুকটা দিয়া খাইতে খুব সোয়াদ—এই 'খাইতে খুব সোয়াদ'টা মনে হয় ওঁর জীবনের মূল ধরতাই। সেই 'সোয়াদে'র অনেকগুলিই আবার মাছরান্নামূলক, ওঁর স্বাদের এখ্‌তিয়ারের বাইরে কারণ মাসিমা হলেন 'নিষ্ঠে কিষ্ঠে বিধবা'। কিন্তু আলোচনায় তো দোষ নেই নিশ্চয়ই। মাসিমার অন্য আলোচনার বিষয় হল 'করতে হয়' আর 'করতে নাই'। এই বিষয়টাতে ওঁর স্মৃতিশক্তি দেখে আমি মাঝে মাঝে থ' হয়ে থাকি।

শেফালি, আইজ বুধবার দিনে যে তুমি মাথা ঘষতে যাও আজ না শম্ভুর জন্মবার?

বৃহস্পতিবার কাউকেই মাথা ঘষতে কিংবা নখ কাটতে নেই, শনিবারও তাই। শুক্রবারটা ফাঁকা বটে, সন্তোষী মা তখনো বাজারে নামেন নি কিন্তু সেদিন অমাবস্যা থাকতে পারে কিংবা একাদশী অথবা 'ফাল্গুন মাসের তৃতীয় শুক্রবার পুত্রবতীকে ক্ষারস্পর্শ করতে নেই' সুতরাং দোলের আবিরঠাসা মাথায় শ্যাম্পু করবার জন্য শেফালিকে অন্তত পাঁচদিন অপেক্ষা করতে হবে।

শেফালি মাসিমার একমাত্র ছেলের বৌ। সে বাংলাদেশের মেয়ে, তখনো যাকে পূর্বপাকিস্তান বলত। খুলনা না যশোহরে তার বাবা-মা থাকেন। তাকে বিয়ে দিয়েছেন তার কাকা, শেফালিকে বলা যাবেনা, খুব সুন্দরী কিন্তু সে খুব পরিশ্রম করতে পারত। তার বরের নাম শম্ভু। শম্ভু তিন ভাইয়ের মধ্যম। তাকে বাড়ির মধ্যে বিশেষ দেখা যায় না। কারখানায় কাজ করে সেও, তবে দাদার মত তার ডিউটি নটা পাঁচটা নয়, সে শিফটে কাজ করে, দু-সপ্তাহ পর একসপ্তাহ করে তার নাইট ডিউটি থাকে। সেই সপ্তাহটা এই পরিবারের খুব আতঙ্কের সময়। প্রতি রাত্রেই ওঁরা নিশ্চিত থাকেন যে বাড়িতে ডাকাত পড়বে ও সকলকে মেরে ধরে ঘরের সব জিনিসপত্র কেড়ে নিয়ে যাবে। সেই 'সব জিনিসপত্র' মানে কয়েকটা চৌকি, ধোঁয়ায় কালচে হয়ে যাওয়া বিছানাপত্র আয়না আঁটা দেরাজ-এরকম দু-চারটে আসবাব ছাড়া আর তেমন কিছু আমার চোখে পড়েনি। টাকা দেখা যায়না ঠিকই কিন্তু ঘরে থাকলে তার আভা দেখা যায়। সে আভা এ সংসারে নেই।

রাত্রি দশটার আগেই ওঁরা ঘরে ঢুকে দরজাটবজা শক্ত করে বন্ধ করে দেন। বারান্দায় ছোট শোবার ঘরটা শম্ভুদা শেফালি বৌদির। শম্ভুদার নাইট ডিউটির কালে মেজবোন কল্পনা বৌদির সঙ্গে শোয়। বড়মেয়ে আল্পনার তখন বিয়ে হয়ে গিয়েছে। কল্পনার বয়েস সতেরো-আঠারো হবে, যদিও বাড়িতে সে ফ্রক পরে আর স্কুলে ক্লাস এইটে। সবচেয়ে ছোট শোভনা পড়ে ক্লাস নাইনে। পুরো বাড়িটার মধ্যে কেবল এই মেয়েটারই মুখে স্বাভাবিক বুদ্ধির একটু ছাপ আছে। একবার নাকি, তখনও শম্ভুদার বিয়ে হয়নি, আল্পনা কয়েকদিনের জন্য বাপের বাড়িতে রয়েছে সেরকম সময়ে, সবাই রান্নাঘরের সামনে বারান্দায় বসে রাত্রের খাওয়া শেষ করেছে। এই বারান্দার পর বাড়ির উঠোন, কুয়োতলা একপাশে স্নানের ঘর পায়খানা, অন্যধারে বাগান। বাগান মানে তিনটে কাঁঠালগাছ, একটা জবা, একটা টগর। একটা তুলসিমঞ্চের আশপাশেও কিছু তুলসির চারা। এই বাগান আর উঠোন ঘিরে আটফুট উঁচু পাঁচিল। তো, খেয়ে উঠে আল্পনাই প্রথমে হাত ধুতে কুয়োতলায় নেমেছে, হঠাৎ তার মনে হয়েছে বাগান থেকে টক্-টক্ করে কি একটা শব্দ হচ্ছে।

বাগানে জানি কিসের একটা শব্দ—এই কথাটা পুরো বলবার আগেই ভাইবোন মা সবাই চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে আর 'ডাকাত ডাকাত' বলে আর্তনাদ শুরু করেছে। আল্পনা প্রাণের ভয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। দরজায় অনেক ধাক্কাধাক্কি করার পর তবে একটুখানি দরজা ফাঁক করে ভাইবোনেরা তাকে ঘরে ঢুকতে দেয়। সাড়ে দশটায় কথকঠাকুর এসে দরজায় ঠেলা দিতে তবেই মাত্র তাদের মা উঠে দরজা খোলেন। কথকঠাকুর ততক্ষণে তাঁর গুলিটি সেবন করে ফেলেছেন বটে তবু তাঁরই ভরসায় মা, দুই বোন আর নিতাই এক বালতি জল নিয়ে রান্নাঘরের মধ্যেই হাতমুখ ধোয়। পরদিন সকালে সবাই মিলে অসমসাহসে বাগানে গিয়ে শব্দ রহস্যটাও ভেদ করতে পারে। 'যদি কখনো কাজে লাগে' বলে একবার শস্তায় দুটো পিচগলানোর ড্রাম কেনা হয়েছিল। বৃষ্টি শেষ হয়ে যাওয়ার পর রেনওয়াটার পাইপের জল সেই উল্টে রাখা ড্রামের ওপর ফোঁটাফোঁটা করে পড়ছিল।

এই গল্পটা হেসে গড়িয়ে পড়ে আমাকে বলেছিল নিতাই।

মাসিমার বাড়িটা আমাকে ঠিক করে দিয়েছিল কাজল—মাসিমার ভাইপো। আমরা নতুন সংসার পাতবার জন্য বাড়ি খুঁজছিলাম। কাজল আমার তখনকার সেই আশ্চর্য বন্ধুদের একজন যারা আমাকে দিদি বলে সমীহ করত আর একই সঙ্গে ভাবত আমার রক্ষণাবেক্ষণটাও ওদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আমাকে একেবারে অচল অপদার্থ বলে ওরা স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিল ফলে আমার সমবয়সী কিংবা দু'চার বছরের বড় এই বন্ধুজঙ্গল ওদের অনেকখানি চিন্তাভাবনা দিয়ে আমাকে ঘিরে রাখত। যে লোকটির সঙ্গে সংসার করা সূত্রে আমি এ বাড়িতে কিংবা এই শহরটায় এসেছি তিনি সারা সকাল খবরের কাগজ পাঠে ও বাজারে, সারাদিন অফিসে আর সারা সন্ধ্যা অর্ধেক রাত্রি বন্ধুদের সঙ্গে জরুরি আলোচনা সেরে ঘরে এসে এক

একদিন দেখতেন জনতা স্টোভে তেল নেই বলে কিংবা ইকমিক কুকারের কাঠকয়লা নিভে গিয়েছে বলে রান্না হয়নি। তাঁর নববধূটি উদ্বিগ্নভাবে পথের দিকে চেয়ে আছে কিংবা 'আমি কিছু পারিনা কেন' বলে কেঁদেকেটে একাকার হয়েছে। আমি সকালে খানিক রান্না করে খেয়ে ইস্কুল চলে যেতাম, বিকেলে ফিরে খুব সংসার করবার ইচ্ছায় ঘর গোছাতাম, রাত্রে কোনকোন দিন রান্না করতাম। কিন্তু সেই যে স্বপ্নে দেখা গিয়েছিল ফুলেব বাড়ি চকোলেটের ছাদ, প্রেমের বিয়ে করে আসা নায়ক নায়িকা কেবলই জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না দেখবে আর পিকরব শুনবে—তেমনটি কিছুই ঘটে ওঠেনি। তাববদলে চোদ্দ বাই ষোল ফুটের ঘর, ছয় বাই আট রান্নাঘর আর কল্পনা শোভনা নিতাই শম্ভুদা মাসিমা। সেই সময়েই আমার সেইসব জিগরি দোস্ত কাজল সঞ্চয়ন ভোলা আশিস পুঁটে। পরে শুনি ওরা নামকরা সব মস্তান, এখানাকার সবাই নাকি ওদের খুব ভয় করে। মস্তান আবার কি এইটুকটুকে ছেলে! আশিস চোখমুখ উজ্জ্বল করে এসে বলে,

বৌদি, আইজ মায়ে একখান মিষ্টি বানাইছিল, তুমিও বানাইতে পারবা।

কী রে?

এতটুকু চিনি জলে গুইলা বাটিতে থুইয়া দিল, আর লুচি চ্যাপটা চ্যাপটা করিয়া ভাইজ্জা সেই রসে ফালাইল—

দূর। ওরকম আবার কোন রান্না হয় নাকি!

হয় গো, আমি নিজে খাইলাম। তোমার জন্য দুইখান তুইলা থুইছিলাম, শ্যাষে খাইয়া ফেলছি—

দু'তিন দিন পর আশিসের মায়ের সঙ্গে দেখা হল এক জায়গায়। সেই অভিনব রান্নাটার ব্যাপারে তাঁকে শুধোতে বললেন।

পোড়া কপাইল্যা পোলা। মালপোয়া বানাইছিলাম।

কিন্তু ওরা আমাকে শহরের সব খবর এনে দেয়, আমার কাছে বিশ্ব ইতিহাস পড়ে। পুঁটে ক্লাস ইলেভেনের পরীক্ষায় পালবংশের ইতিহাস লিখতে গিয়ে লিখে এল বিগ্রহপালের দুই ছেলে, বড় ছেলের নাম বিক্রম পাল (এটা ওর নিজের নাম) ছোট সাগর পাল।

সে কি রে! এইসব লিখলি কেন? সে আমার উদ্বেগে সান্ত্বনা করে বলে,

স্যার সবটা পড়েনা বৌদি, শুরুটা আর শেষটা পড়ে খালি। আর কতটা লম্বা হয়েছে দেখে নম্বর দিয়ে দেয়। আমার তো কিছুই মনে পড়ছিল না, কিন্তু বাড়াতে তো হবে! ইতিহাসের কোশ্চেন অনেক লম্বা না হলে স্যার নম্বর দেবে না।

পুঁটে সবচেয়ে ছোট। সজল কারখানায় চাকরি করে। পনেরদিন কাজ করার পর দুদিন বসিয়ে দেয়। একমাস একটানা চাকরি করলে পাকা চাকরির অধিকার হয়ে যায় যদি তাই এই বিচিত্র নিয়ম। চাকরি আছেও বটে আবার নেইও বটে। সঞ্চয়ন আর আশিস একটা দুটো টিউশানি করে। সজলই তার পিসির বাড়িতে খালি ঘর

আছে, পিসি ভাড়া দিতে চান এই খবর আমাদের এনে দিয়েছিল।

বাড়িতে ঢুকবার পরদিন সকালে স্নান করতে গিয়ে দেখি মাসিমা আর তাঁর মেয়েরা কুয়োতলায় হাত-পা ছড়িয়ে বসে স্নানরতা।

বাথরুমটা কোথায় জিজ্ঞেস করি আমি। উনি বলেন, স্নানের ঘর তো আলাদা কিছু নাই, আমরা এই কুয়োতলাতেই স্নান করি।

সেকী! এরকম খোলা জায়গায় আমি স্নান করতে পারব না! মাসিমা বেশ অবাক হয়েই বলেন।

কেন? এইখানে আর লজ্জা কি? এখানে সবই তো মেয়েছেলে। লজ্জার এমন অপূর্ব ব্যাখ্যা আমি এর আগে কখনো শুনিনি। কাজেই একটু জোরের সঙ্গেই বলি, না। যেই থাকুক আমি এভাবে স্নান করতে পারব না। অগত্যা ওঁরা আমাকে একটা জায়গা দেখিয়ে দেন যেটা কুয়োর পাশে স্নানের ঘর হিসেবেই নিশ্চয়ই তৈরি হয়েছিল। তাতে চৌবাচ্চা ভর্তি কয়লা আর পুরো দেওয়াল জুড়ে মাচা তৈরি করে ঘুঁটে থাকে। একটা দিকে একটু জায়গা ওঁরা কাজ করে দেন, সেইটুকুর মধ্যে বালতি করে জল নিয়ে আমি স্নান করতাম তারপরের ছ সাত মাস।

তবে এসব কারণে ওঁকে আমার ওপর রাগ করতে বা বিরক্ত হতে দেখিনি কখনো। বরং শুনেছি পাড়াপড়শির কাছে প্রশংসা করতেন 'একটুও অহংকার নেই' বলে। এই গুণপনার সম্যক অর্থ আমি তখনও বুঝতে পারিনি এখনও না। 'এতগুলো পাশ' তো কেউ নিজের ইচ্ছেয় করেনা, ওটা জ্ঞান বয়েস থেকে বড় হয়ে ওঠার একটা নিয়ম। করতেই হয়। আজকে যাই জেনে থাকি তখন মনে করতাম মাথার চুল যেমন আপনা থেকেই লম্বা হয়, ইস্কুল কলেজের পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে শেষ করাও সেরকমই একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। আমি কিন্তু মাসিমাকে ভয় পেতাম।

মাসিমার সেই সারাদিনের 'খাইতে খুব সোয়াদে'র জগত থেকে মাঝে মাঝে আমাদের জন্য কিছু কিছু রান্না খাবার আসত। কোন তরকারি বা ডাল বা এরকম কিছু। তারমধ্যে কিছুটা স্নেহ আর খুব বেশি ঝাল থাকত। খেতে ভালো লাগত না। কিন্তু সেই যে মা বলেছিল 'আদরের ছাই হাত পেতে খাই' তাছাড়া সন্ধ্যাবেলা মাসিমা সুকুমারকে জিজ্ঞেস করবেন রান্না কেমন হয়েছিল। আমাকেও জিজ্ঞেস করবেন আলাদা করে। এতসব মিথ্যেকথা বলার থেকে খেয়ে নেওয়াই ভালো। এছাড়া ওঁর কোন কাজ বা সিদ্ধান্তের বিরোধিতা উনি পছন্দ করেন না, এটা বোঝা যেত। নিজের জানা জগত আর নিজের অভ্যস্ত চিন্তাভাবনার বাইরের সবকিছুকেই মাসিমা খারাপ বলে মনে করতেন আর সারাদিন ধরে সেসব কথা ঘোষণাতেও তাঁর কোন কসুর ছিলনা।

মাসিমার এক ভাই-বৌ ওই আশপাশে কোথাও থাকতেন, প্রায়ই সকাল নটা-দশটায় যিনি ননদের বাড়ি বেড়াতে আসতেন। তাঁদের দুজনের প্রধান, বলা যায় একমাত্র, গল্পকরার বিষয় ছিল এখনকার মেয়েদের নানারকম দোষ। সেইসব দোষের

মধ্যে প্রধান দোষ এখনকার মেয়েরা 'ভ্যাঠা', সমস্তক্ষণ মুখেমুখে তর্ক করে আর ফ্যাশন করে বেড়ানো ছাড়া এইসব মেয়ে-বৌদের আর কোন কাজ নেই।

—একটা কাজ জানে না, চার্তুমাস্যের ব্রত করব, তার যে জোগাড় দেবে সেইটুকু জ্ঞান পর্যন্ত নেই।

—মা বেটির শিক্ষার দোষ। তো তুমি ঘাড়ে ধরে শিখায়ে লও অখনে।

—সে কথা বোল না। একটি কিছু শেখাবার জন্য দুটো কথা বলব, সাতকাহন করে সেটি ছেলেব কানে ঢালবে। আর আমার তো জান পেটের শত্তুর—

এসব ক্ষেত্রে মাসিমা বেশ গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করবেন,

অই রকম অসৈরণ আমার ঘরে পাইবা না। কোন বাপের বেটি আছে যে আমাব উপর কথা কইব।

এইটে মাসিমার কথা বলবার একটা অদ্ভুত ধরন। ওঁর ভাই-বৌয়েরও। আমি রান্নাঘরে সাঁড়াশিটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অনেক সময় দরকার পড়লে ওঁরা আমাব থেকে সামান্য কোন জিনিস নিয়ে যান, সেই ভেবে বারান্দার ওপাশে বসে থাকা মাসিমাকে জিজ্ঞেস করলাম।

মাসিলা, আমার সাঁড়াশিটা দেখেছেন?

না গো মা, আমি তো দেখি নাই—

এদিক ওদিক দেখে দরজার পেছন থেকে সেটাকে আমি খুঁজে বার করি। পাঁচ মিনিট পরই মাসিমার জিজ্ঞাসা,

পাইলা তোমার সাঁড়াশি?

হ্যাঁ মাসিমা।

অখনে তোমার কোন মায়ে খুঁইজা দিল?

এক মুহূর্তে আমার কান গরম হয়ে উঠেছে। ছমাস হয়নি মাকে ছেড়ে এসেছি। এই মহিলার কোন ধারণা আছে আমার মা সম্পর্কে! উঠে দাঁড়িয়ে বললাম,

এরমধ্যে আপনি আমার মায়ের কথা বলছেন কেন? হয়ত আমার গলা একটু বেশি শক্ত হয়েছিল, মাসিমা একটু অবাক হয়ে বললেন,

অ বৌমা, তুমি রাগ করলা নাকি? আমি তো খারাপ কথা কিছু কই নাই! আমিতো ঠাট্টা করলাম।

এরকম ঠাট্টা আমি ভালোবাসি না।

পরে একসময়ে মাসিমা আবার আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন,

তখন তুমি রাগ করছিলা নাকি বৌমা?

রাগ করিনি, খারাপ লেগেছিল। ধরুন শোভনা কল্পনাকে যদি কেউ আপনাকে নিয়ে কিছু বলে ওদের রাগ হবেনা?

ভেবেছিলাম মাসিমা 'কার এতবড় সাহস' ধরনের কিছু একটা বলবেন। কিন্তু উনি খুব সহজভাবে বললেন,

সে তো শুনতে হবেই রে মা। শ্বশুরবাড়ি তেমন তেমন হইলে উঠতে বসতে মা-বাপের খোঁটা দেয়। হাঁ কথা না শুইলা কোন মায়া মানষে দিন গুজরাণ করে—

ওই কড়াধাতেব মহিলার কাছেও অপমানের ভাষা এমন সহজে গ্রহণযোগ্য দেখে খুব অবাক হয়েছিলাস, মনে আছে।

বুবুনের বয়েস প্রায় দুবছর অথচ মায়ের দুধ ছাড়া আর কিছুই চায় না ও। আমার যেন কিরকম অস্বস্তি লাগে। বাড়িতে দেখেছি মা পাড়াপ্রতিবেশির বাচ্চাদেরও সাত আট মাস থেকে একটু একটু শক্ত খাবার দিতে বলত। মা বাচ্চাদের ডাক্তার। এখানে শেফালি বৌদি বেলা তিনটের ওদের ওই তেলঝাল রান্না খায়, বেশিরভাগ দিনই সকালে কিছু খায়না। এগারোটার সময়ে, সকলে কলেজ স্কুল অফিসের পাট সারা হলে খানিকটা চা আর রুটি খায়। ওর লম্বা চেহারা কণ্ঠার হাড় বেরোন, চোখের নিচে কালি। এমন কোন জায়গা নেই শেফালি বৌদির যাকে 'বাপের বাড়ি' বলা যাবে। তাই ওর বিশ্রামেরও কোন জায়গা নেই, জোরেরও কোন জায়গা নেই। আমার কাছে এসে বসবার কোন প্রশ্ন ছিলনা, কোথাও বসবারই কোন প্রশ্ন ছিল না, সমস্ত দিনই ওর কাজ। তবু ফাঁকে ফাঁকে দু-এক মিনিট কখনো দাঁড়িয়ে কটা কথা হয়ত বলত। ওর ছেলেটাকে মাঝে রেখেই আমাদের একরকম প্রায় কথা-না-বলা গভীর বন্ধুত্ব হযেছিল।

আমি মাঝে মাঝে মাসিমাকে বলতাম বুবুনকে একটু একটু শক্ত খাবার দেওয়ার কথা। মাসিমা স্রেফ উড়িয়ে দিতেন,

না গো মা, এইটুকু বাচ্চার প্যাটে শক্ত খাবার হজম হয় না। এই যে দ্যাখ আমার নিতাই, এই কল্পনা শোভনা-সব পাঁচ বৎসর পর্যন্ত দুধ ছাড়া আর কিছু খায় নাই।

কল্পনা শোভনার কথা আলাদা কিন্তু নিতাইয়ের স্বাস্থ্য দেখলে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত দুধ খাইয়ে বাচ্চা বড় করা বিশেষ কোন উপকার আছে বলে বিশ্বাস হবে না। আমার মায়ের রেকমেন্ডেশান আবার মাসিমার মনে বিশেষ দাগ কাটেনা বুঝতে পারি। অথচ ছ মাসে বুবুনের চোখে পড়ার মত কোন ঝড় নেই দেখে আমার চিন্তা হয়। সুকুমার বলে অন্যের বাচ্চা নিয়ে বেশি মাথা না ঘামিয়ে দু বছর পার হয়ে গেল, বুবুন এখনও হামাগুড়ি দেয়, ধরে ধরে দাঁড়ায়। চারটে দাঁত বার করে গাল কাত করে হাসে। শেফালি বৌদি মাঝে মাঝে আমার কাছে গুনগুন করে ওর বুকে বুবুনের পেট ভরার মত দুই নেই আর। ছেলে রাত্রে ঘুমোয় না, খিদেয় কাঁদে। কিন্তু বৌদির এত সাহস নেই যে সে কথা শম্ভুদাকে বলবে। আর মাসিমাকে! শুনলেই বৌদির মুখ শুকিয়ে যায়।

শনিবার স্কুল থেকে ফিরে দেখি ভেতরের বারান্দায় হুলুস্থুল চলছে। বুবুনের বেশ সর্দি হয়েছে আগের দিন থেকে। সেদিন সকালে সর্দির জন্যই হয়তো বারবার নিজের নাকমুখ ঘষেছে, নরম গালে, নাকে—নখের আঁচড়ের দাগ। কল্পনা শোভনা স্কুলে, মাসিমা স্নান করতে গিয়েছেন দেখে বৌদি নিজের ঘরে খাটের ওপর বসে

বুবুনের হাতের নখ কেটে দিচ্ছিল। নিতাই চুপিচুপি বাগানের দিকের জানলা দিয়ে, সেটা দেখে নিজের মায়ের কাছে নালিশ করেছে। ব্যস্, শনিবার দুপুরে ছেলের নখকাটা! এই অপরাধের কোন ক্ষমা নেই। হলই বা সে প্রাণীটা ওর নিজের সন্তান, ছেলে তো সে এবাড়ির। তার বৌদি হচ্ছে পরের মেয়ে। ফলে, আমি দেখি বৌদি মাথা নিচু করে বারান্দার কোণে দাঁড়িয়ে আছে, মাসিমা বুবুনকে কোলে নিয়ে তারস্বরে অকথ্য ভাষায় বৌদিকে গালাগালি করছেন, তার বেশিরভাগটাই বৌদির মা-বাবার উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে 'ছোটঘরের মাইয়া' 'হাভাইতার বেটি' 'অলক্ষ্মী মাগী' এইসব শব্দে বাতাস ঘুলিয়ে উঠেছে। তার মধ্যে নিতাইয়ের একটু খোনা-খোনা একঘেয়ে গলা।

আমি ভাবলাম দুফর বেলা নিজের ঘরে কপাট দিয়া কি করে দেখি, তাই পা টিপা টিপা বাগানের দিকে গেছি, কাটান গাছের পিছনে লুকাইয়া দেখি অ মা—

নিজে যা করছেন তাতে বোধহয় মাসিমার মন ভরছে না। কল্পনা শোভনা নিজের মেয়ে, তাছাড়া তারা কদিন অন্যের বাড়ি চলে যাবে। ছেলেদের শাসন করার কথা অবান্তর। তারা 'হীরার আংটি'। বৌটাই একমাত্র প্রাণী যে পুরোপুরি মাসিমার অধীনস্থ। তাকে বকা-ধমকা তো সবসময়ই করা যায়, কিন্তু এরকম একটা জোরালো অপরাধ একেবারে হাতে নাতে ধরা পড়েছে। কি শাস্তি দিলে যে নিজের মনে শান্তি পান তা বোধহয় মাসিমা নিজেও ঠিক করতে পারছিলেন না। গালাগালি, ধাক্কা মেরে ঘর থেকে বার করে দেওয়া—এসবের পরও মাঝে মাঝেই শাসাছিলেন,

আসুক আজ শম্ভু—

আর এই কথায় শেফালি বৌদি যেন কুঁকড়ে যাচ্ছিল।

এখন আর মনে নেই কী যে হল সেই প্রশাসনে। নিত্যদিনের ছিল এরকম দমআটকানো ঘটনাগুলি। দেখতাম ওরই মধ্যে বাস করে একসঙ্গে যে অপমান করে আর যে অপমানিত হয়। কোনদিন বৌদিকে দেখিনি শান্তভাবেও কোন প্রতিবাদ করতে, অন্যায় কথায় আপত্তি করতে। ভাবতাম রাস্তার ধুলোয় জোরে লাথি মারলেও ধুলো মুখে উড়ে আসে, আহ্লাদী বেড়ালটাকে কোণঠাসা করলে সেও ভয়ংকরভাবে আঁচড়ে দেয়, মানুষ কেন তবে একটা কথাও বলে আপত্তি জানাবে না? মুখ বুজে সহ্য করে গেলে তো যে মারছে সে কোনদিনই সাবধান হবে না। সুকুমার রোজ আমাকে সতর্ক করতে থাকত,

তুমি কিন্তু ওই সব ব্যাপারে কোন কথা বলতে যাবে না।

কেন বলব না? মাসিমা অন্যায় করছেন।

করলে নিজের বাড়িতে করছেন। ওঁর ছেলেরা আছে, পাড়া প্রতিবেশি আছে, অন্যায় মনে হলে তারা বলবে। তুমি কিছু বলতে গেলে ওরা যদি ঝগড়া করতে আসে তুমি পারবে সামলাতে?

যুক্তিটা একেবারে অসার, পাড়াপড়শিদের বয়ে গেছে। মাসিমা তো দিনের মধ্যে

তিনঘণ্টা পাড়াব বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে বেড়ান আর কার বাচ্চার হপিংকাশি হয়েছে, কার মেয়েকে জামাই ঘরে নেয়নি, কাব ছেলে স্কুল যাবার নাম করে সিনেমা দেখতে যাচ্ছে, কে মানতের পুজো শোধ করেনি বলে অসুখে ভুগছে—এই সব তত্ত্ব-তালাশ করা, নানারকম সমাধান বাতলানো এই করে বেড়ান। ওঁর ছেলেদের কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো। তারা এসব ব্যাপারে মাথাই ঘামায় না। ঘরের বৌকে সামনে রাখতে হয়-এই হচ্ছে তাদের মত, সে কথা তারা বেশ জোবে জোরে জানায়ও।

কিন্তু এও সত্যি যে আমি ঝগড়া চেঁচামিচিকে খুব ভয় পাই। আশিসদের বলি মাঝেমাঝে থাকতে না পেরে। প্রথম প্রথম কাজলের সামনে চুপ করে থাকতাম, ওর নিজের পিসিমা বলে। দেখি ও নিজেই এত কিছু বলে নিজের মা পিসিমার সম্পর্কে। কোনদিন বলি,

তোমরা যখন বিয়ে করবে তোমরাও এরকম করবে নিজের বৌয়ের সঙ্গে?

আমি বিয়ে করব না, কিছুতেই না। আমার মা টিকে তো দেখই দিদি, সে পিসির এককাঠি উপর দিয়ে যায়। বৌদির দশা দেখে এত খারাপ লাগে যে আমি বাড়িতে থাকতেই চাই না।

তোমার দাদা? দাদা কিছু বলে না?

বলে বৌকে শাসনে রাখা ভালো। আর মায়ের খুব বাড়াবাড়িতে একটা কথা যদি বলেছে কোনদিন মা চেঁচিয়ে কেঁদে মাথাকুটে এমন কাণ্ড করবে যে পাড়ার লোক জড়ো হয়ে যাবে।

ওরা এই সব অশান্তিতে যেন খানিকটা অভ্যস্ত। নিতান্ত মারধর করা, খেতে না দিয়ে ঘরে বন্ধ করে রাখা এরকম কিছু না হলে গালাগালি খোঁটা দেওয়া—এগুলোকে তেমন মাথা ঘামাবার মত ব্যাপার মনে করে না। সুকুমারের মতই কাজল ভোলা ওরা আমাকে বারবার বলতে থাকত,

দিদি, তুমি ওর মধ্যে যেওনা। ওরকম সব বাড়িতেই হয়। কাজল অবশ্য আরো একটা কথা বলত,

দেখ না আমি একদিন পিসিকে জব্দ করি। তুমি কিছু চিন্তা কোর না।

একদিন ঘটলও কাজলের বুদ্ধিমত 'জব্দকরা'।

আমি ঘুম থেকে ওঠার একটু পরেই মাসিমার ঘরে কাজলের গলা পেলাম পিসিমা, মায়ে এইগুলি পাঠাইল।

কাজলের মা, মানে মাসিমার সেই ভাই-বৌ কয়েকদিন আসছেন না। শুনেছি তাঁর অসুখ হয়েছে। সকালের রান্না করতে করতে দেখলাম মাসিমা চৌকাঠের সামনে নিজের জায়গাটিতে বসে বাটিতে মুড়ি দিয়ে মেখে ভাই-বৌয়ের পাঠানো কাঁঠাল খাচ্ছেন আর নানারকম মন্তব্য করছেন।

দশটা এগারোটার সময়ে রোজকার মতই ভোলা কাজল আশিস এসেছে। সেদিন

আমরা ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব আর আমেরিকার মুক্তিযুদ্ধের মধ্যেকার সম্পর্ক পড়ব। রোজকার মতই মাসিমা নিজের উঠোনে কি একটা চিৎকার গালাগালি করছেন। বিরক্ত হয়ে আমি উঠে নিজের ঘরে উঠোনের দিকের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়েছি। দেখি ওরা তিনজনে নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করে খুব হাসছে। আমার চোখে চোখ পড়তে কাজল একমুখ হেসে বলে,

শুনছ দিদি?

কি?

পিসির পাঁচালি?

ও তো রোজকার। আমার আর ভালো লাগে না।

না না, আজ কি বলছে শোন না—

কান পাততেই কানে এল মাসিমার তীক্ষ্ণ গলা,

তেরাত্তির পোয়াবে না রে মুখে রক্ত উঠে মরবি নিবংশ হবি—হে মা শীতলা হে মা চণ্ডী তোমরা দেখো মা—

ওদের দেখি তিনজনেরই মুখ কৌতুকে চক্‌চক করছে।

কি রে?

পিসি কাকে শাপ দিচ্ছে জানো দিদি?

বৌদিকে।

না না—ওরকম কি আর নিজের বৌকে বলে? শাপ দিচ্ছে যে পিসির বাগানের কাঁঠাল চুরি করে খেয়েছে।

বাগানের কাঁঠাল? কে খেয়েছে?

পিসিই খেয়েছে।

তাহলে বকছেন কাকে?

শোননা—হেসে কুটিকুটি হয় ওরা, কাল রাত্তিরে পিসির বাগানে তিনটে কাঁঠাল নামিয়েছি আমরা। কেউ খাইনি এখনও, খালি একবাটি সকালবেলা পিসিকে দিয়ে গিয়েছি। জানি তো যখন দেখবে কি হবে, এখন দেখ ওই সব শাপগুলি নিজেকেই দিচ্ছে।

ভোলা বলে,

হ্যাঁরে সত্যি যদি তেরাত্তির না পোহায়, ভেদবমি হয়ে তোর পিসি যদি—

তুলবেই তো! পিসি এমন নিষ্ঠেকিষ্ঠে লোক, ওর কথা কি আর মিথ্যে হবে? পরশুই দেখবি—

কাণ্ডটা বুঝে আমিও হাসি খুব। কি বদবুদ্ধি! আবার খানিকটা দমেও যাই।

এই হল এদের 'পিসিকে জব্দ করা'!

অনেকদিন ধরে শেফালি বৌদি গুনগুন করে বলে—

তুমি একটু মারে বল না বুবুনকে এত দুগা ভাত দিবার কথা—

তুমি বলো না!

আমি! বাবারে। গলায় পাড়া দিব। তোমারে ভালোবাসে, তোমার কথা শুনতে পারে।

আমি খানিকটা অনিচ্ছা নিয়েই আলগা করে বলি দুএকবার। মাসিমা কান দেবার কোন লক্ষণ দেখান না। শেষে আমি একদিন এক প্যাকেট মাখন কিনে এনে মাসিমার সামনেই বৌদিকে দিই। বলি,

এটা দিয়ে বুবুনকে একগ্রাম করে ভাত খাইও। আমার ছেলে রোগা হয়ে যাচ্ছে। তুমি খারাপ গরু, দুধ নেই—

মাসিমা কোন আপত্তি করেন না। কোন দিন বৌদি ছোট একমুঠো ভাত টিপেটিপে চটকে খাওয়ায়, কোনদিন আমিই ওকে ধরে মাখন আলুসেদ্ধ দিয়ে একটু খাওয়াই। ছেলে বেশ আগ্রহ করে খায়, দিন সাতেক চলবার পর অসুখে পড়ল বুবুন। প্রচণ্ড পেটের অসুখ। বাড়িসুদ্ধ লোকের মুখ শুকনো। মাসিমা স্বভাবসুলভ কোন চেঁচামিচি না করেই বললেন,

আমি বারবার কই ছিলাম এত কচি পেটে শক্ত খাবার হজম হয় না। আমার সঙ্গে জেদ কইরা বৌয়ে পোলারে দুধ দেয় না। পোলা রোগা হইতে আছে কইয়া জোরজার ভাত খাওয়াইল।

আমি খুব অপরাধী হয়ে পড়ি। কেজানে, হয়ত মা খাওয়াবার মাপ জানে নিয়ম জানে, আমি জানিনা বলে—

পরদিন দুপুরে স্নান করতে যাবার সময় কুয়োর পাড়ে দাঁড়িয়ে বৌদি ফিসফিস করে বলে,

তুমি মন ছোট কইর না, তোমার কোন দোষ নাই। মায়ে বুবুনরে মাসীমার বাড়িতে লয়ে রুটি খাওয়াইছে। ছেলের পেট থিকা টুকরাটুকরা রুটি বাইর হইছে। আমি জানতাম। তিনির নিজের যেমন ইচ্ছা তার বাইরে কিছু করতে দিবনা কাউরে, তাতে ভালো হউক কি মন্দ—

সেই বুবুন।

আজ তার মুখে কোথাও আর সেই দুবছরের মুখের চিহ্ন থাকবার কথা নয়। এখন সে সাতাশ বছরের যুবক। বয়সের তুলনাতেও যেন কেমন উৎসাহহীন নিষ্প্রভ চেহারা। ফরসা। গোলগাল পরিষ্কার পরিপাটি। কেমন দুষ্টু-দুষ্টু মুখখানা ছিল ছোটবেলায়।

দুই হাতে টাইনা কতো চুল যে ছিঁড়ছস্—পরিচয় করাতে গিয়ে বৌদি এইসব কথা শুরু করলে সে একটু অপ্রস্তুত মুখ করে থাকে। আমিও খানিকটা তাই। শেষে 'দেখি ওইদিকে' গোছের আবছামত কি একটা বলে সরে যায়। সবচেয়ে স্বাভাবিক ব্যাপারেও কষ্ট পাওয়া মানুষের স্বভাব বলে আমার যেন কি একটা হারিয়ে ফেলার

মত একটু মন খারাপ হয়।

বাইরে থেকে দেখতে বাড়িটা একইরকম আছে প্রায় কিন্তু ভেতরে কিছু কিছু বদল হয়েছে। যেখানে বাগান ছিল সেখানে নিতাই আলাদা বাড়ি করেছে। কুয়োর পাশে ফাঁকা উঠোনে দোতলা বাড়ি তুলে দুটো তলা ভাড়া দেওয়া হয়েছে। ওপাশের পাঁচিল কেটে তাদের বেরোবার গেট বসেছে। যে ঘরটায় আমি ছিলাম সেটায় এখন মাসিমা নিজের বড় ছেলেকে নিয়ে থাকেন। পাশের ঘরে বৌদি শম্ভুদা। এই দুটো ঘরের মাঝখানে একটা দরজা ফোটানো হয়েছে। শম্ভুদা বাড়ি নেই, কারখানায়। আড়াইটার সময় ফিরবে মাসিমার বয়েস প্রায় আশি হয়েছে। ঠিক অথর্ব যাকে বলে তা নন, কিন্তু কথায় সেই তেজের চিহ্নও নেই। অবাক হলাম এত বছর পরও আমাকে চিনতে পারলেন দেখে। অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে— কোথায় থাকি, কি করি সুকুমারের খবর ছেলেমেয়েদের খবর। আমিও খোঁজ নিলাম—কাজল বৌ মেয়ে নিয়ে কলকাতায় থাকে। আশিস ভোলা বার্ণপুরেই আছে, কারখানায় চাকরি করে। পুঁটের মা মারা যেতে সে আর পড়াশোনা করেনি আরবে না কোথায় চলে গেছে চাকরি নিয়ে, অনেক টাকা মাইনে পায়। ভাবছিলাম কতো ভয় করতাম এই ভদ্রমহিলাকে, রান্না-খাওয়া-ছেলে মানুষ করাকে ফাপিয়ে তুলে যিনি নিজের আর নিজের পরিবারের অতগুলো লোকের পুরো জীবন ভাব ফেলেছিলেন। ভাবছিলাম, নিজের শরীরের মধ্যে অন্য একটি প্রাণের উপস্থিতি জানতে পারা মাত্র কি দ্রুত চলে যেতে চেয়েছিলাম এঁর ত্রিসীমানা ছেড়ে। এ বাড়িটাকে মনে হত দমবন্ধ করে দেওয়া একটা খাঁচা। তারপর কতদিন গেল। আরও শক্ত বাঁধনের, আরও সূক্ষ্ম চাতুর্যের কত খাঁচা দেখলাম। কতজনকে দেখলাম তারই মধ্যে মুখগুঁজে পড়ে জীবনপাত করতে, আবার ঠুক্‌রে ঠুকরে শিক ভেঙে ফেলেছে এমন দুচারজনকেও তো দেখেছি।

স্লিভলেস ব্লাউজ আর সিল্কের শাড়ি পরা একটি সুন্দরী বৌ আমাকে ডাকতে এল। শুনলাম সে নিতাইয়ের বৌ। সে চলে গেলে মাসিমা গুনগুন করে অনেক অভিযোগ করতে লাগলেন নিতাই নিতাইয়ের বৌয়ের নামে, শেফালি বৌদির নামেও। নিতাইয়ের বৌ 'ধিঙ্গি' 'ছোটঘরের মেয়ে'—গুরুজনেদের মান্যগণ্য করতে জানেনা। নিতাই 'বৌয়ের ভেড়ুয়া' হয়েছে, দিনান্তে একবারও মায়ের কাছে আসেনা। শেফালি মাসিমার কোনকথা গ্রাহ্য করেনা, কেউ শুনেছে মেয়েসন্তানের মুখেভাতে এত ধুম করতে! শম্ভু এখন অনেক টাকা কামায় তাই শেফালি 'অংখারে' ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। দুই বৌয়ে কথা বন্ধ। ভাবলাম, তাহলে শেষপর্যন্ত শেফালি বৌদি শিখল অবাধ্য হতে! বুঝতে পেরেছে যে চুপকরে মার খেতে থাকলে একসময়ে মাটিতেই মিশে যেতে হয়!

আমি খাব না কিছু সেটা ঢুকেই বলে দিয়েছি। মাসিমার কাছে গল্প করতে বসে যার জন্য আসা সেই কন্যাটিকেও দেখা হয়নি এখনো। গুমোট গরমের অস্বস্তি

যথাসাধ্য চেপে রেখে এবারে ওঠবার চেষ্টা করি। এত রোদ্দুর যে বিকেলের দিকে একটা ঝড়বৃষ্টি হতে পারে মনে হচ্ছে। এখানে বেশি দেরি করে তারমধ্যে পড়লে মুস্কিল। এবার শেফালি বৌদি নিজেই ডাকতে আসে।

কী গো, পুরোন লোকজনদের সঙ্গেই গল্প করবে নতুন লোক দেখবে না?

হ্যাঁ, চল চল বলে উঠেই পড়ি। মাসিমা কুঁজো হয়ে হয়ে উঠে ঘরের দরজা পর্যন্ত আসেন। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে খেয়াল হয় আমার সেকালের সেই রান্নাঘরে উনি ঠাকুরঘর পেতেছেন।

চওড়া পাড় দামি তাঁতের শাড়িতে ভারী সোনার বালায় দিব্যি গিন্নিবান্নি দেখাচ্ছে বৌদিকে। কোথাও আর সেই পুরোণ ভয়ের ছায়া নেই। পুরোণ লাবণ্যও অবশিষ্ট নেই অবশ্য কিছু তবু আমার বেশ ভালো লাগছিল বৌদিকে দেখে। হাত ধরে সে বড় ঘরে নিয়ে আসে। নানারকম শাড়িতে গয়নায় ঝলমলে অভ্যাস তাদের কথায় সেখানটা গম্‌গম্‌ করছে। তারমধ্যেই ভেতরের বারান্দায় টেবিল পেতে খাওয়ার ব্যবস্থা। সেখানেও ভিড়।

যার মুখেভাতে আসা সে কই খোঁজ করতে বৌদি এবার কাকে একটা জিজ্ঞেস করল। শোনা গেল তার মা তাকে ঘুম পাড়াচ্ছে। বৌদির মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল। উঠে ভেতরের দিকে গেল, আমিও গেলাম সঙ্গে সঙ্গে। সেই পুরোন ঘর, আজ থেকে ছাব্বিশ সাতাশ বছর আগে যেটা শম্ভুদা বৌদির ঘর ছিল। নিতাইয়ের বাড়ি উঠে এখন এঘরের জানলাটা একেবারে আড়াল হয়ে গেছে। দিনে দুপুরেও টিউব জ্বলছে। বৌদিদের সেই ইট দিয়ে পায়া উঁচু করে তলায় রাজ্যের জিনিস ঢুকিয়ে রাখা চৌকি নেই অবশ্য। তার বদলে ডবলবেডের খাট। তার ওপরে বসা-একটি প্রায় কিশোরী বয়সের মেয়ে। বড় বড় চোখ, ছোট কপালের লাল ভেলভেটের টিপ, গায়ের রঙটা চাপা। তার কোলে বাচ্চা। চেলির জোড়, হাতে বালা, গলায় হার এমনকি মাথায় টিকলি, এই যে আজকের উৎসবের মধ্যমণি তাতে ভুল হবার উপায় নেই। কিন্তু সে তারস্বরে কাঁদছে। অবশ্য তাকে দেখে আমারই প্রায় গরম লাগছিল। বৌদিকে দেখে মেয়েটি, স্পষ্টতই সে বুবুনের বৌ, খাট থেকে নেমে দাঁড়াল।

তুমি এখানে বইসা আছ কেন?

মামণি খুব কাঁদছিল তো—

কাঁদছিল তো ঠাকুমার কাছে দিয়ে আসনি কেন?

যাচ্ছি মা—তারপর মেয়েটি একটু দ্বিধা করে,

মা, এগুলো একটু ছাড়িয়ে দেব? ওর বোধহয় খুব গরম লাগছে—

বৌদি ওকে কথাটা শেষ করতে দেয় না। কঠিন গলায় বলে,

আমি জানি, ওইগুলি ছাড়ায়ে দিবার জন্য তোমার প্রাণ আইঢাই করতে আছে। আমি যখন থিকা বারণ করছি তখন থিকা মেয়েরে টিপাটিপ্যা কান্দাও। নিজে যেমন হাভাতে ঘরের মেয়ে সেইরকম ভাবনাচিন্তা। উৎসবের দিনে পাঁচটা লোক আসছে,

বাচ্চার গয়নাগাঁটিগুলি দেখবে—এইসব জ্ঞানগম্যির শিক্ষা তোমার মা-বাপ তোমারে দেয় নাই সে আমি খুব জানি—

বুবুনের বৌ মাথা নিচু করে মেয়ে কোলে বেরিয়ে যাচ্ছিল। বৌদি আবার তাকে ডাকল,

নবারের বেটির মত যাও কোথায়, এদিকে আস। এই মাসিমারে প্রাণাম কর। এ আমার মায়ের পেটের বোনের মত। বুবুনেরে কি ভালোই না বাসত।

আরও একটি মেয়েকে কোলে নিয়ে এই মেয়েটি আমার পায়ের দিকে নিচু হবার চেষ্টা করে।

শারদীয় লিপি

একজন যশোদাদি

বেশ পরিষ্কার সকাল হয়ে গিয়েছে, তবু যশোদাদি ঘুম থেকে ওঠেনি বলে, বোঝা যাচ্ছে যে মা একটু বিরক্ত হচ্ছে। কয়েকবার 'যশোদা উঠে পড়' করবার পরও কোন সাড়া না পেয়ে ছোটঘরটার দিকে গেল। গেল আর তক্ষুণি প্রায় ছুটে ফিরে এসে রান্নাঘরে ঢুকল। আলু রাখবার ঝুড়িটা হাতে করে আবার ফিরে গেল ব্যস্ত হয়ে, কেবল এই সামনের ঘরে যেখানে বসে আমি স্কুলের পড়া পড়ছি, সেখান দিয়ে যাবার সময়, আস্তে করেই, বলে গেল—

এঘরে আসবে না।

ব্যস। একবার যখন বলেছে আসবে না, তারমানে এই চেয়ার থেকে ওঠা বারণ হয়ে গেল। কী হয়েছে ওখানে? ঝুড়ি নিয়ে গেল কেন মা? তারপরই শুনি যশোদাদির হাসি। হাসতে হাসতে মায়ের শোবার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এঘরে এসে ঢুকছে,

—তুমি তো ডাকছ, কিন্তু আমি তো সাড়া দিতে পারছি না। বলব যে দ্যাখো কার সঙ্গে শুয়ে আছি।

চুপ কর—ছোট ধমক দেয় মা। তারপর দরজা দিয়ে বেরিয়ে ওপর তলার বীরুকাকুদের ডাকে।

ওরা সবাই একসঙ্গে নিচে আসে। বীরুকাকু, সুধীনকাকু ওদের দিদি মুকুপিসি। এবার সকলের ব্যস্ত কথাবার্তা থেকে ব্যাপারটা বুঝতে পারি। বীরুকাকুরা আবার লাঠি নিয়ে এসেছে। মা ওদের বলছে,

—বেলা হয়ে গিয়েছে, উঠছে না দেখে দুতিনবার ডাকবার পর আমি ওঘরে গিয়েছি। গিয়ে দেখি যশোদার বালিশের থেকে এক বিঘতও হবে না, কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে, ভাবো দেখি ঘুমের মধ্যে ওর হাতটাত লেগে গেলে কী হত—ততক্ষণে পাশের ফ্ল্যাটের তড়িৎকাকুও চলে এসেছেন। সবাই মিলে উত্তেজিত হয়ে কী কাণ্ড—আরে আজকাল—সেদিন তো আমার জুতোর মধ্যে—এইসব বলতে থাকে। যাকে নিয়ে এত ভয়টয় পাওয়া সে কিন্তু রান্নাঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে হেসেই যাচ্ছে। বলে,

—হোয় না, মলাই কাটদে না। মেরো সাথী ছ,

বীরুকাকু সুধীনকাকুই ছোটঘরে ঢুকে লাঠি দিয়ে সাপটাকে মারল। বাকীরা এই সামনের ঘরেই দাঁড়িয়ে থাকে, কেবল মা বীরুকাকুদের পেছন পেছন যায়। সাপ মারবার পরে সবাই দেখেছি সেটাকে একটা লাঠিতে করে ঝুলিয়ে নিয়ে যায়।

তারপর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। সেইসব করবার পর আজকে সকলে আমাদের ঘরে বলে চা খেল। যশোদাদি হাসি হাসি মুখে ট্রেতে করে চা নিয়ে এল। মা কীরকম বুদ্ধি করে ঝুড়ি চাপা দিয়ে রেখেছিল সাপটাকে সেসব নিয়ে কথা বলার পর বাড়ি যাবার আগে বড়রা ঠিক করে,

যশোদাটার একেবারে ভয় নেই। নেপালিরা সাপে ভয় পায় না।

জানি না। ওরাই ঠিক জানবে, বীরুকাকু সুধীনকাকু মুকুপিসিরা। ওরা এখানে অনেকদিন ধরে আছে। এটা তো ওদেরই বাড়ি, আমরা একতলায় ভাড়া থাকি। ওপাশে তড়িৎকাকু আর ওর অফিসের একজন থাকেন। তাঁর নাম সন্তোষ জেঠু। আমরা অবশ্য সকালে ঘরের বাইরে যাইনা, একেবারে আটটার সময়ে ব্যাগ পিঠে বেরিয়ে বাগানের গেট খুলে ন্যাসপাতি গাছের তলার পায়ে চলা সরু পথ দিয়ে একটু হেঁটে গিয়ে হিলকার্ট রোডে যাবার ঢালু পাথরবাঁধান রাস্তায় উঠি। কিন্তু বোন একদিন সকালে বাগান থেকে দেখেছে ওদিকের ঘরের মধ্যে সন্তোষ জেঠু খালি গায়ে হাত ছুঁড়ে ছুঁড়ে ব্যায়াম করছেন। আগে সন্তোষ জেঠুকে দেখলে আমাদের খুব ভয় করত, এখন কিন্তু হাসিও পায়।

যে সাপটাকে বীরুকাকু লাঠিতে ঝুলিয়ে নিয়ে গেল আজ, সেটাকে আমি চিনি। ওর গায়ের রংটা টুকটুকে লাল। গত পরশুদিন বাগানের নালির মধ্যে দিয়ে ও যাচ্ছিল। নালির সাদা সিমেন্টের ওপর লাল রংয়ের চলা দেখতে আমার এতো ভালো লাগছিল যে আমি চুপচাপ ওর পেছন পেছন যাচ্ছিলাম। কিন্তু শেষে ও হঠাৎ আমাদের বাথরুমের জল বেরোবার নালিটা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। কলের নিচে রাখা কাপড় কাচবার গামলার পেছনে চলে গেল। তখন অবশ্য খুব ভয়ই করেছিল, কিন্তু মাকে যদি এখন ডেকে পুরো কথাটা বলি তাহলে তো মা প্রথমে আমাকে মারবে। তাছাড়া বড়দের দেখেছি সাপ দেখলেই মেরে ফেলে। অথচ নিজেরাই আবার বলে কাউকে শুধু শুধু মারতে নেই। ওপাশে ঝরণার ধারে কাঠের ঘরে বুড়োবুড়ি বাজে আর বজু থাকে, ওরা বলেছে সব সাপের বিষ থাকেনা। বাজে বলেছে সাপরা মানুষকে খুব ভয় পায় বলেই কামড়ায়।

সেইসব সাতপাঁচ ভেবে আমি ওই ঝামেলায় পড়তে চাইনি। লাল টুকটুকে সাপের ব্যাপারে কাউকে কিছু বলবার কোন চেষ্টাই করিনি। পরদিন সকালে উঠেই দেখতে গিয়েছিলাম গামলার পাশে, তখন আর সাপটা ওখানে ছিল না। কাল সারাদিন ও তাহলে কোথায় ছিল কে জানে! রাত্রে হয়তো শীত করেছিল বলেই বিছানায় ঢুকতে এসেছিল, যশোদাদিকে দেখে ভয় পেয়ে আর এগোয়নি।

যশোদাদি আমাদের বাড়িতে থাকে। কার্শিয়াংয়ে ওর বাড়ি নয়, টুং-এর একটা বস্তিতে নাকি ওদের বাড়ি ছিল। ওর বাবাটাবারা এখনো সেখানেই থাকে, কিন্তু মা মরে যাবার পরে যশোদাদি পালিয়ে গিয়েছিল। কেন যে সেটা বুঝতে পারিনি। ও প্রথম যখন এসেছিল মায়ের কাছে বসে নিজের কথা বলছিল, আমি এ পাশের

টেবিলে পড়ছিলাম। তারপর যশোদাদি এত ফিসফিস করে কীসব বলতে লাগল যে আমি আর শুনতে পেলাম না। মনে হল ও কাঁদছে। ফিসফিস করে কথা বললে মা আমাদের খুব বকে, ওকে কিন্তু কিছু বলল না। বরং দেখলাম মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। যশোদাদি প্রথম প্রথম অন্য নেপালিদের মতই মাকে হুজুর বলতে, এখন কিন্তু মা বলে।

ওই একদিনই অবশ্য ওকে কাঁদতে দেখেছিলাম। নাহলে সবসময়ে এত হাসে যে এক একদিন মাকে বলতে হয়,

—যশোদা, লোকজনের সামনে অতো জোরে জোরে হাসতে হয় না। এক একদিন সন্ধ্যেবেলা আমাদের পড়া শেষ হয়ে গেলে যশোদাদি নাচে। আগে অন্য একটা বাড়িতে কাজ করত, সেখানে একটা বাংলা গান শিখেছিল। সেই গানটা খুব দুঃখের মধুর আমার মায়ের হাসি চাঁদের মুখে ঝরে, মাকে মনে পড়ে আমার মাকে মনে পড়ে। আরেকটা গানও জানত, সেটা ছিল হিন্দি। সেটা আমার এখন মনে নেই। যখন নাচত ওর গোলাপি ছোট ছোট হাত, গোলাপি গাল, খুব ফর্সা পা—এত সুন্দর দেখাতে যে আমি হাঁ করে দেখতাম। একটা নীল কাপড় পরত আর টুকটুকে লাল চাদর গায়ে দিত। বাড়িতে অবশ্য মায়ের দেওয়া মায়ের পুরোন চাদর গায়ে দিয়ে কাজ করত কিন্তু নাচের সময় সেই লাল চাদরটা পরবেই। পিসিও খুব সুন্দর দেখতে। যশোদাদির মত নয়, অন্য রকম। লম্বা বেণী বাঁধে, শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করে লম্বা হাতা জামা পরে। ইংরাজিতে কথা বলে মাঝে মাঝে।

পিসি যখন এসেছিল তখন একদিন আমার চেয়ারের পেছন দিকে রুণুকাকু আস্তে আস্তে করে পিসিকে বলছিল আই লাভ ইউ। ওই কথাটার মানে আমি জানি। আই লাভ মানে ভালোবাসি, ইউ মানে তুমি। যশোদাদি যখন একমনে নাচে তখন দেখতে এতো সুন্দর লাগে আমারে বুকের মধ্যে যেন কীরকম একটা হয়। আমিও ওকে খুব ভালোবাসি। কিন্তু ও তো ইংরেজি জানে না। আমারও ওকে খুব বলতে ইচ্ছে করছিল বলে কি আর করি বাগানের লাল রেলিংয়ে চক দিয়ে লিখে রেখেছিলাম আই লাভ ইউ। তাই নিয়ে যা কাণ্ড! সুধীনকাকু সেই লেখাটা দেখে আমার মাকে, বীরুকাকুকে আরো সবাইকে ডেকে দেখিয়েছে। সবাই কি রকম রেগে রেগে কথা বলছিল, আর ওরা কিনা ওটা বাইরের কেউ এসে মুকুপিসির নামে লিখেছে। যশোদাদির কথা কারো মনেই পড়ল না। আর যদি মুকুপিসিকেও লিখত তা হলেও বা ওরকম রেগে যাবার কি! মুকুপিসি তো বীরুকাকাদের বোন, তাকে কেউ ভালোবাসলে কি ওদের ভালো লাগেনা? বড়োদের যে কী সব ব্যাপার! ভাগ্যিস আমাকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করেনি। করলে তো 'হ্যাঁ' বলতেই হত, আর সব বড়োরা রেগে যাচ্ছে এমন কাজ করে ফেললে মা নিশ্চয়ই ভীষণ বকত।

অবশ্য সব সময়ে যশোদাদিকে ওরকম ভালো লাগে না। ওর কিছুতে ঘেন্না নেই। কাদা পোকামাকড় কিছুতে না। বাগানের নিচের ধাপে যে জমিটা ঘাসটাস হয়ে

পড়েছিল, দুদিন ধরে সারা দুপুর সেটাকে পরিষ্কার করল। অবশ্য ঢকনি এসে জায়গাটা কোদাল দিয়ে কুপিয়ে দিয়েছিল। নেপালিরা সবাই ফর্সা হয়, ঢকনি কিন্তু কুচকুচে কালো। আমাদের বাড়ির পাশের ঝোরাটাতে যখন জল কম থাকে, ও মালপত্র পিঠে নিয়ে সেখান দিয়ে আসে। ঝোরার ওপাব থেকেই আমাদের কাউকে দেখতে পেলে একগাল হাসে আর কালো মুখে সাদা দাঁতগুলো ঝকঝক করে। ঢকনি দাজু আসলে রেলস্টেশনের কুলি কিন্তু বীরুকাকুদের বাড়ির মালপত্র এনে দেয়, অনেক কাজও করে দেয়। বীরুকাকুদের বাবা ট্রেনের গার্ড ছিলেন তো, ঢকনি দাজুকে ছোটবেলা থেকে চেনেন। আমার মা ঢকনিকেও ভালোবাসে। এলে খেতে দেয়। একটা সোয়েটারও বুনে দিয়েছে। ঢকনির গায়ে খুব জোর, পিঠের পাটিতে করে নিজের মাথার চেয়ে উঁচু মালপত্রও নিয়ে চলে আসে। তো ঢকনি দাজু সেই নিচের ধাপটা কুপিয়ে দিয়েছিল আর যশোদাদি, পিঠে বাঁধা ডোকোতে করে সমস্ত ঝোপজঙ্গল পাথরের টুকরো সব নিয়ে পাহাড়ের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে ফেলে দিয়ে আসছিল। মা ওই সিঁড়িটা দিয়ে স্কুল থেকে ফেরে। তখন যশোদাদিও বাড়ি চলে এল।

তারপর দিন শনিবার ছিল। মা আমাদের নিয়ে কুড়িটা সিঁড়ি নিচে সেই জমিতে গেল। দেখে আমরাও একেবারে অবাক। কিরকম ঝোপ ছিল এখানটায়, বিছুটি গাছ আর বেগুনি বেগুনি কার্পেট ফুলের গাছে ভর্তি। কয়েকটা কেমুনা ফলের গাছ আর সোনালি কাঁটা ভর্তি আকালু গাছও ছিল। কিচ্ছু নেই। একদম চাষকরা ক্ষেতের মত হয়ে গেছে। মা তিনজনকে তিনটে ভাগ করে দিল বাগান করার জন্য বোনের একটা আমার একটা যশোদাদির একটা। রবিবার সকালের খাওয়া আর পড়াশুনো শেষ করে নিয়েই তো আমরা দৌড়েছি আমাদের ক্ষেতে। আগের দিন রাত্রে মা মটর আর স্কোয়াশের বীজ ভিজিয়ে রেখেছিল, সেগুলো যশোদাদি বাটি করে নিল। মা বারে বারে বলে দিল যেন কিনারের দিকে না যাই। তাই আবার যায় কখনো! পড়লে একেবারে সটান ওই নিচে মিসেস খাতিদের বাড়ির চালে। বাব্বা!

আমরা সাবধানে একটা একটা গর্ত করে মটরশুঁটির দানা বসাচ্ছি, যশোদাদি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, ইয়ো ধরি লেউ

মটরদানা ভেবে হাত পেতে যেই নিয়েছি এতো বড় একটা কেঁচো। আমি তো ঘেন্নায় লাফিয়ে টাফিয়ে অস্থির আর ও কিনা মাটিতে বসে পড়ে হাসছে। এত নিষ্ঠুর যশোদাদিটা। জানে আমার ভীষণ ভয় লাগে! আর চমকে যদি আমি নিচে পড়ে যেতাম! বাড়ি গিয়ে মাকে বললাম, মা কিন্তু যশোদাদিকে কিছুই বকল না। উল্টে আমাকেই বলল কেঁচো খুব উপকারী, নিরীহ। ভয় পেতে নেই। এইসব।

এদিকে আবার যশোদাদি যেমন রোজ সন্ধ্যাবেলা আটা মেখে একটা কুমড়ো কি একটা হাঁস বানিয়ে থালা ঢাকা দিয়ে রেখে দেয়, একদিন সেরকমই একটা গেরু বানিয়ে রেখেছিল বলে মা বেশ রেগে গেল, বকল। বলল খাবার জিনিস দিয়ে নাকি

গোরু বানাতে নেই। আমাদের বাড়ি থেকে অনেক নিচে, চুয়াত্তরটা পাথরের সিঁড়ি নিচে মন্টিভিয়ট রোড। সেইখানে মায়ের স্কুল । আমরা স্কুলে চলে যাবার পর মা যায়, আমরা ফিরে আসার প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই ফেরে। যশোদাদি ঘরদোর সব ঝকঝকে করে গুছিয়ে রাখে। মা খুব খুশি হয় ঘর গোছানো দেখলে। ও খালি ঘর মোছেনা, জানালার কাচ পুরানো কাগজ আর কেরোসিন তেল দিয়ে মুছে বাতাসের মত করে দেয। মনে হয় কাচটা যেন নেই। টেবিলের মাঝখানে ফুলদানিতে ফুল রেখে এক দুটো ফুল আবার নিচে ঝরিয়ে দেয়। জানলার ওপর রাখা জিরোনিয়ামেব টবগুলোতে ফুল ফোটে। যশোদাদি সেওলোকে রঙ মিলিয়ে এপাশওপাশ করে রাখে। মায়ের সঙ্গে রান্নাঘরের সব কাজ করে দেয়। ওকে মা যা শেখায় সব শিখে গিয়েছে। ইস্তিরি করতে পারে, আমাদের স্কুলের টিউনিকে বোতাম বসাতে পারে, বিছানা তোলে। বুনতে শিখে নিজের জন্য একটা কার্ডিগান বুনছে। কেবল কিছুতেই পড়তে চায় না। মা সন্ধ্যেবেলা পড়তে বসালে একটু পরেই বলে,

আজ থুপরে নিদ লাগেক ছ, ভোলী পড়ছু। কিন্তু ভোলী, মানে পরে দিন আর পড়ে না। কিছু একটা কাজের ছুতো করে পালায়।

মায়ের শোবার ঘরের ভেতরে দিয়ে যে আরেকটা ছোট ঘর, যেখানে আমরা দু বোন ঘুমোই সেখানেই, খাটের পাশে মেঝেতে বিছানা করে ঘুমোয় যশোদাদি

বাবা এলে অনেকদিন পর যেন বাড়িতে একটা বেশ উৎসব লেগে যায়। মা বাড়ির লোক কিন্তু বাবা তো ঠিক তা নয়। বাবা যে কদিন থাকেন আমরা খুব ভালো হয়ে থাকি। মা স্কুলে ছুটি নেয়। ভালো ভালো কিছু রান্না করে যা বাবা ভালোবাসেন। অন্যসময়ে যারা আমাদের বেশি চেনা লোক তাঁরা তখন বাবার সঙ্গে গল্প করতে আসেন, খেয়ে দেয়ে যান। তড়িৎকাকুকেও মা নেমন্তন্ন করে। তড়িৎকাকু আমাদের বেশ ভালোবাসেন, অনেক ছবির বই এনে দেখান। তড়িৎকাকু তো ঠিক পাশের ঘরেই থাকে, ওরা আমাদের বাড়িতে এমনিতেই আসে। অবশ্য জেঠু একটুকম তড়িৎকাকু বেশি। একবার তড়িৎকাকুর বৌদি এসেছিলেন তখন একদিন আমাদের এখানে বেশ গান হয়েছিল। সেই কাকিমা গান করেন। ওঁর একটা ছেলে একটা মেয়ে দুজনেই আমাদের থেকে ছোট। ওরা বাইরে এসে খেলত না, কিন্তু সেইদিন সেই ছোট মেয়েটাও গান গেয়েছিল। সবার চেয়ে ভালো গান করে আমার মা। এমনি নিজের মনে কাজ করতে করতে গান গায়। খুব সকালে এক একদিন মায়ের গান শুনে আমার ঘুম ভেঙে যায়। যখন সবার সামনে বসে চোখ বন্ধ করে গান গায়, মায়ের মুখটা যেন কিরকম আলো আলো দেখায়। মনে হয় মা যেন আমাদের মা নয়, অন্য কেউ । সেইসব সময় আমার ভয় করে, আমি হাত বাড়িয়ে মাকে ছুঁয়ে ফেলি।

এবারে বাবার সঙ্গে এসেছেন বাবার খুব দূর দেশের বন্ধু নিকোলে। বেশ মজার

ব্যাপার। আমরা ওকে কাকাটাকা কিছু বলছি না, নিকোলে বলেই ডাকছি। প্রথমে আমার একটু লজ্জা লজ্জা করছিল, এত বড়ো একটা লোককে কী আবার নাম ধরে ডাকে! বাবা যশোদাদিকে দেখে অবাক। মাকে বলছেন—একে কোথায় পেলে? তারপর থেকে আবার ওর কথা বলতে হলে বলছেন তোমার নন্দিনী। নন্দিনী মানে মেয়ে, আমি আগেই শুনে নিয়েছি। নিকোলেও যশোদাদির সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে। সেটা অবশ্য খুব মজার। নিকোলে যশোদাদি মোটেই ইংরাজি বোঝে না। ইংরিজী বলে না, ও সুইডেন থেকে এসেছে ও যশোদাদিকে কেবল বলছে 'বিউটিফুল' আর যশোদাদি খালি হাসছে।

নিকোলে আর আমাদের সকলকে বাবা দার্জিলিং বেড়াতে নিয়ে গেলেন। আগেও দার্জিলিং এসেছি। যখনই আমাদের বাড়িতে কেউ বেড়াতে আসে, আমাদের দু বোনকে নিয়ে দার্জিলিং বেড়াতে যায়। কিন্তু এবারে বাবা আর মা আছে—ভীষণ ভালো লাগছিল। খুব ঘুরলাম সারাদিন। যশোদাদি ওর সেই নীল কাপড়টাই পরেছে, কেচে চক্‌চকে করে, আর লাল সোয়েটার। আজ ওর মুখটাও দেখাচ্ছে যেন আরো বেশি গোলাপি। দার্জিলিংয়ে আসবার আগে একটা হীল-তোলা কালো জুতো কিনতে চেয়েছিল, মা রাজী হয়নি। মা কখনো হীলতোলা জুতো পছন্দ করেনা। কিন্তু অন্য একটা মুস্কিল হল। দার্জিলিংয়ে এসে যশোদাদি খালি খালি হারিয়ে যাচ্ছিল। একে তো এখানে এত সীজনারদের ভিড় তার ওপর আমরা সব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখতে যাবার পথে হঠাৎ দেখি যশোদাদি সঙ্গে নেই। মা বারে বারে বাবাকে বলছে কী হবে! একটু দেখ না খুঁজে—

বাবা একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন, কোথাও হারাবে না। তাছাড়া জানেই তো আমরা তিনটের মেলে ফিরব। খুঁজে না পেলে ঠিক স্টেশন পৌঁছে যাবে। আমার তবু বড্ড মনখারাপ করছিল। কী সুন্দর আর কী বড় বড় ফুল বোটানিক্যাল গার্ডেনে—কিছু দেখতে পেলো না যশোদাদিটা কোথায় হারিয়ে গেল। হয়তো আমাদের কতো খুঁজছে। হোটেলে খেয়ে যখন আমরা ম্যালে এসেছি, সকাল থেকে মেঘ হয়ে থাকবার পর এখন হঠাৎ এভারেস্ট দেখা গেল বলে সবাই বেশ খুশি, তখন দেখি ওপাশের একটা রাস্তা দিয়ে যশোদাদি উঠে আসছে, একটা ছেলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে। ও আমাদের দেখতে পায়নি। আমি চিৎকার করে উঠেছি 'যশোদাদি' বলে। যশোদাদি চমকে এদিকে তাকিয়েছে। তারপর এগিয়ে এল। মা বকতে যাচ্ছিল, ও বলল আমাদের পেছন পেছন আসতে গিয়ে একটা পাথরে হোঁচট লেগে পড়ে গিয়েছিল। রাস্তার পাশে বসেছিল আমরা ফিরবার সময়ে সঙ্গে আসবে বলে। ভাগ্যিস ওর মাসি ওই রাস্তা দিয়ে আসছিল তাই ও কষ্ট করে কোনরকমে মাসির বাড়ি যায়, সেখানে মাসি খেতে দিয়েছে, পায়ে সেঁক দিয়েছে, এখন মাসির ছেলেকে নিয়ে ম্যালে আসছিল আমাদের খুঁজতে। বাবা যখন আমাদের সকলকে নিয়ে 'স্টেপাসাই' বলে একটা জায়গা দেখাতে নিয়ে চললেন, যশোদাদি বলল,

টাং দুখদৈ ছ—ওর পা ব্যথা করছে।

না এসে ভালোই করেছে, মনে হল আমার। 'স্টেপাসাই' নয়, আসলে একটা বাড়ি। তার নাম বাইরে লেখা আসে 'স্টেপ-এ্যাসাইড'। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বাড়ি, এখানেই নাকি উনি মারা গিয়েছিলেন। খয়েরি রঙের কার্পেট পাতা ঘরের মধ্যে অনেক ভারী ভারী চেয়ার। ফিরবার সময়ে ওপরে উঠতে উঠতে আমার আর বোনেরও পা ব্যথা করছিল। বাবা সঙ্গে আছেন সত্যি কিন্তু দার্জিলিংয়ে বড্ডো ভিড়। সীজনাররা গিজগিজ করছে চারিপাশে আর খুব চেঁচামিচি। নিকোলে অবশ্য ওয়ান্ডারফুল ডিলাইটফুল এইসব বলছিল, কিন্তু ওরও মুখ লাল হয়ে গিয়েছে, ও ঘামছিল। আমাদের দু বোনের হাত ধরে চড়াইটা উঠে এল।

এসে আবার মুস্কিল—যশোদাদি নেই। যেখানে বলেছিল সেখানে নেই। আশপাশেও নেই। মায়ের মুখ গম্ভীর। বাবা খুব চাপা গলায় রাগরাগ করে কী সব যেন বলছেন মাকে। স্টেশনে ফিরবার রাস্তাটা একটু মন খারাপ মতই হয়ে থাকল।

স্টেশনে অবশ্য যশোদাদি ছিল। ওর হাতে আমাদের গরমজামার ব্যাগ ছাড়াও একটা প্যাকেট। তার চেয়েও কাণ্ড, ওর পায়ে সেই স্ট্র্যাপ দেওয়া হীল উঁচু কালো জুতো। ট্রেনে বড়োরা, মানে মা-বাবা, খুব গম্ভীর করে রইল। যশোদাদিও আমাদের কাছে না বসে অন্য একটা সীটে বসেছে। কেবল আমি তুনা আর নিকোলে জানলার ধারে বসে পাইন গাছ দেখছি। বড়বড় ফার্ণের পাতা, ঝর্ণার শাদা ফেণা-ফেণা জল। বাতাসিয়া লুপ দেখে নিকোলে খুব খুশি। ওকে আমরা স্টেশনের নাম মুখস্থ করাচ্ছি ঘুম...সোনাদা...টুং। হোসেনখোলার পরই গোয়েথেলস্ স্কুল, সেন্ট জোসেফস তারপর হিলকার্ট রোড ধরে কার্শিয়াং স্টেশন।

সন্ধ্যার পর বাবা নিকোলেকে নিয়ে আমার আর তুনার শোবার ঘরে গল্প করতে চলে গেলেন, তখন মা যশোদাদিকে খুব বকছিল,

কোনদিন তো বলিসনি দার্জিলিংয়ে তোর মাসি থাকে। তোকে আমি ওরকম জুতো কিনতে বারণ করলাম, কেন কিনলি?

যশোদাদি বলল জুতো ও কেনেনি ওর মাসি দিয়েছে। শাড়িও দিয়েছে। ওর হাতের সেই ব্যাগটার মধ্যে নতুন জুতোর বাক্সে ভরা ওর পুরোন চটি দুটো ছিল আর একটা লাল জর্জেট শাড়ি। মা আমাকে রাগরাগ গলায় বলল—

শুতে যাও। বোনের পা ব্যথা করছে, টিপে দাও গিয়ে। আমার মনে হল যশোদাদির ওপর মা খুব রাগ করেছে। যশোদাদি ওর মাসিকে বলল না কেন যে ওরকম জুতো পরতে মা ওকে বারণ করেছে? লাল শাড়িটাতেও মা রাগ হয়েছে বোধ হয়। বেশি সাজগোজ করা মা ভালোবাসে না। যাদের মাথায় বুদ্ধি নেই তারাই বেশি সাজে। যশোদাদির বুদ্ধি আছে, তবু আমার মনে হল ও লাল শাড়িটা পরুক। কালো স্ট্রাপের চটিতে ওর ফর্সা পা কী সুন্দর লাগছিল। লালশাড়ি পরলে ওকে ঠিক রাজকুমারী মনে হবে। রাস্তার সব লোক হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকবে। আর

তখন আমি ওর হাত ধরে নিয়ে চলে আসব। সবাই অবাক হয়ে দেখবে ও খালি আমাদের নিজের লোক। রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম আমরা দূরবীণ দারায় সানরাইজ দেখতে গেছি। আমি যেন খুব ছোট আর যশোদাদি আমাকে কোলে করে রেখেছে।

কয়েকদিন পরই বাবা চলে গেলেন। ছুটি শেষ হয়ে যাচ্ছিল। বাবা মিলিটারির খুব বড়ো অফিসার কি না তাই বেশিদিন দূরে এসে থাকতে পারেন না। বছরে মোটে একবার আসেন, কোন কোন বার তাও পারেন না। বাবা চলে গেলে আমাদের সকলের খুব মন খারাপ হয়। বাড়িটা একদম খালি। মা আবার স্কুল যাচ্ছে, এই ক'দিন ছুটি নিয়েছিল। সবই ঠিকঠিক হচ্ছে আবার। কেবল যশোদাদি যেন কেমন পালটে গেছে।

ওপরের ঠাকুমা মাকে বলেন,

—যশোদা বাড়ি খোলা ফেলে দিয়ে সারাটা দুপুর কোথায় চলে যায়,

জিজ্ঞেস করলে বজু বলে

—ন রামরৌ কেটি ভয়ে কো। আমার খুব দুঃখ হয়। কেন এরকম 'ন রামরৌ' দুষ্টু মেয়ে হয়ে গেল যশোদাদি? কি হয়েছে ওর? নিচের লতায় কত স্কোয়াশ হয়েছে, ক্ষেতটাও শুকিয়ে এসেছে, ও দেখছেই না। মা শেষে ঢকনি দাজুকে দিয়েই পাড়াল। আমাকেও আর ভালোবাসে না। কোনদিন গালে ক্রীম লাগিয়ে দেয় না। খেতে বসার আগে নাচগান করে না। মা কিছু বললে বেশিরভাগ সময়ে চুপ করে থাকে আর মাঝেমাঝে মায়ের মুখের ওপর উত্তর করে। বিচ্ছিরি লাগছে আমার।

একটা বিশ্রী ব্যাপার হল। আগের দিন জ্বর হয়েছিল বলে আমি দুদিন ধরে শুয়ে আছি। দুপুরে খাওয়ার পর যশোদাদি বলল,

তুমি ঘুমিয়ে থাক, আমি একটু ঘুরে এক্ষুনি আসব। আমি বললাম না যেতে। বলল ফিরে এসে আজকে তোমাকে গান শোনাবো। চুল বেঁধে দেব। কিন্তু অনেকক্ষণ হয়ে গেল, ডুবে যাওয়ার পাহাড়টার দিকে চলে এসেছে সূর্য, তখনো যশোদাদি ফিরছে না। এক্ষুনি মা এসে পড়বে। খুব ভয় করছিল আমার। বাগানের গেটটা পর্যন্ত গেছি দেখি তড়িৎকাকুর ঘরের দরজা খোলা। অফিস যায়নি?

আমাকে দেখে তড়িৎকাকু উঠে এল। কপালে হাত দিয়ে দেখল জ্বর আছে নাকি! আমি জিজ্ঞেস করলাম যশোদাদিকে দেখেছে কি না। বলল এক্ষুনি এসে পড়বে। একটা নতুন বই দেখাবে বলে আমাকে ডাকল। ওদের ভিতরের ঘরটায় গিয়েছি তড়িৎকাকু হঠাৎ আমাকে শক্ত করে চেপে ধরে আমার হাতটা নিয়ে নিজের হিসি করার জায়গাটায় লাগিয়ে দিল। কী ঘেন্না করছে, আমি ছাড়াতে চেষ্টা করছি ততোই হাতটা শক্ত করে চেপে রাখছে। রেগে আমি ওর হাতে জোরসে কামড়ে দিলাম, তখন ছেড়ে দিল কিন্তু আমার হাতে ওর হিসি লেগে গিয়েছে। বমি আসছে আমার। দৌড়ে দৌড়ে ঘরে ফিরে বসে সাবান দিয়ে হাত ধুচ্ছি তখন যশোদাদি ফিরল।

আমাকে বারবার জিজ্ঞেস করছে কি হয়েছে। আমি ওর সঙ্গে একটাও কথা বললাম না। ওর জন্যই তো এইসব হল। তডিংকাকু এত বিশ্রী! কাকু না ছাই। বড়দের কখনো ধাক্কা দিতে নেই জানি। ওকে যে কামড়ে দিয়েছি যদি মাকে বলে দেয়? মা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? মা যখন ফিরে আমার মাথায় হাত দিয়েছে, খুব কান্না পেয়ে গেল। কাঁদতে দেখে মা বারবার জিজ্ঞেস করছে কী হয়েছে। বল্লাম পা ব্যথা করছে। না হলে তো মাকে বলতে হবে যশোদাদি বাইরে গিয়েছিল। আর তাহলে মা ওকে খুব বকবে।

কিন্তু শেষপর্যন্ত মাকে এত চিন্তা করাল। কয়েকদিন পরই আমরা স্কুল থেকে ফিরে দেখি যশোদাদি নেই। মা খুব গম্ভীর হয়ে রান্নাঘরে কাজ করছে। টেবিল বিছানা আলনা দেখে মনে হল ও আজ কোন কাজ করেনি। মা আমাদের খেতে দিল। নিজে চা খেল। রাত্রের রান্না বসাল। সূর্য ডুবে বাইরে অন্ধকার হয়ে গেছে। খুব শীত পড়েছে। তবু যশোদাদি এলো না। মাকে একবার জিজ্ঞেস করলাম,

মাস বীরুকাকুদের কি বলবে যশোদাদিকে খুঁজে দেখতে? মা কেবল বলল,

পড়তে বোসো গে যাও।

যশোদাদি এল পরদিন সকালে। সেই লালশাড়িটা পরেছে। কানে বড়বড় সোনালি দুল পরেছে। চুলগুলো খুব উস্কোখুস্কো। মা দরজা খুলে ওকে দেখে বলল,

তোমার জিনিসপত্র নিয়ে যাও, তুমি আর এখানে থাকবে না। ও মায়ের মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে বলল,

আমি জিনিস নিতেই এসেছি। আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি। একজন আমাকে বিয়ে করবে। তারপর আমরা কলকাতা চলে যাব।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা বইখাতা নিতে গিয়ে দেখলাম যশোদাদির শ্লেট খড়ি সহজপাঠটা পড়ে রয়েছে। অনেকদিন ধরেই যশোদাদি আর লেখাপড়া করে না, ওগুলো ওখানেই থাকে। কিন্তু মাঝেমাঝে শ্লেট নিয়ে ছবি আঁকত। ওঁরা তো জানেই না যে যশোদাদি ওদের ফেলে চলে গেছে। আর আসবেই না।

মা কিছুই বলেনি কিন্তু জানি মায়েরও খুব মনখারাপ, ওতো মাকেও মা বলত। কতদিন সেই মায়ের হাসি গানটা করত। যদিও ওপরের ঠাকুমা এসে মাকে বলছিলেন,

—আমি তো তোমাকে আগেই বলেছিলাম—

যশোদাদির পর অন্য একজন কাজ করবার জন্য এল আমাদের বাড়িতে, তার নাম ইয়াংকি। সে ঢকনি দাদুদের পাড়ায় থাকে। তার সঙ্গে আমার একটুও ভাব হয়নি। তখন আবার আমি বড় হয়ে পড়েছি। জাঙ্গিয়ার ভেতর থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। আমি তো জানতে পারিনি মা বলে দিলেন। এও বললেন এখন থেকে আমি বড় মেয়ে হয়ে গেলাম, আর ছুটোছুটি করে খেলা, লাফিয়ে লাফিয়ে ঝোপঝাড়ে কি

যেখানে সেখানে ওঠা বসা বন্ধ। খুব বিচ্ছিরি লেগেছিল আমার বড় হতে। পেটে এত যন্ত্রণা মনে হত মরে যাব। স্কুলে বাস্কেটবল খেলার জন্য সবাই ডাকে, যাইনা। তুনাকেও বলতে পারিনা। লজ্জা হয়, ভয়ও করে। আমি একটুও চাইনি বড় হতে। একদিন আর না পেরে মাকে জিজ্ঞেস করলাম,

মা যতোদিন বাঁচব ততোদিন কি এরকম হতে থাকবে? মা বলল চল্লিশ বছর বয়স হলে ঠিক হয়ে যাবে। রাত্রে শোবার আগে রোজ খুব মন দিয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি,

ঠাকুর কাল সকালে উঠে যেন দেখি আমার চল্লিশ বছর হয়ে গেছে।

এই সবের মধ্যে একদিন বাথরুম আর রান্নাঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ইয়াংকি দাঁত বের করে হেসে বলল,

তোমার গা নোংরা হয়ে গেছে? আমারও হয়েছে। প্রথমে বুঝতে পারিনি। তারপর খুব রাগ হল। বললাম,

আমার কিছু হয়নি। তুমি যাও। ও তবু দাঁত বের করে বলল, আমি জানি।

যশোদাদি কক্ষনো এরকম অসভ্য ছিলনা।

পরের বছর পুজোর ছুটির ঠিক পরে একদিন স্কুল থেকে ফিরে দেখি যশোদাদি। সামনের ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কীরকম হয়ে গেছে যশোদাদি। শাড়িটা ময়লা, কার্ডিগানও ময়লা, ছেঁড়া। অতো সুন্দর অতো ফিটফাট যশোদাদি কেমন রোগা কালোমত হয়েছে। কোলে কাপড়টাপড় জড়ানো একটা লাল মাথাওয়ালা বাচ্চা। যশোদাদির মুখটা একদম পালটে গিয়েছে। মুখে কিরকম দাগ, ও বোধ হয় কাঁদছিল। দরজার কাছে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন একটা বাইরের লোক, যেন এই বাড়িটার ভেতরটা ও চেনেনা। আমি যশোদাদি—বলে উঠেছি, মা বলল,

তুমি ভেতরে যাও। বইখাতা রেখে স্কুলের ড্রেস ছাড়। যশোদাদি তো এই সবই জানে। খালি আমার এই বড় হয়ে যাবার কষ্টের কথাটা জানে না। মা কীসব পুরোন শাড়ি চাদর ওকে দিল। দুধ পাঁউরুটি খেতে দিল। কিন্তু তারপর বলল,

না যশোদা আমি তোমাকে আর রাখব না। তখন আমি তোকে অনেক বুঝিয়েছিলাম, তুই কিছুতেই শুনিসনি। এখন আমি আর পারব না।

আমি মায়ের ঘরের দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে শুনছি, পাল্লা আর চৌকাঠের মাঝের ফাঁক দিয়ে সব দেখতেও পাচ্ছি। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। ওরা দুজনেই অন্যরকম হয়ে গেছে...মা, যশোদাদি বেশি করে যশোদাদি।

ও কাপড়গুলো নিল, কুচি বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে চলে গেল। ঘরের ভেতরে এলই না।

যশোদাদিকে আমি আর একবার দেখেছিলাম।

স্কুল থেকে সিস্টাররা আমাদের কার্শিয়াংয়ের কাছে গিলা পাহাড় নিয়ে গিয়েছিলেন নেতাজির দাদার বাড়ি দেখাতে। ফিরবার পথে স্টেশনের আগে ধোবিখোলা বলে যে ঝর্ণা আছে সেখানে, রাস্তা থেকে খানিকটা নিচে, যশোদাদিকে দেখেছিলাম। ছেঁড়া ময়লা পোষাক পরে কাপড় কাচছিল। পাশে পাথরের ওপর রোগা লিকপিকে একটা বাচ্চা বসেছিল। যশোদাদি আমাকে দেখতে পায়নি। ও কাপড়ের দিকে তাকিয়েছিল। আমরা স্কুলড্রেস পরে সিস্টারের সঙ্গে হেঁটে আসছিলাম।

আর কখনো ওকে দেখিনি।

সে বছরের শেষে আমরা কার্শিয়াং ছেড়ে এলাম।

উৎসব (যুক্তবাষ্ট্র)

কুরুক্ষেত্রের আগে

আজও ঘরে ঢুকবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আলোটা চলে গেল। ভাদ্রমাসের গুমোট গরম আর সারাদিনের চড়া রোদে পুড়তে থাকা শরীর—বাস থেকে নেমে এতোটা হেঁটে এসে পাঁচমিনিট যে পাখার নিচে বসবে তারও উপায় নেই। দাঁত দিয়ে একবার ঠোঁট কামড়ে বিরক্তিটা গিলে নেবার চেষ্টা করে মণিমালা। এখনও বিরক্ত হবার আরো অনেক কিছু বাকি আছে—জানা কথা।

শ্যামলা কোন রকমে হারিকেনটার শিখা বাড়িয়ে এনে ঘরের মাঝখানে রাখল। তাক থেকে মোমবাতি হ্যান্ডেল ভাঙা কাপটা আর দেশলাই তুলে নিয়ে বাথরুমে ঢোকে মণিমালা। বেরিয়ে এসে দ্যাখে শ্যামলা ততক্ষণে চা করেছে। সাধ্যমত মাকে আরাম দেবার চেষ্টায় চায়ের কাপটা টেবিলে রেখে পাশে দাঁড়িয়ে আছে দু ভাইবোন। খোকা ওর বড় বড় চোখ মেলে মায়ের দিকে তাকিয়ে, শ্যামলা ঠিক স্বভাব মত চায়ের কাপটা রেখে টেবিলের বই পেন্সিল নাড়াচাড়া করছে। মেয়েটা এখন থেকেই নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছে এমনভাবে লুকোতে শিখেছে, কিছুতে ওর বয়সী বাচ্চাদের মত সহজ হতে পারে না। এই যে ওর ইচ্ছে করছে মায়ের গা ঘেঁষে আসতে, চা-টা করে দিয়েছে বলে মা খুশি হয়েছে সেকথা শুনতে, এটা ও সহজভাবে প্রকাশ করতে পারে না। কী করে পারবেই বা, ভাবে মণিমালা, আর পাঁচটা বাচ্চার মত সহজ শৈশব কি পেয়েছে ও?

হাত বাড়াতেই দুই ছেলেমেয়ে মায়ের কোলের কাছে ঝাঁপিয়ে আসে।

—কী খেয়েছ বিকেলে?

একসঙ্গেই নানারকম অভিযোগ শোনা যায় দু ভাই, বোনের গলায়,

—মা, দিদি খালি বাজে বাজে জিনিস খেতে দেয়।

—ও মা, ভাই রোজ খালি ওই মাহাতোর দোকানের তেলেভাজা খেতে চায়।

—না, মা, রোজ চাই না।

—তুমি ছোলা ভেজা দিয়ে মুড়ি খেতে বলে গেলে, ও ছোলাগুলো খেয়ে পালালো।

—আচ্ছা হয়েছে। চা শেষ করে কাপটা হাতে নিয়ে উঠতে যায় মণিমালা, দুজনেই একসঙ্গে হাত বাড়ায়,

—দাও, আমি রাখব—বলে।

— থাক, অন্ধকারে কোথায় পড়বে হোঁচট খেয়ে।

মণিমালা চৌকি থেকে নেমে রান্নার জায়গাটায় গিয়ে ঢোকে।

এখন আর এই ঘরে কাজ করবার জন্য চোখে দেখবার দরকার হয় না। মানুষ যে অভ্যস্ততায় কতো অসুবিধাকে পার করতে পারে, ভাবা যায় না। স্কুলের ক্লাস এইট নাইন পর্যন্তও সন্ধ্যের পর বাথরুমে যেতে হলে মাকে কিংবা মেজদিকে ডাকতে হত। বড়দির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল ততোদিনে। মেজদিদি এক-একদিন যেতে চাইত না, উল্টে বেশি বেশি করে ভয় দেখাতো। কত সাধাসাধি করে রাজি করাতে হত দিদিকে, কোনো কোনো দিন মাকে এক ধমক দিতে হত শেষ অবধি। আর এখন এই নিত্যদিনের অন্ধকারের মধ্যেই রান্নাঘর থেকে চাল বার করে উঠোনের অন্ধকারে টিউবওয়েলে নিয়ে তাকে ধোয়া হারিকেনের আধো অন্ধকারেই হাঁড়িতে চাল ফেলা। ঝুড়ি থেকে সবজি বার করে কেটেকুটে গুছিয়ে ফেলা। আজ রাতের ব্যবস্থা করাই শুধু নয়, কাল সকালের কাজটাকেও খানিক এগিয়ে রাখা। সকালে আসা বাচ্চাগুলোকে পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকেই তো তাকে প্রবীরের দু-তিনবার চা, ছেলেমেয়ের টিফিনের রুটি, ভাত তরকারি সাড়ে নটার মধ্যে নামাতে হবে। ওরা খেয়ে বেরিয়ে গেলে ঘরের বাকি কাজ শেষ করে, যা হোক কিছু খেয়ে নিজেও বেরিয়ে পড়তে হবে দশটার মধ্যে। তার এই স্টেশনের কাছ থেকে মাস্টারপাড়ায় নন্দীদের বাড়ি পৌঁছতে খুব কম হলেও আধঘণ্টা তো লাগবেই। ওদের মেয়ে মর্নিংস্কুল থেকে ফেরে তার মধ্যে।

আলুগুলো বঁটি আর একবাটি জল নিয়ে মণিমালা ঘরের মেঝেয় এসে বসে। একটিমাত্র লণ্ঠনের মাপা দুর্মূল্য কেরোসিনটাকে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগাতে হলে এটাই উপায়। তাছাড়া সন্ধ্যেবেলার এই একটুক্ষণ, যতক্ষণ প্রবীরের বাড়ি ঢুকবার সময় না হয়, সে তার দুই ছেলেমেয়েকে যতো বেশি সম্ভব কাছাকাছি ধরে রাখতে চায়। ওদের দিক থেকে অপেক্ষা করে থাকাটা তো বোঝাই যায়। নিজের শরীর ক্লান্তিতে টুকরো হয়ে পড়তে চাইলেও। দরজার পাশ দিয়ে ভেসে যাওয়া নোংরা গানের কলি কানে এসে চাবুক মারলেও। মাঝে মাঝে মনে হয় তাব এই তেরো বছরের মেয়েটা যদি বধির হত তাহলে কি ভালো ছিল? এই কথাগুলো অন্তত ওর কানে মাথায় এরকমভাবে ঢুকত না। মেয়ে হয়ে জন্মানো যে পাপ, মেয়ে হওয়া যে খুব লজ্জার সে কথা ওকে মা-ভাইয়ের সামনে বসে প্রত্যেক দিন ভাবতে হত না। তবু মণিমালা প্রাণপণ চেষ্টা করে ওকে বোঝাতে যে ভয় পাস না। ওদের মত সবাই নয়, এই পাড়াটার বাইরেও একটা পৃথিবী আছে।

আজ তার ফেরা থেকে এখনও তেমন কিছু কানে ঢোকে নি। রোজকার মতই আজও মণিমালা আশা করে, হয়ত ওরা ঠিক করেছে এই বাড়ির, এই ঘুপচি ঘরের মেয়েটাকে একটু নিস্তার দেওয়া। হয়ত বাচ্চা মেয়েটার নিচু করে থাকা ফ্যাকাশে মুখখানা দেখে ওদের মধ্যে কারো মনে একটু মায়া হয়েছে।

প্রথম আলুটার খোসা ছাড়াতে ছাড়াতেই অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ আলো ফিরে এল। সারাদিন পর এতক্ষণে ছেলেমেয়েদের মুখ দেখা গেল স্পষ্ট। কম ভোল্টেজে হলেও পাখাটা ঘুরতেই যেন কতো হাওয়া লাগল গায়ে। হাতের গতি বাড়িয়ে মণিমালা খোকাকে জিজ্ঞেস করে,

—কী পড়া হয়েছে আজ তোর ক্লাসে?

—সবকিছু হয়েছে। বাংলা, অঙ্ক, বিজ্ঞান শুধু ভূগোল ক্লাস হয়নি। আর—

—আর কী? খোকা আড়চোখে দিদির দিকে তাকায়। আর সেদিকে তাকিয়ে মণিমালা এতক্ষণে খেয়াল করে শ্যামলার মুখখানা যেন আজ অন্যদিনের চেয়ে শুকনো দেখাচ্ছে। ততক্ষণে খোকা বলে ফেলেছে,

—আমরা একটু খেলছিলাম বলে হেডস্যারটা আমাদের কান ধরে দাঁড় করিয়ে—

—খোকা, এরপর দিন স্যারটা বললে আমি পিঠে স্কেল ভাঙব। অনেক দিন বলেছি বড়োদের সম্পর্কে ওরকম কথা বলতে হয় না—শ্যামলা তোর ক্লাসে কি হয়েছে?

শ্যামলা মায়ের দিতে তাকিয়ে আবার মাথা নামিয়ে নেয়। তার চোখ দেখে সন্দেহ হয় সে কেঁদেছে।

—শ্যামলা?

শ্যামলা মাথা তোলে না। মণিমালার সাংঘাতিক ভয় হয় হঠাৎ। কী হয়েছে ওর? বাইরেটা চুপচাপ কেন? খোকাও কীরকম অস্বস্তিতে পড়ে যায় যেন।

—শ্যামলা, কী হয়েছে বল আমাকে। বলেছি না—যা কিছু হবে সমস্ত কথা আমাকে বলবি। কী হয়েছে?

—মা, আজকে ওরা বাসে করে আমার সঙ্গে স্কুলের সামনে অবধি গিয়েছিল।

এবার শ্যামলা ঢেকে রাখার কোন চেষ্টা না করে কাঁদতে থাকে। তার পিঠে হাত রাখলে সরু পাঁজরের তলায় তার হৃৎপিণ্ডের ধক্‌ধকও যেন হাতের তালুতে বোঝা যায়। ঘামে ভিজে সপ্‌সপ করছে মেয়ে। তবু মণিমালা বলে,

—তাতে কী হয়েছে? বাসে কতো লোক থাকে! যার যেখানে কাজ সে সেখানে যাবে। তাতে তুমি কাঁদবে কেন?

শ্যামলার কান্না বাড়ে,

—আমাদের সিটের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুবীরদাদা আর চিন্তাদাদা কীসব গান করছিল, চিৎকার করছিল। প্রীতি আর আমি এক সিটে বসেছিলাম, ও আমাকে পরে বলছিল ওই ছেলেগুলো তোর জন ওরকম করছে, তুই আর এই বাসে আসিস না। যদি কেউ দেখে আমাদের বাড়িতে বলে দেয় আমরা মার খাবো। আর বিউটি বলছিল—শ্যামলা কথা বলতে পারেনা। কান্নায় হেঁচকি ওঠে। তবু মণিমালা নিষ্ঠুরের মত বলে,

—কী বলছিল?

—বলছিল ওই ছেলেটা তোর লাভার।

মণিমালা শ্যামলাকে জড়িয়ে তার পিঠে হাত বোলায়। খোকা এতক্ষণ চুপ করে দেখছিল। এখন দিদির কাছে উঠে এসে বলে,

—কাঁদিস নারে দিদি, আমি একটু লম্বা হলেই দেখবি ওদের ছুরি দিয়ে এইসান দেব না—পেট কেটে একদম ফ্যাঁস করে—

—খোকা! ধমক দিয়ে ওঠে মণিমালা, তোমাকে আর গুণ্ডা-বদমাশদের মত কথা বলতে হবে না। ছুরি দিয়ে—খুব সিনেমার হিরো হয়েছ না? ফের কোনদিন যদি শুনি এসব কথা—

নিজের সমস্ত ভয় আর অসহায়তা ভুলে হঠাৎ খুব রেগে যায় মণিমালা। ইচ্ছে হয় দরজা খুলে বেরিয়ে ওই ছেলেগুলোর মুখোমুখি হয়। কলার ধরে টেনে নিয়ে আসে আর জিজ্ঞেস করে যে ঠিক কী চায় ওরা? এই মেয়েটা ওদের সামনে হাঁটতে শিখেছে, ওদের সামনে তিন বছর বয়স থেকে বারো-চোদ্দয় পৌঁছেছে। কেন ওরা এরকম বীভৎস করে তুলেছে ওর এইটুকু জীবনটাকে?

যতো গরম হোক, গুমোট হোক, তারা কিছুতেই ঘরের ওই একমাত্র দরজাটা খুলে দিতে পারবে না একটু বাতাসের জন্য। বিকেলে সন্ধ্যায় কোথাও পড়তে পাঠাতে পারে না। সমস্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও সত্যি সত্যি শরীরের রক্ত জল করা উপার্জন থেকে চল্লিশ টাকা দিয়ে গানের ক্লাসে ভর্তি করে দিয়েছিল, কিন্তু সপ্তাহে চারদিন সন্ধ্যা সাতটার পর মেয়েটাকে নিয়ে আসবে কে? মণিমালা দুপুর দুটো থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত একটা পিসিওতে ডিউটি করে। সাতটা সেখান থেকে বেরিয়ে, উল্টো দিকে গিয়ে মেয়েকে গানের ক্লাস থেকে নিয়ে বাড়ি ফেরা—এটা বাস্তবে সম্ভব ছিল না। শ্যামলা নিজেই বলেছিল,

—না মা, আমি গান শিখতে যাব না। ভাইও তো একা থাকবে। আমি আর ভাই মিলে পড়ব। নাহলে ও খালি কার্টুন দেখবে টিভিতে।

এটা যে সত্যি কথা নয় সে কথা শ্যামলা নিজেও খুব ভালো করে ঢাকতে পারে না। মণিমালার বুকের মধ্যে মুচড়ে ওঠে। অনেকবার মনে হওয়া কথাটাই আবার মনে হয়েছিল, এরচেয়ে যদি বিধবা হত সে তাহলে কি একটু সহজ হত তার আর তার বাচ্চাদুটোর পায়ের নিচে মাটি পাওয়া? যদি ওদের বাবা না থাকত—

ওদের বাবা আছে, বিধবা নয়, স্বামী পরিত্যক্তাও নয় মণিমালা। এই বাড়িতেই ঘুমোয়, রাত্রিযাপন করে প্রবীর। আর যেখানে রাত্রে থাকে লোকে সেটাকেই তার বাড়ি বলে, তার সংসারও বলে।

স্কুল ফাইনালের আগে দু'বছর তাকে পড়াতে আসত প্রবীর। পাড়ার ছেলেটেলে কিছু নয়, রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে যখন মেয়ের জন্য টিউটর খুঁজছেন বাবা-মা, মণিমালার বাবা অনিমেষের কোন সহকর্মী এই ছেলেটির সন্ধান দেন। ভালো ছাত্র, বি এস সি ফাইনাল ইয়ার পড়ে। টাকার দরকার কাজেই কাজটা যত্ন করে করবে এরকম

ভেবেছিলেন বাবা আর সেই ভদ্রলোক। ক্লাস সেভেনের পর মেয়েকে আর পড়াতে চাননি অনিমেষ মিশ্র। বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, সামান্য চাকরিতে সংসারের সব প্রয়োজন মিটিয়ে তিনটি ছেলেমেয়ের পড়ার খরচ টানা কঠিন হচ্ছিল তাঁর পক্ষে। সবচেয়ে বড় কথা—মেয়েকে স্কুল ফাইনাল পর্যন্ত পড়াবার পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি। এইট পড়লেই তখন নাইন-টেনের জন্য জেদ করবে মেয়ে। তার মা-ও গুনগুন করতে থাকবে, তার চেয়ে ওই ক্লাস সেভেন পর্যন্তই ভালো। কিন্তু মেয়ের কান্নাকাটি, জেদ, সর্বোপরি ইস্কুলের জনা দুই দিদিমণি বাড়ি চলে এসেছিলেন তাঁকে বোঝাতে। তারই ফল হয়েছিল মণিমালার ক্লাস নাইন আর টিউটরের সমস্যা। স্কুলের টিচার যাঁরা বড় বড় ব্যাচ পড়ান তাঁরা ক্লাস নাইনের ছাত্রী নেবেন না। অনিমেষবাবুর নিজেরও ইচ্ছে ছিল না বাড়ির বাইরে ওই এক দঙ্গল ছেলের সঙ্গে পড়তে দেওয়া। কিন্তু টিউটর পাওয়া যে শেষ অবধি এরকম সমস্যা হবে সেটা আন্দাজ ছিল না তাঁর। সুতরাং প্রবীর আসতে শুরু করে মণিমালাকে পড়াতে। যতক্ষণ সে পড়াত তার ঠাকুমা ঘরে বসে থাকতেন।

সমস্ত জিনিসটায় ভারি অপমান আর রাগ হত মণিমালার। কেউ তাকে বোঝে না বাড়িতে। সবসময় সন্দেহ আর প্রতিপদে এককথা

—দুদিন পর শ্বশুরবাড়ি যাবে, যা ইচ্ছে হবে সেখানে কোরো। তার সমস্ত বন্ধুরা সালোয়ার কামিজ পরে, তাকে সেই ক্লাস নাইন থেকে শাড়ি পরতে হয়েছে। কোনদিন বন্ধুদের বাড়ি একটা সন্ধ্যা কাটানো, একটা সিনেমা দেখতে যাওয়া—কিছু করতে পারেনি সে। ক্লাসের পড়া বুঝে নেবার সময়ও তার সমস্ত মানসম্মান অগ্রাহ্য করে ঘরের কোণ থেকে মালা জপতে থাকা ঠাকুমা বারবার বলে উঠতেন—

ও মণি, জোরে জোরে কথা বল, মাস্টারের সঙ্গে গুজগুজ করিস কেন?

অপমানে ক্ষোভে মাটিতে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে করত তার।

তাই ক্লাস টেনের টেস্ট পরীক্ষার সময়ই মণিমালা ঠিক করে ফেলে সেই ফর্সা কপাল কালোচোখের ছেলেকেই জীবনে নিজের করে নেবে সে। ও আমাকে বোঝে, আমার অপমানে ও কষ্ট পায়। একথাই তার মনে যথেষ্ট কারণ হয়েছিল বাড়ির বিশেষ অমতেও প্রবীরকে বিয়ে করার।

—আমি তো গরীব, তোমাকে এতো আরামে রাখতে পারব না, বলেছিল প্রবীর।

—আমি আরাম চাই না, তুমি আমাকে ভালোবাসবে তো? আমরা দু'জনে মিলে খাটব, দু'জনে একসঙ্গে গল্প করব, একসঙ্গে সময় কাটাব।

কতো যে ভালো লেগেছিল মুক্তির স্বপ্ন।

রেলের লাইনস্ম্যানদের এক কুঠুরির একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে দু'জনে থাকত প্রবীররা। সঙ্গীকে অন্য জায়গা দেখে নিতে বলে সেখানে এনে তুলল মনিমালাকে।

তার আগে অবশ্য তাদের দেশের বাড়ি, আত্মীয়স্বজন 'বাড়ি পালানো মেয়ে' বলে অশেষ অপমান। 'কাগজের বিয়ে'কে বিয়ে বলে মানতেই রাজি নয় সেখানকার কেউ। মণিমালা দেখেছিল তার ঠাকুমার চেয়ে অনেক বেশি অপমানজনক কথা বলতে পারা প্রবীরের মাকে। তফাতের মধ্যে ঠাকুমা নিজের মত একরকম করে মণিমালাকে ভালোবাসতেন, কিন্তু শাশুড়ি যেন আক্রোশ নিয়ে প্রত্যাখান করলেন। সবথেকে আশ্চর্য লেগেছিল প্রবীরের ব্যবহারে। মণিমালাকে সেই একেবারে অচেনা পরিবেশে, অচেনা বিরূপ লোকদের মধ্যে পৌঁছে দেবার পর তাকে আর দেখাই যেত না সারাদিন। স্বাভাবিক সাধারণভাবেই বাড়িতে ঢুকছে বেরোচ্ছে, পুরোন বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে যাচ্ছে। রাত্রে মণিমালা যাই বলুক কোন কথা তার কানে বিশেষ ঢুকছে বলে মনে হত না। কেবল বলত,

—একটু মানিয়ে নাও, জানোই তো এরা গাঁয়ের লোকজন—

বলেছিল কিছুদিন ওখানে থাকুক মণিমালা, সে দিন দশ-পনের পরে ফিরে এসে নিয়ে যাবে। সেইটেয় কোন মতে রাজি হয়নি সে। চলে এল সেই একঘরের আশ্রয়ে। তারপর ছ'মাসও লাগেনি স্বপ্ন গুঁড়ো হয়ে যেতে। সারাদিন ঘরে থাকে না প্রবীর। বি এস সির রেজাল্ট কিছু বলবার মত হয়নি। সকালে উঠে বেরিয়ে যায়, দুপুরে খেতে আসে আর রাত্রি নটার আগে তাকে দেখা যায় না। মধ্যে মধ্যে কোনদিন বাজার করে এনে দেয়। কোনদিন সংসারের অভিজ্ঞতা না থাকা মণিমালা যে কী করে কি করবে বুঝে উঠতে পারত না। ততদিন তার শরীর ভারী হয়ে উঠেছে সন্তানের ভারে । মা-বাবার জন্য অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে, ভয়ে পাগল পাগল লাগছে।

বলা মাত্রই প্রবীর তাকে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল বাপের বাড়ি। কিন্তু সেখানে তাকে কেউ থাকতে বলেনি ঠাকুমা ছাড়া। কেবল আসবার সময়ে মা পাঁচশ টাকা হাতে দিয়েছিল। বলেছিল,

নিজের খুশিমত যা করেছ তখন তো বাবার সম্মানের কথা ভাবোনি। নিজের বাচ্চা জন্মালে বুঝবে মা-বাবা কী জিনিস! এই টাকা দিয়ে এ-অবস্থায় নিজের একটু খাওয়া-দাওয়া কোরো।

সেই ফিরে আসবার পর থেকে একটা নতুন কথা বলতে শুরু করেছিল প্রবীর,

—তোমার বাবা-মায়ের কাছ থেকে হাজার পঞ্চাশেক টাকা নিয়ে এসো ছোটখাটো কিছু ব্যবসা শুরু করি। মণিমালা খুব ভালোভাবেই জানত, বাবা টাকা দেবেন না। সে বাড়িতে ঢুকতে বাবা উঠে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। প্রবীর মানত না, বলত

—ওরকম রাগ সব বাবাই দেখায়, গিয়ে হাতে পায়ে ধরো। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে কোনদিন কথা বলেনি মণিমালা, তার বাড়ির কেউ বলেনি কখনো।

কোন কাজ করছিল না প্রবীর, জিজ্ঞেস করলেই বলত চেষ্টা করছি। তার পরই

সেই টাকা নিয়ে আসার প্রশ্নটা উঠে পড়ত বলে ভয়ে কাজকর্মের কথাও আর জিজ্ঞেস করা ছেড়ে দিয়েছিল মণিমালা। আঠেরো বছরের মায়ের শরীর শ্যামলাকে জন্মের আগে স্বাস্থ্য, জন্মের পর পুষ্টি দুই-ই জুগিয়েছিল। তিনবছর পর সেই শরীরের জোর কমে এসেছিল। খোকা জন্ম থেকেই রোগা। প্রবীর অটোরিক্সা চালিয়েছিল কিছুদিন। যা আয় হত তাতে সংসার চলছিল। এই শহরটা লম্বাটে, অথচ বাস খুব কম। অটোরিক্সার চাহিদা ছিল ভালোই। মালিককে দিনের টাকা মিটিয়ে দেবার পরও নিজের হাতে টাকা রয়ে যেত। কিন্তু তাতে ঘরের দিকে মন ফেরার কোন লক্ষণ দেখা যায়নি তার। বরং সেই সময়েই মদের নেশা ধরল। আর সেই নেশাতেই বয়ে যেতে লাগল তার সমস্ত পয়সা। মাসখানেক পাওনা পয়সা না পেয়ে একদিন লোক পাঠিয়ে ধরে নিয়ে গেল মালিক। গ্রাজুয়েট ড্রাইভারকে মারধর করল না, কিন্তু গাড়ি কেড়ে নিয়ে দূর করে দিল।

মদের পয়সা জোগাড় করার জন্য শুরু হল লটারি খেলা। যার তার কাছ থেকে টাকা ধার করছে, কয়লার ডি. ও. ধরে বিক্রি করে দিচ্ছে—পাতালে যাবার যতোরকম পথ, বিনা বাধায় নেমে যাচ্ছিল প্রবীর। প্রথমদিকে কয়েক বছর মণিমালা কেবল ভেবেছে ভালোবেসে, বুঝিয়ে সে আটকাতে পারবে লোকটাকে। কিন্তু সে তো একা, বাইরে চতুর্দিকে ছড়ানো গর্ত। যদি কেউ নিজে না নিজেকে আটকায় সে কী করতে পারবে? সংসার ছেলেমেয়ে নিয়ে যে কোন আলাদা ভাবনা আছে প্রবীরের এমন প্রমাণ ছিল না। চোখের জল মুছতে মুছতে মণিমালা কেবল ভেবেছে, এই লোকটাকে ওরকম জ্যোতির্ময় অতো সুন্দর মনে হয়েছিল তার? এ বলেছিল, আমাকে কেউ কখনো ভালোবাসেনি, তোমাকে পেলে আমি প্রথম ভালোবাসার ঘর পাবো। কেন বলেছিল? কেবল সেই কটা দিনে ভালো লাগছিল বলে?

এইসব কথা ভাবত সে বেশিরভাগটাই রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে। হ্যাঁ, সাতবছরে তার সংসার করবার প্রধান কাজ দাঁড়িয়েছিল হাঁটা। সকাল সাতটা, বেলা দশটা, দুটো, সন্ধ্যে ছটা, সাতটা—বাড়ি গিয়ে গিয়ে বাচ্চাদের পড়াচ্ছিল মণিমালা। কেবল নিজের ছেলেমেয়ের সামনে দুবেলা খাবারের থালা ধরে দেওয়া নয়, প্রবীরের চালও নিতে হচ্ছিল হাঁড়িতে। মদের নেশায় চুর হয়ে এসে রান্না হয়নি দেখলে মণিমালার চুলের মুঠি ধরা, পয়সা উপার্জনের নানারকম উপায়ের কথা বলে দেওয়া—এ-সবই ঘটেছে। ছেলেমেয়ের সামনে। ভয়ে নিরুপায় হয়ে চাল জোগাড়ের নিয়মিত দায়িত্ব মণিমালাকেই নিতে হয়েছিল। শ্যামলাকে খোকাকে স্কুলে দিয়েছিল, চারিপাশের আবহাওয়ার বাইরে সে রাখবেই ছেলেমেয়ের মনকে। বত্রিশ বছর বয়স হবার আগেই যেন বুড়ো হয়ে গিয়েছে বোঝার চাপে। কিন্তু যে বাচ্চাদুটো তারই শরীর থেকে পৃথিবীতে এসেছে, তাদের দায়িত্ব তাদের বাবা ভুললেও সে তো ছাড়তে পারে না, ছাড়ার প্রশ্নও ওঠে না। ওরাই এখন মণিমালার জীবনের অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওদের ভালোবাসবার জন্যই সে বেঁচে আছে, নাহলে কবে শরীর ছুঁড়ে দিত ছুটন্ত

বিশাল যে কোন একটা ট্রাকের তলায়। কিন্তু নিজের মত জীবন থেকে শ্যামলাকে খোকাকে সে বাঁচাবেই। ওরা যেন মাকে সবকথা বলতে শেখে, ওরা যেন জানে—সব দুঃখে কষ্টে মা পাশে আছে। বেলা দুটো থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত রাস্তার পাশে ওই পিসিওটাতে বসে থাকা আর রোজ নতুন পুরোন সব চোখের নোংরামি গায়ে মাখা সে সহ্য করে যাচ্ছে শুধু ছেলেমেয়ের জন্য। মাইনে যা পায়, সেটা হয়ত দুটো টিউশনি থেকে উঠত, কিন্তু যে লোকটি পিসিওটার মালিক তার হাতে ক্ষমতা আছে, মণিমালা জানে। অনেক টাকা, অনেক জানাশোনা। কিসের বিপদ ঠিক জানেনা, কিন্তু কোন বড় বিপদ হলে এই লোকটা হয়ত আঙুল নেড়ে তাকে বাঁচাবে। ও কতো খারাপ কে জানে, কিন্তু ছেলেমেয়ে মানুষ করবার জন্য কাজ খুঁজছে চাকরি দেবার সময়ে এই কথাটা শুনে 'বাঃ বাঃ খুব ভালো' বলেছিল। এখনও গাড়ি থামিয়ে সন্ধ্যাবেলা ঘুরে যাবার সময়ে এক এক দিন খোঁজ করে,

—কী দিদিমণি কোন অসুবিধা নেই তো? ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করছে তো?

নিজের মত জীবন শ্যামলার কিছুতেই হতে দেবেনা—খুব জোর করে ভেবেছে মণিমালা। কিন্তু কেমন করে? সাইকেল কারখানা বন্ধ হয়ে গেল, তার দুটো ছাত্রছাত্রী, দু ভাইবোন টিউশানি ছেড়ে দিল এমাস থেকে। কথাটা বলবার সময়ে তারই বয়সী ওদের মায়ের চোখ ছলছল করে উঠেছিল,

জানিনা ভাই কী যে হবে। ভি আরের টাকা দিয়েছে সত্যি কিন্তু তাতে কতদিন যাবে বলুন। আমার এই ছোটছোট ছেলেমেয়ে, পড়ানো আছে, বিয়ে দেওয়া আছে।

বার্ণ স্ট্যান্ডার্ডের অফিসের একটি মেয়ে বাংলা মিডিয়ামের ক্লাস সিক্সের ছাত্রী। তিনমাস মাইনে পায়নি সে বাড়ি থেকে। ছাত্রীর বাবার কারখানায় মাইনে বন্ধ চারমাস। ইংরেজী মিডিয়ামের ছাত্রছাত্রীদের পড়ালে মাইনে বেশি, কিন্তু সে তো ইংরেজী মিডিয়াম পড়াতে পারে না। ইংরেজী বলতে পারেনা যে।

সমস্তটা মিলিয়ে ক্রমশই যেন বিরাট একটা মাকড়শার জালের ভিতরের দিকে চলে যাচ্ছে মণিমালা। সরু সরু সুতোর মত আঠা জড়িয়ে যাচ্ছে পায়ে পিঠে গলায়। অথচ প্রবীর মাঝে মাঝে কোথা থেকে দমকা টাকা পায় এখন। হঠাৎ কোনদিন হয়ত এক কিলো মাংস আর থলি ভর্তি বাজার করে নিয়ে এল। অসম্ভব ভয় হয়। কে টাকা দেয় ওকে? কিসের জন্য দেয়? সকালবেলা কোনদিন অদ্ভুত কোন লোক তাদের কুঠরির জীর্ণ দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকতে আসে, প্রবীর মেয়েকে বলে,

—যা, বলে দে—বাবা বাড়ি নেই।

মণিমালা যেতে দেয় না মেয়েকে। খোকাকে পাঠায়। তারপর বলে,

—মেয়ে বড় হয়েছে, তাকে আজেবাজে লোকের সামনে পাঠাবে না আর। সারাজীবন নিজে মিথ্যে কথা বলেছ—ছেলেমেয়েকে সেটা শেখাও কেন? লুকিয়ে থাকতে হবে এমন কাজ করার দরকার কি?

উত্তরে প্রবীর তাকে নোংরা ভাষায় গালাগালি করেছে, চুলের মুঠি ধরে নিষ্ঠুরভাবে ঝাঁকিয়ে দিয়েছে। ভয়ে তার ছেলেমেয়ে কেঁদে ওঠে, তাই সে নিজেও ভয় পায় আজও।

কিন্তু ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠছে যেন।

এটা এই বছর খানেক ধরে শুরু হয়েছে, সকাল সন্ধ্যা ঘরের দরজায় কিছু ছেলের এই আড্ডার হর্‌রা। এরা এ-পাড়ারই ছেলে। প্রায় সকলেরই মুখ চেনে মণিমালা। নামও জানে কয়েকজনের। সংখ্যায় অনেক নয় সত্যিই, কিন্তু পাড়ার অন্য ঘরগুলোর চুপ করে থাকা দেখে জানে যে এদের ভয় পায় সবাই। এরা এসে বসলেই সব বাপ-মা নিজেদের মেয়েদের ঘরের ভেতরে টেনে নেয়।

এ-বাড়িতে কোন পুরুষমানুষ থাকে না, সেটাই হয়ত ওদের সাহস পাবার কারণ—ভাবত মণিমালা। গত ক'মাস ধরে আসল কারণটা জেনেছে সে। প্রবীর ইদানিং দিনের বেশিরভাগ রাত্রের বেশ খানিকটা কাটায় অন্য এক বিবাহিতার ঘরে। তার স্বামীর ফাইফরমাসও খাটে। এসব ক্ষেত্রে পাড়ার ছেলেরাই বাগড়া দেয়, হল্লা করে। এক্ষেত্রে সেটা হয়নি। বোধহয় কোনো অলিখিত বদলাবদলির সমঝোতা হয়ে গেছে। বাইরে বাইরে হয়েছে সেটা। সে আর তার ছেলেমেয়ে সেই খেলায় একটা মাংসের টুকরো। একটা টোপ মাত্র। যেটা দেখিয়ে কুকুরের মুখ চুপ করিয়ে রাখা হয়। আর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে নিজের শরীর নিজের অস্তিত্ব নিজের বড়ো হয়ে ওঠা নিয়ে জড়োসড়ো দুঃখী ছোট মেয়েটা।

শ্যামলার কান্নামাখা 'কী করে তাহলে স্কুলে যাবো মা' শুনতে শুনতে এখন মণিমালার মনে হয় তার রক্তের মধ্যে থেকে একটা রাগ উঠে আসছে। যেন সে আর ভয়ও বুঝতে পারে না। মেয়েকে কোলের কাছে টেনে পিঠে হাত রেখে চুপ করে সে বসে থাকে।

মোটর সাইকেলের গর্জন শোনা যায়। তার দরজার গোড়ায় এসে জোরে ব্রেককষার শব্দ। খোকা ভয় পেয়ে রোজকার মত জোরে টিভি চালিয়ে খবর ধরে। তার ওপর দিয়েই রোজকার মত শোনা যায় 'ফুলকলি রে ফুলকলি—এ ফুলকলি'—কাদামাখা হাসির হর্‌রা। মণিমালা হঠাৎ শ্যামলাকে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। দেওয়ালে ঠেসে যাওয়া চুনবালি তার পিঠে লেগে আছে। সে এগিয়ে গিয়ে দরজার ছিট্‌কিনি খোলে শব্দ করে। তারপর জোরে ডাকতে যায়,

—শোনো।

খোকা হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে,

—মা ওমা—দ্যাখো কি হচ্ছে।

পিছন ফেরে মণিমালা। আগুনের একটা বিরাট প্রপাতের মত আমেরিকার খুব উঁচু দুটো পাশাপাশি বাড়ি জ্বলতে জ্বলতে ধসে নেমে যাচ্ছে টেলিভিশানের পর্দা জুড়ে।

তীব্র কুঠার

দেশভ্রমণ

আমার বাবার ব্যান্ডপার্টি আছে। আমরা তো বাদ্যকর। মা-র যখন বিয়ে হয়েছিল তখন মা খুব ছোট ছিল। বাবার মা আমার মাকে ভালোবাসত না। খেতে দিত না। মায়ের একজন ননদ ছিল যে লুকিয়ে লুকিয়ে এনে মাকে খাওয়াতো। আমরা তো আর দেখিনি কিন্তু মা বলে, শুনি। যেদিন মায়ের খুব মন খারাপ হয়, মা কাঁদে, তখন বলে আমার সারাজীবন দুঃখে গেল। তখন ওইসব কথা বলে। ছোট ভাইটা মরে যাবার পর থেকেই মায়ের খুব মন খারাপ হয়। খুব শরীর খারাপ হয়। আগে তো নিঃশ্বাস আটকে যেত, একঘণ্টা নিঃশ্বাস নিতে পারত না, অজ্ঞান হয়ে যেত। অনেক ওষুধ করে এখন একটু ভালো হয়েছে।

ভাইটা খুব ছোট না, আট বছরের ছিল। মাথায় কী হয়েছিল। হাসপাতালে ছিল। ডাক্তার বলেছিল বেরেনে কী একটা হয়েছে, বাঁচা খুব কঠিন। তবু তো কাকারা গেল। বড় জামাইবাবু এসেছিল। মা যতগুলো বাড়িতে কাজ করে সব বাড়ি থেকে পয়সা এনেছিল। ভাইও বাঁচল না, এদিকে সব বাড়ি থেকে মায়ের টাকাও কাটা শুরু হল, তখন আমাদের খুব কষ্ট হল। খাবার থাকত না। মায়ের অসুখ। ছোড়দিদিকে ওর শাশুড়ি আসতে দেয়নি তখন নিজে নিজে বাসে উঠে দিদি চলে এসেছিল। ছোড়দিদি ভাইকে ছোট থেকে কোলে করে রাখত, না দেখে কি ছাড়তে পারে? তাতে ওর শাশুড়ি ওকে আর ফিরে নিল না। বলল, 'মিথ্যা কথা, ভাই মরেনি, অন্য ছেলের সাথ ধরে পালিয়েছিল'। দিদি শুনে বলল 'যাবো না আর ওদের বাড়ি।' বাবাও গেছিল, কাকারা গেছিল ওর শাশুড়িকে বুঝাতে, তাতে বাবাকে গালাগালি করল। জামাইদাদা রেলে চাকরি করে, ওর মা ওকে আবার বিয়ে দেবে। বাবা বলল, 'ঠিক আছে, মেয়ে যদি আমার ঘরে জন্মাতে পেরেছে, আমার ঘরে থাকলে দুটি নুনভাতও মেয়ের জুটবে'। শ্বশুরবাড়িতে ছোড়দিকে খুব মারত, তবু জামাইবাবু আবার বিয়ে করতে ছোড়দি খুব কাঁদছিল।

এইরকম নিয়মটা যে কেন, যে শ্বশুরবাড়িতে মারবে? আমার খুব ভয় করে, কী করে যে মার খাবো! আমি তো সবার চেয়ে ছোট বোন, বাড়িতে কোনদিন কেউ মারেনি। খালি দাদা দু একবার মেরেছে। বাইরের লোকের হাতে কী করে মার খাবো?

যখন খুব ছোট ছিলাম তখন অন্যলোকের হাতে মার খেয়েছি অবশ্যি। মাইথনে

একজনদের বাড়ি কাজ করতাম। বড় দিদির তো মাইথনে বিয়ে হয়েছে, আমি দিদির কাছে থাকতাম। আমরা ছয়বোন দুই ভাই। দাদা সবচেয়ে বড় তারপর বড়দিদি মেজদিদি ওদের বিয়ে হয়েছে। ওরা শ্বশুর বাড়িতেই থাকে। তারপর দুটোদিদি, তাদের বিয়ে হয়েছিল ফেরত দিয়ে গেছে। তারপর সুলতাদিদি তার শেষে আমি। ভাই ছিল ভাই তো আর নেই।

ছোটকালে আমাদের খুব কষ্ট ছিল। তখন বড়দি আমাকে নিজের কাছে নিয়ে গেছিল। সেইখানে একটা বাবুঘর আমাকে রেখেছিল। মা গিয়ে টাকা নিয়ে আসত। আমি তখন বুঝতাম না একশ টাকা কি দুশো টাকা।

ওদের বাড়িতে খুব কাজ ছিল। কয়লা ভাঙতাম। একদিন আঙুলে হাতুড়ি পড়ে গিয়ে অনেক রক্ত পড়েছিল। বাসন মাজতাম, কাপড় ধুতাম, ছাদে মেলতাম। দড়িতে হাত পেতাম না একটা জলচৌকিতে উঠে উঠে মেলতাম। ওরা সবসময় খুব বকত, গালে ঠোনা মারত। মা যখন মাইনে নিতে যেত মাকে কিছু বলতাম না। আমার টাকা না পেলে বাড়িতে কী খাবে? তখন বাবার ব্যান্ডপার্টি ছিল না, বাবা বাঁশের ঝুড়ি বুনত, ঘুরে ঘুরে বিক্রি করত। আমাদের কী ক্ষিদে পেত। সারাদিন জল খেয়ে থাকতাম। বিকেলে ভাত রান্না হত, তখন খেতাম। ফ্যান ভাত। শুকনো ভাত হত না।

মাইথনে একজনদের বাড়িতেই আমি তোমাদের মতো কথা বলতে শিখেছি। না এদের বাড়িতে না। এদের বাড়িতে একদিন হাত থেকে নুন পড়ে গিয়েছিল তাইতে এত রেগে গেল—একশিশি নুন ঢেলে দিল ভাতে—সেই ভাতটা খেতে হল। খুব বমি করলাম, পেটে কী যন্ত্রোন্না। সে মাসে মা যখন মাইনে নিতে এল, ওরা বাড়িতে ছিল না, আমি একা ছিলাম। সেইদিন আমি মাকে বলি।

'মা আর পারছি না, আমার বড় কষ্ট হচ্ছে'

মা বলে 'দুটো দিন ধৈর্য ধর, নে যাব'। মাইনে নিয়ে মা চলে এল। তার কদিন গেলে বাবা যেয়ে বলল, 'আমার মেজমেয়ের বিয়ে ঠিক হচ্ছে, একে নিয়ে যাব।' অমনি করে না বললে যদি আসতে না দেয়। সেই চলে এলাম, আর যাইনি। তারপর আরও কত বাড়িতে কাজ করলাম। তোমরা যেমন দেশে দেশে বেড়াতে যাও না, ওই যে কত জায়গার ছবি দেখাচ্ছিলে, আমারও মনে কর সেরকমই কত জায়গা দেখা হল। কত লোকদের কতরকম ঘর।

তোমাদের বাড়িতে কতরকম জিনিস থাকে কেমন সুন্দর সুন্দর। আমার সবচেয়ে কোন বাড়ি ভালো লাগে? আমাদের বাড়িটা। হ্যাঁ তোমাদের ঘরদোর বেশ কেমন পরিষ্কার রাখা যায় আমাদের ঘরে জায়গাই নেই, সব বারান্দায় জামাকাপড় কাঁথাকানি বাক্স বিছানা কী করে পরিষ্কার রাখব। বেশি করে বর্ষার দিনে উঠোনে বারান্দায় জলকাদা ক্যাচ ক্যাচ। ঘরে সব ভিজা ভিজা। আর একটা খুব ভালো লাগে তোমাদের ঘরে কেমন বড় বড় আলো। রাত্তিরেও সব দিক দেখা যায়, দিনের মতো। কিন্তু তোমাদের ঘরগুলো খুব ছাড়াছাড়ি। মনে হয় বাড়িতে কোন লোকই নেই। আমরা

চারজন বোন থাকি। দুটো দিদিকে শ্বশুরবাড়ি থেকে ফেরত দিয়ে গিয়েছে। বিমলাদিদির একটা তিন বছরের মেয়ে আছে। দাদার একটা মেয়ে একটা ছেলে। মা রান্না করে, আমরা সবাই থাকি। খালি দাদাকে খুব ভয় হয়। আমার দাদা কিন্তু খুব রাগি। কারো সঙ্গে বেশি কথা বলে না। ব্যাটা ছেলে তো, বেশি কথা বললে লোক মানবে না। বাবাও কম কথা বলে কিন্তু দাদার চেয়ে বেশি বলে। বাবার কাছে তো সারাদিন লোকজন আসে, কথা বলতেই হবে। ব্যান্ডপার্টি নিয়ে যাবার জন্য বায়নার পয়সা নিয়ে অনেক জায়গার লোক আসে। বাবার দলের লোকজন আসে যায়। দুপুরবেলা লোক এলে তো না খাইয়ে ছাড়া যাবে না, তখন আবার ভাত রান্না করতে হয়। মা একদিন খুব ঝগড়া লাগে বাবার সঙ্গে—বলে,

এত এত ভাতের চাল আমি রোজ কোথায় পাব। 'দাদা কিছু কাজ করে না' ওই বাবার দলে মাঝে মাঝে বাজায়। তাই জন্যও এক একদিন ঝগড়া হয়। মা বাবা দাদাকে বলে,

তুই কিছু কাজ কর। তোমার সংসারে চারটে পেট, বোনেরা কতদিন খাওয়াবে।

তখন দাদা রেগে যায়। আমরা সবাই বাইরে কাজ করি তো মাঝে মাঝে বাজারে যায়, মাল তোলে, কিন্তু সব টাকা মদ খেয়ে নেয়। আর সেইদিন বাড়ি এসে খুব চিৎকার চেঁচামেচি। বাবা মদ খায় না। বাবা যদি মদ খেত তাহলে কি এত বড় সংসার চলত, বলো? আমার বাবা খুব ভালো। মাকে কোনদিন মারেনি, নেশা করেনি। বাবা অনেক কষ্ট করেছে ছোটতে। ছেঁড়া প্যান্ট পরে স্কুলে যেত, ক্লাসে সবাই হাসত। আমাদের গ্রামের বাউরি বৌরা বাবাকে ডেকে ভাত খাওয়াত। তবু ইস্কুলে গিয়েছিল, তাই পড়তে পারে। লিখতে পারে। আমি পড়তে পারি না। কখন শিখবো বলো? একটা বাড়িতে ছিলাম, তারা মাকে বলেছিল কেবল বাচ্চাকে খেলা দিতে হবে, যখন বাচ্চা পড়া শিখবে তখন আমাকেও পড়াবে। ওদের বাচ্চাটা খুব মারত। খিমচে রক্ত বার করে দিত। কাকু কাকিমা দুজনেই চাকরি করত। ওরা অফিস যাবার সময়ে ছেলেটা খুব কাঁদত। কাঁদা হয়ে গেলে আমাকে মারত। তাও আমি কিছু বলতাম না। কাকিমার সব কাজ করতাম—বাসন ধোয়া, গ্যাস মোছা, ফ্রিজ পরিষ্কার করা, এত এত কাপড় কাচা সব করতাম। কাকিমা বেরোবার আগে ঘর মুছে শেষ করতে হত। ওদের ঘরে তালা দিয়ে যেত তো। কিন্তু আমাকে রোজ ওদের পাতের এঁটো ভাত তরকারি, বাচ্চাটার মুখ থেকে ফেলে দেওয়া ভাত খেতে দিত। কোনোদিন পরিষ্কার ভাত তরকারি দিত না। অবশ্যি ওদের বাড়িতে বেশিদিন থাকিনি, ছমাস মতো করেছিলাম। ছেলেটা একদিন ঘরের মেঝেয় পিছলে পড়ে গিয়েছিল বলে কাকু আমায় জুতোয় করে মেরেছিল। ও যে আমাকে কতদিন মেরে কালশিটে পড়িয়ে দিয়েছে তারজন্য ওরা কোনদিন বারণ করত না। আমার বাবা কোনদিন গায়ে হাত তোলেনি আর—

অমনি করে কেন থাকব? কাজ করতে এসেছি, কিনে তো নেয়নি। খাটলে কাজ

অনেক পাব। দাদার মেয়েটাকে ইস্কুলে দিয়েছে, ও যেতেই চায় না। কালকে বাবা ওকে বকছিল,

তোমার নাম লেখালাম ইস্কুলে, কেন যাচ্ছ না বলে। এখন আর আমার পড়া হবে না। এত বড় হয়ে গেছি। পনেরো বছর হয়ে গেল। মা বলে বিয়ের কথা, আমি বলেছি এখন আমি বিয়ে করবই না। যাদের বাড়িতে তোমাদের মতো কথা শিখেছি ওদের সঙ্গে আমি দিল্লি গেছিলাম। দেখেছি কত বড়বড় মেয়ে বিয়ে হয়নি। আমাদের ওরকম হয় না। ছোটতেই বিয়ে না দিলে পাড়ায় নিন্দে হয়। হোক গে, আমি তবু এখন বিয়ে করবই না। বিয়ে হলে কী আর ভালো? একটু হাসিগল্প করতে ভালো লাগে—সবই তো শেষ। হয় দিদিদের মতো মার খাব, ফেরত দিয়ে যাবে না হলে বৌদির মতো রোজ ঝগড়া করব। বৌদি সারাদিন ঝগড়া করে। বিয়ে হয়েছিল যখন, এখানে থাকতেই চাইত না। কাঁদত, ভাত খেতোনা, মাথা ঠুকত। ফিট পড়ে যেত। খালি বাপের বাড়িতে চলে যাবার জন্য অস্থির করত। হ্যাঁ, দাদাকে বলেছিল ওর অন্য ছেলের সঙ্গে ভাব ছিল, দাদার সঙ্গে ঘর করবে না। না না মিছে কথা, বাপের বাড়ি চলে যাবে বলে ওরকম করত। এখন আমরা সেইটা বলে ক্ষেপাই। এখন আর অমনি করে না থাকে এখানেই কিন্তু সারাদিন ঝগড়া করে। বাড়িতে কিছু কাজ করে না। বলে তোমরা বাইরে যাবে—ঘর মুছলে বাসন মাজলে টাকা পাবে। আমি তো পাব না, তবে আমি করব কেন? তবু আমার সঙ্গে গল্প করে। দাদার সঙ্গে বেশি ঝগড়া। কী করবে? মা বলে কী করে আমি সংসার চালাবো?

তখন বৌদি দাদার সঙ্গে লাগে, তুমি কেন কাজকর্ম কিছু করো না? যা পয়সা পাবে বাবুগিরি আর নেশা করে ফুটাবে। ছেলেগুলো কী আমি বাপের বাড়ি থেকে এনেছি? ব্যাস! দাদা রেগে গিয়ে মারে। চিল্লাচিল্লি হয়। দাদা আমাদেরও মারে। বড় হয়ে গেছি, তবু মারে।

যখন আমার জন্ডিস হয়েছিল, তখন তো আমি ঘর থেকে বের হতে পারতাম না, তখন কে একজন দাদাকে বলেছে তোমার বোন একটা লোকের সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাসছিল। আর দাদা এসেই আমাকে ধরেছে। তবু আমি বলেছি, দাদা, যদি লোকে বলে চিলে তোমার কান নিল, তুমি কি কানে হাত দিয়ে দেখবে না আগে চিলের পিছে ছুটবে?

তাতে দাদার আরও রাগ হল, মুখে মুখে জবাব করছিস? বলে আরও মারল।

জন্ডিস হয়েছিল কিছুদিন আগে। এই পাঁচ ছ'মাস আগে। তখন থেকেই তো আমি কাজ করতে পারছিলাম না। বসেছিলাম। যাদের সঙ্গে দিল্লি গেছিলাম ওরা কী একটা দূর দেশে চলে গেল। সেখানে সবাইকে কেবল এরোপ্লেনে করে উড়ে উড়ে যেতে হয়। ওরা চলে যাবে বলে আমি ফিরে এলাম। তারপর এখেনে একদুটো বাড়িতে কাজ ধরে ছিলাম, তখনই তো অসুখ হল। খালি বমি হত, হলুদ হয়ে গিছল সারা গা, তারপর ওষুধ করে সারল কিন্তু শরীর ঠিক হল না। জন্ডিসের ওষুধ হয়। একটা শেকড়ের

জিনিস হাতে বেঁধে দেয় আর পনের দিন তেল ছাড়া শুধু সেদ্ধ খেতে বলে। সেই জিনিসটা ধীরে ধীরে হলুদ হয়ে ওঠে আর তোমার গায়ের হলুদ নেমে যাবে। তোমরা বিশ্বাস করনা তো? কিন্তু ওতে ঠিক সেরে যায়। তাবলে নিরামিষ সেদ্ধ ভাত কতদিন আর খাবো? বিশ্রাম আর আমাদের ঘরে কী করে হবে বলো? তখনই তো দাদার শালীর বিয়ে ছিল, দাদা দশদিন আগে সবাইকে নিয়ে চলে গেল। একবার তো ভাবতে পারত বৌদি, যে তমালী কী করে পারবে, দুটো দিন পরে যাই। সে নয়, চলে গেল। বাবাও বোঝে না। মা-দিদিরা সকালবেলা তোমাদের এই হাউসিংয়ে কাজ করতে চলে আসে, ফিরতে ফিরতে তিনটে। একঘণ্টা তো যেতেই লাগে। তাও বাবার সেই লোকজনকে খেয়ে যেতে বলা চাই। একদিন না হয়েছে কি, আমার খুব গা কেমন করছে, একেবারে উঠে দাঁড়াতেই পারি না, বাবার পার্টির লোকেরা এদিকে খাবে। তিন কিলো চাল বসিয়েছি, কিন্তু কী করে যে হাঁড়িটা নামাব, ভাবতেই পারছি না। উনুনে বাতাস করতেও পারছি না। মাথাটা হাতে করে ধরে বসে আছি। আবার ভাবছি, যদি আমি না করি মাকে ফিরে এসে সব করতে হবে। বাবা এক দুইবার ভিতরে এসে দেখেছে। বলছে,

'তাই তো রে, তোর তো শরীরটা আজ খুব খারাপ করছে। ভাতের হাঁড়িটা তুই নামাতে যাস না, আমি নামায় নিব।' তো, আমার এক জামাইদাদা আছে, নুনি গাঁয়ে থাকে। কালিপুজোর সময় যে খুব বড় মেলা হয় সেই নুনি গ্রামে। সাইকেল করে আমাদের গ্রাম থেকে কুড়ি মিনিটে ওদের গ্রামে পৌঁছনো যায়। সে আমার বাবার সঙ্গে বাঁশি বাজায়। সেদিন সেও এসেছিল। সে ভিতরে এসে আমাকে দেখে একদম জোর করে বলে দিল,

'আমি ডাল বানাব, আলু চোখা বানাব সব করে নেব। তুমি যাও চুপচাপ শুয়ে থাকো, না তো তুমি এখনি পড়ে যাবে'।

সে অনেকবার বলতে আমি গিয়ে শুয়েছি, আর আমি কিছুই জানি না। সবাই নিজেরা খেয়ে নিয়েছে, নিজেরা বাসনও ধুয়ে রেখেছিল। কখন মা কাজ থেকে ফিরেছে সেও জানতে পারিনি।

ওই জামাই দাদাকে আমার খুব ভালো লাগে। দিদি খুব খরখর করে। আমার বাবার কাছে রোজ আসে। এক একদিন ঝগড়া হলে আমি দেখেই বুঝে নিই, আর জিজ্ঞেস করি,

কী হয়েছে? তো প্রথমে কিছু বলে না, আমি বলি,

মন কেন খারাপ করে থাকছ? তখন বলে,

—তোমার দিদি ঝগড়া করে ভাত রান্না করে না।

—তুমি পয়সা আনো না বলেই তো রাগ করে।

—যেদিন আনি না সেদিন ঝগড়া করে, যেদিন আনি সেদিনও তো ঝগড়া করে—কোনোদিন বলে,

—আমাদের ঘরের কথা তুমি শুনে কী করবে?

—বললে মনটা হালকা হবে।

তো আমি সবার সঙ্গে হাসি গল্প করলে মা বাবা বকে। এই জামাইদাদার সঙ্গেও একটু গল্প করি, হাসি তাতেও আমার বাবামায়ের রাগ। কী করব, আমার একে খুব ভালো লাগে। সেদিনের অসুখে সেই যে বেহুঁশ হয়েছিলাম তারপর চার পাঁচদিন ভালোমতো কথা বলিনি, খাইনি, চোখ মেলে ভালো করে তাকাইনি। তখন মা খুব কান্নাকাটি করেছিল। বাবাও কেঁদেছিল। বাইরে কোথাও বাজাতে যায়নি বাড়ি ছেড়ে। পাড়ার সবলোক আমাদের বাড়ি।

তারপর থেকে সেরে উঠেছি, এখন তো ভালো হয়েছি, আমাকে আর কেউ বকাবকি করে না। বিয়ের জন্যও আর জোর করে না। একটা বাড়িতে কাজ নিয়েছিলাম, ছেড়ে দিলাম। সে বাড়ির ছেলেটা কী রকম, বিচ্ছিরি। উঁচু লম্বা ফর্সা। সারাদিন পড়াশুনো করে। আমি ভাবলাম ভালোই—বেশি কাজ নেই। ছেলেটা আর ওর মা-বাবা। ছেলেটা বাড়িতেই থাকে সারাদিন। ওর মা রান্নাঘরে কাজ করে, আমি ঘর মুছি ঝাঁট দিই, হঠাৎ দেখি ওইটা আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি চমকে উঠেছি। আবার দেখি, তোমাকে কী বলব, চান করে সব জামাকাপড় খুলে ন্যাংটা হয়ে আর দরজাটা খুলে রাখে। আমি অতো ভয় পাই না, গিন্নীটাকে বললাম,

তোমার ছেলের কী কাজ আমার সঙ্গে?

ও বলেছে যে, না না আমার ছেলে বাচ্চা। ও কিছু বোঝে না এমনি তোকে দেখছিল। আরো দুদিন দেখলাম। চট করে তো ছাড়তে পারিনা বলো, টাকা তো লাগবে। অতজন লোক বাড়িতে। এদের কাজ কম। কিন্তু তাও দেখি ওরকমই চান করে। আমাকে দেখে হাসছে। যে কাজ ঠিক করে দিয়েছিল তাকে বললাম, সে বলল,

অসুবিধা দেখলে ছেড়ে দিবি। পরদিন দুপুরবেলা গিন্নিটা বলছে,

আমি কালীমন্দিরে যাচ্ছি, তোর কাজ কর। শেষ হলে আমার ছেলেকে বলে চলে যাস। ওরে বাবা। আমি বলে দিলাম,

আমি একা বাড়িতে কাজ করব না। চলে এলাম সোজা। কিছু হলে তখন আমাকে কেউ বাঁচাবে না। ওর মাটাও আমাকেই দোষ দেবে। আমি কেন থাকব?

কত বাড়ি দেখা হল। এখনো তো বেশি বড় হইনি। যখন মায়ের মতো হব ততদিনে আরো কত বাড়ি দেখব। কত ভালো কত খারাপ। মায়ের মতো বড় হওয়া অবধি কী আমি বাড়িতে বাড়িতে কাজ করতেই থাকব? না, বরং ভাবি যে বাবাকে বলব আমাকে বিয়ে দিও না, আমাকে তোমার পার্টিতে নিয়ে নাও। দাদা আছে আমিও থাকব। আমাকে ওই চকচকে সানাইয়ের মতো বাঁশিগুলো বাজাতে দেবে। আমি তো বাজাতে পারি, বাড়িতে যখন বাবা থাকে না আমি এক একদিন বাজাই। জামাইদাদাও এগুলোই বাজায়। আমাকে খানিক ওই সুরগুলো শিখিয়ে দেবে। ওরা যা বাজাতে বলো সব বাজাতে পারে। আমি তো আর দাদার মতো নেশা খাব না, দুটো পয়সা পেলে ঘরেই আনব। বলব বাবাকে।

ঘৃণার সমস্যা

গত দুদিন যাবৎ আমি একটু সমস্যায় আছি, যে কোন রকমেই হোক সেটার একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাওয়া দরকার। কিছু না কিছু সমস্যায় তো লোক সারাটা জীবনই থাকে, শান্তি আর কোথায়! কিন্তু সেগুলো যেন খানিকটা চেনা ব্যাপারে—নিজের কি বৌ ছেলের নিদেন মা বাবার অসুখ, সাংঘাতিক অসুখ এমনকি ক্যান্সারও, না হলে ছেলে চাকরি, ছেলেপুলে স্কুলে ভর্তি কি পড়াশুনোর সমস্যা, মেয়ের বিয়ে কিংবা তাদের প্রেম এমনকি স্বামী-স্ত্রীর একে অন্যক সন্দেহ, খিটিমিটি, অশান্তি—এ সব সমস্যার কোন না কোনটা, একসঙ্গে কয়েকটাও মানুষের জীবনে আসে। কোন মনে তার কিছু সমাধান একরকম করে হয়। কখনো বা হয়ও না। চলতে থাকে। আমরা অফিসে দপ্তরে কলম পিষতে থাকা লোক, এর চেয়ে খুব একটা বেশি আর কীই বা আশা করতে পারি!

এক এক সময়ে এক এক রকম ঝঞ্ঝাট। এই তো আমারই মনে আছে, খুলনা ছেড়ে বাবা কাকাদের চলে আসাটা। স্পষ্ট কিছু মনে পড়ে না অবশ্য কিন্তু মায়ের কোলে চাদরে ঢাকা হয়ে রাত্রির অন্ধকার কোথায় যেন যাওয়া, নৌকোয় ওঠা, অন্ধকার নদীর জলে এক দুটো আলো, জলেক মধ্যে সেগুলোকে দেখাচ্ছে কাঁপাকাঁপা লম্বা জরির ফিতের মতন, যেমন ফিতে দিয়ে পুজোর সময়ে দুর্গাঠাকুরের সাজ হত। ট্রেনে বেশ ভিড়, আবছা মনে আছে, বাবা বোধহয় খেতে দিলেন পেঁপে, হলুদ রঙের নৌকোর মতো কাটা। ওইটুকু। তারপর তো এপারে। বারাসাতে স্কুলে যেতাম, বেড়ার ঘর ছিল। দু-এক বছর পরই বোধহয় পুজোর সময় দুয়োরে অনেক লাল গোলাপি দোপাটি। তারপর তো পার্কসার্কাস। অনেক ভালো, এমনকি দৌলতপুরের বাড়ির চেয়েও, তবু দোপাটি ফুলগুলির জন্য আমার আর বুলির মন খারাপ হয়েছিল। তখন বাবার নতুন চাকরির সামান্য মাইনেতে টানাটানি করে দিন চালাতে মায়ের কষ্ট হত এখন বুঝি, কিন্তু তা নিয়ে বাড়িতে কোনদিন বাবা-মাতে ঝগড়াঝাঁটি হতে দেখিনি। বরং ঠাকুমা কখনো কখনো আমাদের খাবার পাতে দুধ কি মাছ না থাকার দুঃখ করত, 'নিজে গো দ্যাশে—' বলে। মা কিম্বা বাবার কানে গেলেই বুড়িকে থামিয়ে দিত। 'যা গিছে গিছে—ছোটগুলির মাথায় আর সেইগুলি ঢুক্যায়া কি লাভ!' ঠাকুমাও 'না—বলতিছিলাম, মনে তো হয়—' পর্যন্ত বলে চুপ করে যেত। দাদা স্কুলে রেজাল্ট ভালো করত। বুলিটাও পড়াশুনোয় ভালো ছিল একেবারে শুরু থেকেই।

না হয়ে উপায় ছিল না। বুঝতে পারতাম আমরা রেজাল্ট খারাপ করলে বাবা মা মনে ভীষণ কষ্ট পাবে। আর সেটা আমরা একেবারে ভাবতে পারতাম না। বাবা এক একদিন সন্ধ্যেয় কি সকালে চৌকির ওপর পিঠ সোজা করে বসে কবিতা বলত 'লক্ষ বক্ষ চিরে, ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ পক্ষী সমান ছুটে যেন নিজ নীড়ে' কিংবা 'ইংরাজ সেনা ছুটে পশ্চাতে শেষে বহুদূরে বনে নিরালাতে সাক্ষাৎ হল ঝাঁসিরানী সাথে বিশাল নদীর তীরে'। আমরা তিন ভাইবোন পড়াশোনা ছেড়ে সে সব দিনে একেবারে মুগ্ধ শ্রোতা। মাও তাই। আমি আর দাদা তখন একটু বড় হচ্ছি, ভারি ভালো লাগত সেই সকাল-সন্ধ্যাগুলো,—মা রান্নাঘরের দরজার পিছনে আধখানা, কিন্তু মুখ দেখলেই বোঝা যেত মা সবকিছু ভুলে গেছে আশপাশের। তারপর হঠাৎ আমাদের দিকে চোখ পড়লে যেন একটু লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ঢুকে যেত। কখনও এক-আধদিন অনেকরাত্রে বিছানায় শুয়ে শুনতাম বাবা বাঁশি বাজাচ্ছে, আমরা জানতাম—মাকে শোনাচ্ছে। অথচ রোজকার জীবনে যেমন আর পাঁচজনের মতই। তবু এই বাবা-মায়ের মনে কষ্ট হবে এমন কোন কাজ করবার কথা আমরা ভাবতেও পারতাম না।

অথচ না ভেবেও কতো কিছু যে হয়ে যায় জীবনে! সেই যে বাবার মুখের আবৃত্তি, তার শব্দের ঝংকার আমাকে যেন আছন্ন করে রাখত, আর সাহস আত্মত্যাগ বীরত্বের সেই সব কবিতা! সিটি কলেজে পড়তে পড়তে কি করে যে যোগাযোগ হয়ে গেল কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে আর তার চেয়েও আশ্চর্য আমার যে কোন আবৃত্তি বা ডিবেটের সভায় পাড়ার যে দুবেনী বাঁধা ফর্সা মেয়েটাকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে দেখতাম সে মেয়েটা হঠাৎ কখন আমার কাছে আস্ত একটা তনুকা হয়ে উঠল, দেখলে বুকের মধ্যে টিপ্‌টিপ্ না দেখতে পেলেও তাই—দুটোর কোনটারই শুরু তেমন স্পষ্টভাবে খেয়াল করিনি। প্রথমটার কারণ অবশ্য আজ বুঝি, সেই পঁয়ষট্টি-ছেষট্টির যেন বাতাসেই ছিল অন্য রকম। আগুন ধরানো বাতাস। আঁচ বাড়ছিল তো সেই বাষট্টি-চৌষট্টি থেকেই। বাবা যেন খানিকটা ভেঙে এসেছিলেন চৌষট্টি থেকেই, নাকি আমরা বুঝিনি ঠাকুমার মৃত্যুই আরও বছর তিন আগে থেকে বাবাকে ভাঙছিল। ঠাকুমা যে বছর মারা গেল আমি স্কুল ফাইনাল দিচ্ছি। রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী নিয়ে চারদিকে উৎসবের বান ডাকছে। নির্দিষ্ট কিছু অসুখ বোঝা যায়নি। খাওয়াদাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছিল, কথাও বলছিল না আর । রোজই অল্প অল্প জ্বর আসত, হাত পা মুখ ফোলা ফোলা। যতটুকু কথা বলত সবই প্রায় কেবল দৌলতপুরের বাড়ির কথা। বাবা অফিস থেকে ফিরে ঠাকুমার ঘুমোন পর্যন্ত ওই বিছানার পাশেই বসে থাকত। ঠাকুমা যেন নিজের আশপাশ পরিবেশ সব ভুলে গিয়েছিল। একটু যতটুকু কথা বলত বিড়বিড় করে কেবল দৌলতপুরের বাগান কাঁঠালগাছ গরুর রাখাল, হঠাৎ কোন দিন মাকে ডেকে আস্তে আস্তে জিগ্যেস করত,

নয়নবৌ, খিড়কি বন্ধ করিছ? কাইল ছোট ঘরের কাঠের বাক্স থিকে কাপড়চোপড় বাইর কইরে একটু রোদ্দুরে দিও।

মা উঠে গিয়ে চোখ মুছত। যাঁদের সঙ্গে বাড়ি বদলাবদলি করে এই পার্কসার্কাসের বাড়ি আমরা পেয়েছিলাম সেই ফইজুদ্দিন সাহেবের জামাই বর্ডার সিকিওরিটিতে চাকরি করতেন। সেই সুবিধের কারণেই হয়ত তিনি বছরে, দু'বছরে একবার আসতেন। ঠাকুমাকে আম্মা বলতেন তিনি। তিনি এলে ঠাকুমা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কতো যে কথা জিগ্যেস করত! বাড়ির, বাগানের, ঘরের কুলুঙ্গিগুলির পর্যন্ত। বাবা হয়ত কখনও একটু অপ্রস্তুত হতেন। ফইজুদ্দিন সাহেব, তাঁকে অনেক বছর ধরে বাবার কথামত, চাচাজান বলতাম আমরা, বাবাকে নিরস্ত করতেন। বলতেন,

ভাই, আমরা মুখ বুজে থাকি, আমরা তো কায়দা-কানুন মেনে চলি। মনে কি হয় বাইরে আনতে পারি না। যাঁরা তা বলতে পারেন তাঁদের বাধা দেবেন না। এই আম্মাজান যেমন, ওইখানে আপনাদের ভাবিরও সেই এক অবস্থা। আপনাদের অতোখানি ছড়ানো জায়গা, ফলফলারির গাছ, পুকুর—তবু সে এইখানকার জন্য চোখের জল ফেলে। বারণ করি না। কি জানেন, এদের কান্নার মধ্যে আমরাও কাঁদি।

বাবা ওঁর ছেলেদের খবর নিতেন। চাচাজানের বড় ছেলে দৌলতপুর কলেজে পড়ে ততদিনে। বাবা নিজে এককালে ওখানকার ছাত্র ছিলেন। চাচাজান দুপুর রোদেও একবার পার্কসার্কাস ময়দানটা ঘুরে আসতেন।

সেবার ঠাকুরমাকে ওরকম দেখে শান্ত চাপা স্বভাবের মানুষটিও বিছানার পাশে বসে কেঁদে ফেললেন। এত বছরের মধ্যে সেই একদিন রাত্রে রয়ে গেলেন। ঠাকুমার ঘুমোবার পর খেতে বসে বললেন, যদি কোন উপায় থাকত আম্মাজানকে আমি একদিনের জন্যও তাঁর বড়িতে নিয়ে যেতাম। যে মানুষগুলি চারদেওয়ালের ভিতরে থাকে ভাইজান, তারাই ওই দেওয়ালগুলোকে বাড়ি বানায়! সেই বাড়ি ছেড়ে আসতে তাদের যে কোথায় লাগে—!

এই একবারই বোধহয় বাবাকে ওই বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে শুনেছিলাম। বাবা বলে উঠলেন, কতগুলি লোক নিজেদের লাভ-লোকসানের প্যাঁচ কষে দেশটাকে টুকরো করল, আর একদিনের মধ্যে কোটি কোটি মানুষের জীবন তছনছ হয়ে গেল। রাগারাগি হোক ভাব ভালোবাসা হোক আমরা নিজের নিজের জায়গায় মিলেমিশে বেশ ছিলাম, একটা লোকও চায়নি নিজের ঘরদোর ছেড়ে এই রকম অন্যদেশে অন্য লোকজনে গিয়ে পড়তে। তারা নিজেদের সুবিধার জন্য হাওয়া দিয়ে দিয়ে আগুন বাড়ায় আর মরলাম আমরা, আপনারাও। দেশ কাটবার আগে কর্তারা সবাই সবার সঙ্গে কত বৈঠক করলে, কিন্তু আমাদের কেউ জিজ্ঞেস করেছিল একবারও!

এসব কথা বাবার মুখে কখনো শুনিনি। মা আস্তে আস্তে বলে, ও সব থাক। খাওয়ার সময়ে আর এসব কথা না তোলাই ভালো।

সেবার ফইজুদ্দিন সাহেব চলে যাবার মাসখানেকের মধ্যে ঠাকুমা মারা যায়।

তারপরে একবারই এসেছিলেন চাচাজান। ছাদের সিঁড়িতে বসে রইলেন চুপ করে হাতে মাথা রেখে। দৌলতপুরের অনেকগুলো ছবি এনেছিলেন—বাড়ির, রাস্তার, কলেজের, রাস্তার মোড়ে ডিস্পেনসারির। রেখে গেলেন মায়ের কাছে। বলে গিয়েছিলেন আসবেন আবার। কিন্তু আর আসেন নি। চৌষট্টি সালের যুদ্ধের পর বর্ডারের কড়াকড়ি অনেক বেড়ে গেছে বলে শুনতাম। হরদম 'পাক ছত্রীসৈন্য'র কথা শোনা যেত পথেঘাটে। সে সময়ে লোকের দেশপ্রেম হঠাৎ সাংঘাতিকভাবে বেড়ে উঠেছিল। তার আগে চীন-ভারত যুদ্ধেও এরকম দেশপ্রেম বেড়ে উঠতে দেখেছিলাম। তখনও আমরা স্কুলের নিচু ক্লাসে পড়ি। চাইনিজ ইঙ্ক কিংবা চিনাবাদামের নাম কেউ উচ্চারণ করলেও দেশদ্রোহী বলা হচ্ছিল তাদের। বরাবরই দেখেছি দেশপ্রেম বাড়লেই কিরকম যেন রাগী হয়ে ওঠে লোকে। চৌষট্টিতেও রাস্তার গৌটাকতক কাগজ-কুড়োনেওলাকে দু-চারবার ধরে আনল পাড়ার উৎসাহী ছেলেরা, বম্বেতে জনি ওয়াকারের প্রায় ভাত উঠে গেল।

ছেষট্টির খাদ্য আন্দোলন। কলেজ পাস করে গিয়েছি কিন্তু মনে মনে ছাত্রফ্রন্ট থেকে সরে আসতে পারিনি তখনও। দাদা সেনর‍্যালেতে চাকরি পেয়েছে। কোয়ার্টারও। চলে গেছে বৌদিকে নিয়ে। তনুকা মাঝেমাঝেই চাপ দিচ্ছে বাড়িতে বলার জন্য। ও নিজের বাড়িতে বলে দিতে চায় কেননা ওর বাবা-মা চারদিকে সম্বন্ধ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কেউ দেখতে এলে ও যাবে না সেকথা স্পষ্ট বলে দিয়েছিল। তাই ও চায় যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজের ব্যাপারটা জানিয়ে দিতে।

এর মধ্যেই ছেষট্টিতে এসে পড়েছে প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা। সে যে কি উত্তেজনার ব্যাপার! মনে হচ্ছে সব সমস্যা মিটতে চলেছে এইবার । এই কলকাতা শহরটাকেই মনে হচ্ছিল যেন রেড স্কোয়ার! তারপর তো কদিন যেতে না যেতেই মারামারি খেয়োখেয়ি! স্বপ্নে চিড় ধরে গেল। সেও এক অন্যরকম সমস্যার সময় গিয়েছে। কোনটা যে ঠিক আর কোনটা ভুল। এতদিন বিক্ষোভ মিছিলে মীটিংয়ে যেসব জিনিসকে ধিক্কার দিতে শুনেছি কি করে সেই সব লোক, সেইসব কাজকর্মসুদ্ধই নিরুপদ্রবে রয়ে যাচ্ছে, কেবল তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলা বন্ধ হয়ে আসছে ধীরে ধীরে—এসবে বেশ গোলমাল লাগত। অবশ্য তখন রাজনীতি ছেড়ে একটু একটু করে নিজের সমস্যা নিয়ে জড়িয়ে পড়ছি সে কথাও ঠিক। চাকরি পাওয়ার তাড়াটা অস্থির করছে।

মায়ের বুদ্ধি আর পরিশ্রম, একতলার দোকানঘর দুটোর ভাড়া—বাড়ির অবস্থা ঠিক আমার চাকরি না হলে ভাতে টান পড়বে এমন ছিল না। কিন্তু ওই যে, চাকরিটা পাওয়ার দরকার ছিল আমার সমস্যার অর্ধেক, বাকি অর্ধেক সমস্যাটা ছিল চাকরি না পেলে তনিমাকে বিয়ে করার কথাটা আমার বা ওর বাড়িতে তোলাই সম্ভব ছিল না। এল আই সি-র এই চাকরি পাওয়ার পর সে সমস্যা মেটাতে অবশ্য খুব বেশি কাঠখড় পোড়ানোর দরকার হয়নি। তনিমারা আমাদের স্বজাতি। ওদের বাড়ির

অবস্থা আমাদের থেকে ভালো, কিন্তু চার-চারটি বোন। পাত্র হিসেবেও আমি খারাপ নই। তার ওপর কোনও পণ না নিয়ে বিয়ে করেছিলাম। আমার মায়ের তাতে মত ছিল, বাবা একটু গাঁইগুঁই করেছিলেন। বউভাতের খরচা কী ছেলের ঘর থেকে হবে নাকি? তাতে মা একেবারে স্পষ্ট বলে দেন—ছেলের আজ পর্যন্ত যা কিছু দরকার হয়েছে সবকিছু যদি তার বাপ-মা জোটাতে পেরে থাকে, নিজের ছেলের বউভাতে কী মেয়ের বাপের কাছে হাত পাততে যাব? অবশ্য তখন আমাদের বন্ধুবান্ধবরা অনেকেই এরকম ধরনের ভাবত। বিয়ের পণ নেওয়াটা একটু সেকেলপনাই মনে হত। দু-চারজন যদি গোপনে নিতও তো বাইরে সেটা চেপে যাবারই চেষ্টা করত। পণ নিয়ে বিয়ে করেছে, এটা ঢাক পিটিয়ে বলার মতো ব্যাপার ছিল না। অথচ মাত্র এই কুড়ি-পঁচিশ বছরেই অবস্থাটা কী করে এত পালটাল তাই ভাবি। এখন আমাদের অফিসের এই নতুন ছেলেগুলো বিয়ে ঠিক হলেই বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসে কোন্ কোম্পানির স্কুটারের ইঞ্জিন ভালো কিন্তু তেল কম খায়, কোন্ কোম্পানির স্টিল আলমারিতে একটা লকার এক্সট্রা থাকে—এইসব পণের টাকাটা নাকি 'মা বাবার ব্যাপার'। বেশিরভাগ সময়েই বিরক্ত—কারও না কারও নিন্দে করছে। হয় নিজের বউয়ের নয় ছেলের বউয়ের, আর না হলে কমবয়সী ছেলেপুলেদের। সব সময়েই বলছে—আমাদের আমলে—আমাদের কালে—অথচ নিজেরা যে কত পালটে গেছে তা খেয়াল করে না। ধরিয়ে দিলে খুশিও হয় না সব সময়। এই তো রথীন, কতকালের বন্ধু। কলেছে পড়েছি একসঙ্গে, প্রেম করেছি একসঙ্গে, চাকরিতে ঢুকেছি। বিয়েটা অবশ্য ওর দেরীতে হয়। রথীনরা একেবারে মুখুটি কুলীন আর সীমারা জাতে ছিল সোনার বেনে। সে আর কী করা যাবে! অত হিসেব করে প্রেম হয় নাকি? ঠিকুজি কুষ্ঠী মিলিয়ে? রথীনের বাপ-মা আমার বাপ-মায়ের মতো ছিলেন না। সে অনেক কেলেঙ্কারি। জাতপাত, পিতৃপ্রাধান্যের পারিবারিক আভিজাত্য সব কিছুর বিরুদ্ধে লড়ে গিয়ে রথীন আমাদের হিরো হয়ে গেছিল । আর বিশ্বাস হয়, সেই রথীন মেয়ের পাত্র পছন্দ করেও বাদ জন্মকুণ্ডলী মিলছে না বলে? গুরুর আদেশে? সেই কথা সেদিন বলেছিলাম—সে কিরে! নিজের বেলায় কোন্ কুণ্ডলী মিলিয়েছিলি? তাতে দস্তুরমতো রেগে গেল রথীন। এতদিন পর ওসব কথা তুলে আমি নাকি ওর ফ্যামিলি স্ক্যান্ডাল বাইরে টেনে আনছি। স্ক্যান্ডাল! হবেও বা । বাড়ি ফিরে তনুকে তনুও আমাকেই দোষ দিয়েছিল।

ঠিকই তো। সবাই কী তোমার মতো? এতখানি বয়স হয়েছে কোনও আচারবিচার মানা নেই। তনুও পাল্টেছে। আমি নিজে কি পাল্টাই নি? তনুর পাল্টানো আমি বুঝি। শুধু দুটো মানুষেরই সংসার রয়ে গেল আমাদের, নতুন কেউ আসেনি—এই কষ্টটা ওকে এখনও ভিতরে ভিতরে খেয়ে ফেলতে থাকে। প্রথম প্রথম হতাশায় অস্থির হয়ে উঠেছিল। তখনই প্রথম মানত তাবিজ এই সব শুরু করেছিল। আমি দু-একবার বলেছি,

মানত করা কেন তনু? তোমাদের ভগবান কি ঘুষ খান? রেগে গিয়েছে। সেই অস্থিরতাটা কেটে গিয়েছে সময়ে, কিন্তু ফাঁক ভরাট হয়নি। ক্ষতটা ঢাকা পড়েছে, সারেনি। এমনকি মা কিছু না বললেও বৌদি প্রথমদিকে একটু-আধটু বাঁকা কথা শুনিয়েছিল তনুকে। দাদার সংসারের সঙ্গে আজও তনুর, ফলে আমারও, একটু ফাঁক বয়েই গিয়েছে যেন। যতো দিন যাচ্ছে, সমবয়সীদের থেকে সরে, স্বজনদের থেকে সরে, উত্তরপুরুষ বিহীনভাবে আমি যেন আরও বেশি করে কেবল তনুর কাছে কাছেই সরে থাকতে চাই। অন্তত এইখানে যেন একটা সঙ্গী থাকে যার সঙ্গে বোঝাপড়া আছে, সম্পর্ক আছে, ভালোবাসাও আছে।

তনুর কথাটাকে হালকা দিকে নিয়ে যেতে চাই আমি, কেন, তোমার সংসারের কোন্ ডিসিপ্লিন আমি মানি না তনু? সেগুলো কী সাংসারিক আচার নয়?

সে কথা নয়, যা সবাই করে, তোমারই বা কেন সর্বদা তার বাইরে মতি?

সবাই যা করে মানে? সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে তোমার সঙ্গে বসে দু-কাপ চা না খেয়ে টি-ভি দেখা? তনু রাগতে গিয়েও হেসে ফেলেছিল। কিন্তু নিজের জমি থেকে নড়েনি,

ঢঙ করো না, সবাই আমায় জিগ্যেস করে তোমরা মন্ত্র নাওনি? নেবে না? আমার ভালো লাগে না অত কথা। কেন, কী হত দীক্ষা নিলে?

তনু, একথাটা অনেকদিন হয়ে গেছে। তোমাকে তো আমি বলেছি তোমার যদি মনের ভেতর থেকে বিশ্বাস আসে যে যিনি তোমাকে দীক্ষা দিচ্ছেন তিনি মানুষ হিসেবে অন্য সকলের চেয়ে অনেক বড় কিংবা তিনি তোমাকে কোনও ঈশ্বরের কাছাকাছি পৌঁছে দেবেন, কিংবা তোমার মনের মধ্যে কোথাও এমন কোনও বোঝা জমে রয়েছে যা বাইরের কারও কাছে বলতে পারলে তোমার মন হালকা হবে— তুমি দীক্ষা নাও। আমার এর একটাও নেই, কাজেই আমার কারও কাছ থেকে দীক্ষা নেবার দরকারও নেই। তবে হ্যাঁ, আমি তোমায় কেবল এইটুকু বলি, সবাই নিচ্ছে বলে নেব এটা করো না! এটা ওই লেটেস্ট ফ্যাশানের শাড়ি, লেটেস্ট ফিল্মস্টার পর্যন্তই ভালো।

আগের আরও অনেকবারের মতোই মুখ গম্ভীর করে উঠে গেছিল তনু।

কিন্তু এখন সমস্যাটা আর ঠিক এরকম জায়গায় নেই। মুশকিলটা অনেক গভীর ঠেকছে এজন্য যে এটা এসেছে ওই যাদের বুঝতে পারি বা না-পারি ভালোবাসি, সেই কমবয়সীদেরই ক-জনের কাছ থেকে। শুরু হয়েছিল খুব সাধারণভাবে। লাঞ্চ আওয়ার্সের একটু পরে নিচের ক্যান্টিনে বসে পাঁচরকম কথা হচ্ছিল। অখিলের মেয়ের বিয়ে হয়েছে আসানসোলে, গতমাসে টিভিতে আসানসোলে কার্ফু, মিলিটারি নেমেছে এসব খবর শুনে সকলেই কমবেশি উদ্বেগ ছিলাম। ওর জামাই বিল্ডিং-কন্ট্রাক্টর। সময়ে অসময়ে বেরোয়। পাঁচরকম লোকের সঙ্গে ওঠাবসা করে। শহরে

দাঙ্গা হলে চিন্তায় কথা তো বটেই। তো এই তিনচারদিন হল মেয়ে এসেছে অখিলের। বলছে—না, কিছুই প্রায় হয়নি আসানসোল। পুলিশ খুব চমৎকার সামলে নিয়েছে। কার্ফু, মিলিটারি—এর বেশিটাই ছিল সাবধানতার জন্য। তা থেকে পুলিসের ভূমিকা, তা থেকে বম্বে। অনেক কাগজেই তো লিখেছে দেখেছি যে বস্তিগুলোয় আগুন লাগানোর সময়ে পুলিশ নাকি রাজনৈতিক দলের কথায় চলেছে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশানের নয়। এইসব নিয়ে চলছিল। এ দেশের আর কিছু হবে না হে, সব কিছুতেই পলিটিকস্ ঢুকে গেছে, বলে উঠে পড়ার সময়ও হয়ে গিয়েছিল। পাশের টেবিলে ক'টি কমবয়সী ছেলে ছিল। মুখ চিনি, বিলিং সেকশানে কমপিউটার রুমে বসে। ওরা যে নিজেদের আলোচনা থামিয়ে আমাদের কথাবার্তা শুনছিল, খেয়ালও করিনি। হঠাৎ আমার কথার মাঝখানে উঠে এসে ওদের একজন খুব রুক্ষভাবে বলল, সব সময়ে নিজেদের জাতের নিন্দে করাটা আপনাদের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্য ধর্মের লোকদের ইউনিটি দেখেছেন? মুরুব্বি যা বলে দেবে জাতসুদ্ধ লোক এককাট্টা হয়ে শুনবে। আর শালা আমাদের দ্যাখো, নিজেদের দেশটার ওপর প্রেম নেই, নিজেদের ধর্মে ভক্তি নেই। কেন, যে লোকগুলোর নামে যে বলছিলেন আপনি—আপনার কী ক্ষতিটা করেছে তারা? তাকিয়ে দেখি আমাদের টেবিলে কেবল আমি আর অখিল, বাকিরা সরে গেছে। এই ছেলেগুলো আমার অফিসে কাজ করে, ঢুকতে বেরোতে কতবার দেখা হয়েছে অথচ কী রকম অচেনা মনে হচ্ছে। ওরা যে ভাষায় যেভাবে কথা বলছে এটা অফিসে প্রেমিসেসের মধ্যে, অন্তত ত্রিশ কী পঁচিশ বছরের সিনিয়র কোনও সহকর্মীর সঙ্গে বলবার কথা কল্পনা করা যায় না। কিন্তু আমি দেখলাম কোথাও একটা কোনও চোখের দৃষ্টিও এপাশে ফিরল না। বেশিরভাগ টেবিল খালি হয়ে গেছে, কেবল কাউন্টারের কাছকাছি দুটো টেবিলে নিউ বিজনেস সেকশানের ক-জন চা খাচ্ছে। তারা এমন নির্বিকারভাবে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে যেন এখানে, এই দুটো টেবিল দূর থেকে কোনও শব্দ হচ্ছে না, যেন এখানে কোনও লোক নেই। অখিল পিঠের পাশ থেকে 'আমি তাহলে সেকশানে—' গোছের কী একটা বিড়বিড় করে বলল। বুঝলাম অখিল চলে যাচ্ছে। আমি ছেলেগুলোর দিকে ভালো করে তাকালাম। দামী পোশাক-আশাক। জনা-দুয়েকের শার্টের খোলা বোতাম দিয়ে রুপোর চেনে গাঁথা ছোট নীল লকেট দেখা যাচ্ছে, একজনের রুদ্রাক্ষ। পাঁচজন আমাকে এমনভাবে ঘিরে দাঁড়িয়েছে যেন ওরা আমাকে আক্রমণ করবে। হঠাৎ এ রকম অদ্ভুত একটা পরিস্থিতিতে আমার কেমন ভয় হচ্ছিল সত্যি, আবার ভিতরে ভিতরে রাগও হচ্ছিল।

কী হল, উত্তর দিচ্ছেন না যে? ওদের মধ্যে একজন বলে উঠল,

না, বলার কী আছে—দেশের এত বড় একটা ট্রেডসেন্টার—যেখানে সব জাতধর্মের লোক বাস করে, চিরকাল করছে—সেখানে একটা দাঙ্গা ইচ্ছে করে লাগিয়ে গরিব মানুষের সর্বনাশ করা কী ভালো?

গরিব মানুষ—ওঃ! ওই ওরা আপনার গরিব মানুষ হল আর অন্য দেশে আপনার এই গরিব মানুষেরা যে শয়ে শয়ে ধর্মস্থান ভেঙ্গে ধুলো করে দিচ্ছে, কই সে ব্যাপারে কোনওদিন আপনাদের মুখে তো এসব কথা শুনি না!

যদি এ রকম হয়ে থাকে, নিশ্চয়ই সেটা খুব অন্যায় হয়েছে, কিন্তু দাঙ্গার সময় নানান গুজব ওড়ে—সে কথাও সত্যি। আর তাছাড়া একদল লোকের দোষে অন্যদেরকে খুন-জখম করা কী ঠিক?

আলবত ঠিক। যারা করছে তারা মরদের বাচ্চা।....

আমি চলে যেতে চাইছিলাম। চিত্রেশদের চা খাওয়া হয়ে গেছে। ক্যান্টিনে আমি একা আর এই ছেলেগুলো। সত্য দেখি কাউন্টার থেকে এদিকে তাকাচ্ছে। একবার ওর চোখে চোখ পড়ে গেল। এবারে আমি নিজেকে সামলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম,

দেখুন, এভাবে এত তাড়াতাড়ি এসব কথার আলোচনা শেষ হয় না। আমার মতে ধর্ম যার যার নিজের ব্যাপার, সেটাকে উপলক্ষ করে দাঙ্গা বাঁধানো—যাই হোক, এ নিয়ে পরে আবার কথা বলা যায়। আপাতত সেকশানে যেতে হবে আমাকে। লাঞ্চ আওয়ার ওভার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ—

আর কোনও উত্তরের অপেক্ষা না করে বেরিয়ে আসছিলাম। দরজার ওপর পা রাখতেই পেছন থেকে শুনলাম, শালা দালাল—

মাথাটা চড়াৎ করে উঠল। ফিরে যাব? আবার কী রকম ভয়ও হল, ওরা কী মারপিট বাধাতেই চাইছে?

সেকশানেও স্বস্তিতে বসতে পারলাম না। অনেকেই যেন কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। এরা কী সব জেনে গেছে? অথচ কেউ কিছু জিগ্যেস করছে না। আমার চোখে চোখ পড়লেই তাড়াতাড়ি মাথা নামিয়ে ফাইল দেখছে। ঘণ্টাখানেক কিছু কাজ করে না করে উঠে ইউনিয়ন রুমে গেলাম। বিপুল আর চিত্রেশ বসেছিল। চিত্রেশ আমাদের ব্রাঞ্চ সেক্রেটারি, ডিভিশন্যাল কমিটির মেম্বার। পার্টির ডিস্ট্রিক্ট কমিটির মেম্বার। সরাসরি চিত্রেশকেই ধরলাম।

এসব কী হচ্ছে অফিসে? এটা কী ধর্মীয় আড্ডার জায়গা হয়ে উঠছে নাকি? এই সমস্ত কালুকের ছেলেরা, এরা ক্যান্টিনের মধ্যে একজন সিনিয়র স্টাফের সঙ্গে এ রকম ব্যবহার কী করে করতে পারে? এতক্ষণে আমার গলা কেঁপে যাচ্ছিল। ভয়ে নয়, অপমানে।

চিত্রেশ বলল—

বসুন বসুন, চট করে এত উত্তেজিত হন কেন? কী হয়েছে?

কী হয়েছে? তুমি নিজের চোখে দেখনি ওই ছেলেরা ক্যান্টিনের মধ্যে কী রকম মারমুখো হয়ে আমাকে ঘিরে ধরেছিল? কী ভাষায় কথাবার্তা বলছিল?

না না, এটা আপনি একটু বেশি সিরিয়াসলি নিচ্ছেন। আমি তো ছিলাম ক্যান্টিনে,

আমি দেখলাম আপনি দাঁড়িয়ে সৌরাংশুদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, মারমুখোটুখো কেউ ছিল না তো!

ওরা বম্বে রায়টে গুণ্ডাদের সমর্থন করে কথা বলছিল, নোংরা ভাষায় অন্যদের গালাগালি করছিল।

না না বিজয়দা—চিত্রেশ মাথা নাড়ল, আপনি এতদিনের পুরোনো লোক, দেশের এই বিপদের সময়ে সাম্প্রদায়িক বিষয়ে আলোচনা তুলতে গেলেন কেন? এটা কিন্তু আপনাব কাছে আশা করিনি। আপনি জানেন, এসব আলোচনা নিজেদের মধ্যেকার বিভেদকে বাড়িয়ে তোলে, প্রতিপক্ষের হাত শক্ত হয়?

বিপুল এতক্ষণ চুপ করে ছিল, বলে ওঠে—কে একদলকে সমর্থন করে কে অন্যজনকে সমর্থন করে এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। সেখানে কাউকে খোঁচা দেওয়াটা ঠিক নয়। বিপুল হাত নেড়ে কথা বলল বলে আমার চোখে পড়ল ওর ডান হাতে নানা রঙের তিনটে আংটি।

তাছাড়া বিজয়দা, আপনার তো অনেকদিন হয়ে গেল, রিটায়ারমেন্টের আর বোধহয় বছর দুই বাকি, তাই না? আপনি আর কেন এইসব ছেলেছোকরাদের ব্যাপারে যান? যা করছে করতে দিন। এদের ল্যাঙ্গোয়েজ-ট্যাঙ্গোয়েজ আপনাদের কাছে খানিকটা শকিংই মনে হবে—এরা সব নিউ এডুকেটেড নিউ জেনারেশান তো, কমপিউটার টাইপ!

চিত্রেশ আর বিপুল দুজনেই নিজেদের রসিকতায় হেসে উঠল। আমি আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলাম।

এই ইউনিয়ন রুম বহু কষ্টে স্যাংশন হয়েছিল অফিসের মধ্যে। তারও আগে অফিসে ইউনিয়ন করার অধিকারের দাবিতে ধর্মঘট হয়েছিল। পেন ডাউন হয়েছিল। পনের-কুড়ি জনের নামে শো-কজ নোটিশ এসেছিল, তার মধ্যে আমিও ছিলাম।

লিফটে উঠতে ইচ্ছে হল না। আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উঠছি। ল্যান্ডিংয়ের জানলাগুলো দিয়ে অনেক গাছপালা দেখা যেত আগে। কখন কাটা হয়ে গেল সবগুলো। সুপার মার্কেটের বিল্ডিং উঠেছে। সামনেই মারুতি গাড়ির শোরুম। আমি কী অনেকদিন সিঁড়ি দিয়ে উঠিনি? সিঁড়ি দিয়ে উঠতে বুকে চাপ ধরে তাই লিফটে উঠে যাই, সে আজ কতদিন হয়ে গেছে। তিনতলার ল্যান্ডিং-এ একটু দাঁড়ালাম রেলিংটা চেপে ধরে। চোখে পড়ল প্যাসেজের ভেতরটা, ওয়াটার কুলার মেশিনটার সামনে জটলা। সেই ছেলেগুলোই কী ক্যান্টিনের? ঠাহর করতে পারলাম না। ওরাই, আরও কেউ কেউ থাকতে পারে। দু-তিনজন এগিয়ে এল। না আমার দিকে আসে নি। ল্যান্ডিংয়ের জানলা দিয়ে নিচে কী দেখল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে। জোরে জোরে বলা কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।

যত্তোসব দালাল, বুড়ো ভাম—আশ্চর্য, ওদের সম্পর্কে একটু ঘেন্না হয় না মাইরি। মাথাটা কুচ করে একটু ফাঁক করে দিলেই ঘিলুতে হাওয়া লাগবে—

ওরা হো হো করে হাসতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়েছিল। আমার ভেতরটা ফাঁকা লাগছিল। এতখানি সিঁড়ি ওঠা ঠিক হয়নি, নিঃশ্বাসে বাতাস পাচ্ছিলাম না।

এসব পরশুদিনের ঘটনা। তনুকে কিছুই বলিনি। সন্ধেবেলা সেদিন তনু লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়ছিল। আমাকে ঘরের মধ্যে দেখে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। অস্বস্তি পাচ্ছে। আমি খবরের কাগজটা হাতে করে ঘরের অন্যপাশে ইজিচেয়ারটায় গিয়ে বসলাম। তনুর গলার গুনগুন থেকে ওর পাঁচালির কথাগুলো বুঝতে পারছি। তাছাড়া কিছু কিছু লাইন মনেও পড়ে যাচ্ছে, এই পাঁচালি মাও পড়তেন, কতবার শুনেছি। আচ্ছা তনু কি হিন্দু? কিন্তু তনুর পাঁচালিতে তো কেবল নিজের সংসারের ভালোর প্রার্থনাই আছে, ধর্মের কথা—শত্রুদের কথা তো কিছু নেই! কালকে সারাদিন অফিসে সেকশান থেকে বেরোইনি। এক ফাঁকে তাড়াতাড়ি চা-টা খেয়ে চলে এসেছি। লিফটেই উঠেছি। তবু যেন অস্বস্তি লেগেছিল। কেউ আমাকে লক্ষ্য করছে? এ রকম মনে হচ্ছিল সমস্তক্ষণ। আজও তাই।

সেকশানের সকলকে দেখে মনে হচ্ছে যেন কিছুই হয়নি। সবাই সহজভাবেই কথাবার্তা বলছে। সেদিন যে ওরা বলছিল মাথাটা কুচ্ করে কেটে দিলেই—তখন কী ওরা আমার কথা বলছিল? দূর, অতো সোজা নাকি! রাস্তাঘাটে আর পাঁচটা লোক নেই? কিন্তু ক্যান্টিনেও তো সেদিন অনেকে ছিল প্রথমে। সেদিন যদি ওরা আমাকে মারত? রাস্তায়, কোনও পাড়ার মোড়ে হয়ত ওদের মতো লোক আরও অনেক আছে। এই যে মাঝে মাঝে কোনও পাড়ার ঠিক মাঝখানে হঠাৎ ত্রিপল টাঙিয়ে টানা তিনদিন ধরে অদ্ভুত নাম-সংকীর্তন হয়—কেউ কিছু বলে না তো? কারা যায় ওসব জায়গায়? কারা ব্যবস্থা করে? কী করে খরচটা ওঠে? সারারাত্রি মাইকের চিৎকার চলে, কচিবাচ্চা, ছাত্রছাত্রী, রুগী—কারও বাড়ি থেকে কোনও আপত্তি ওঠে না? সবাই কী ভয় পায়? পুলিসও কিছু বলে না, অথচ রাত নটার পর মাইক বাজান বারণ এ তো সবাই জানে। কিন্তু আমার সম্পর্কে ওরকম বলবে কেন? আমি যে কারও সমর্থক নই এ তো সবাই জানে। আমার কথায় কী কিছু চলে? ধর্ম নিয়ে মাথা না ঘামিয়েই তো ছাপ্পান্ন বছর দিব্যি কেটে গেছে, কেউ তো তাই নিয়ে কোনও কথা তোলেনি। সম্পর্কে কিছুই জানি না। মা-বাবা আলাদা আলাদা পুজো করতেন। তবু তনুর মতো করে। পৃথিবীতে সব রকমের লোক থাকে—কত হিন্দু আছে জাত মানে না, কত মুসলমান আছে চারটে বিয়ে করে না। তাতে কাউকে ঘেন্না করব কী করে?

এটাই আসল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনও দেশের, কোনও দলের লোককে ঘেন্না করতে হবে নিজে নিরাপদ থাকতে হলে। কিন্তু কাকে ঘেন্না করব? ঘেন্না করতে হলে যে জানতে হবে কেন ঘেন্না। আমি তো চিনিই না সেই অন্য দেশ কি অন্য দল কি অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের। যে দু-চারজনের নামধাম জানি তাদের নাম তো সবাই জানে—তারা কেউ গান গায় কেউ ক্রিকেট খেলে কেউ ছবি আঁকে।

অচেনা লোককে কি ঘেন্না করতে পারে কেউ? বড়ো একা লাগছে। এ কথা কি তনুকেও বোঝাতে পারব যে ঘেন্না করবার মত একটা চেনা লোক খুঁজে বেড়াচ্ছি আমি! কাউকে ঘেন্না করতে হবে নিজে নিরাপদ থাকতে হলে? কিন্তু কাকে ঘেন্না করব? আমি বুঝে উঠতে পারছি না। খুব চেষ্টা করছি কোনও একজনকে খুঁজে বার করতে ঘেন্না করার জন্য, কিন্তু এখন পর্যন্ত তেমন কোনও চেনা মানুষ খুঁজে পাচ্ছি না।

প্রবাহ তিস্তা তোবষা

অমরলতা

সন্ধ্যার ঠিক মুখেই পরপর ট্যুরিস্ট বাস এসে পৌঁছতে থাকে কৌশানির গান্ধী আশ্রমের চৌহদ্দির নিচে। একের পর এক সুবেশ সজ্জিত মহিলা-পুরুষ বাস থেকে নেমে ছোট ঢালু চড়াইটুকু পেরিয়ে জড়ো হতে থাকেন আশ্রম চত্বরে। এখানকার সূর্যাস্ত সূর্যোদয় 'বিশেষ আকর্ষণ' হিসেবে ট্যুরিস্ট এজেন্সিগুলো বিজ্ঞাপন দেয়। সুতরাং সেই সূর্যাস্ত সূর্যোদয় কনডাকটেড ট্যুরের অতিথিদের দেখিয়ে নেবার নির্দিষ্ট কার্যসূচী তাদের পালন করতে হবে। এই সংক্ষেপে সৌন্দর্যপিপাসু যাত্রীকুল সৌন্দর্যের সূচীপত্র গুণে দেখে টাকা দেন, সুতরাং মেঘ করে সূর্যাস্ত কিংবা বৃষ্টিতে সূর্যোদয় দেখা যায় গেল না বলে কনডাকটেড ট্যুরের গাইডকে দোষ দিতে অনসূয়া অনেককেই শুনেছে। এমনকি এখান থেকে দুশো চল্লিশ কিলোমিটার বিস্তৃত যে বরফের শিখরগুলি দেখা তার মধ্যে এভারেস্ট বা কাঞ্চনজঙ্ঘা নেই বলে সাংঘাতিক রেগে যেতেও দেখেছে একদিন এক বয়স্ক ভদ্রলোককে। তাঁর কথা শুনে মনে হচ্ছিল কেউ তাঁকে ঠকিয়েছে—সে কি গাইডটি না কৌশানি না কি হিমালয় নিজেই তা ঠিক বোঝা গেল না। এভারেস্ট কাঞ্চনজঙ্ঘা না দেখা গেলে আর হিমালয়ের মানে কী! পাঞ্চৌলি ভৃগথুনি ত্রিশূল দেবীস্থান চৌখাম্বা এসব দেখে লাভ কি? কেউ নাম জানে এইসব চূড়ার?

ট্যুরিস্ট বাসগুলি সন্ধ্যার মুখে মুখে আসে। 'সূর্যাস্ত' দেখিয়ে, রাত ভোরে 'সূর্যোদয়' সেরে আবার রওনা হয়ে যায় আলমোড়ার ডিয়ার পার্ক বা রাণীক্ষেতের ভিউ পয়েন্ট দেখে নিতে। এই একরাত্রির ট্যুরিস্টদের জায়গা দেয় না গান্ধী আশ্রম। আশ্রমের বিশাল বাগানে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত সূর্যোদয় দেখার মাঝখানের রাত্রিতে বেশিরভাগ বাসই নিজেদের যাত্রীদের রাখে গায়ে লাগা 'প্রশান্ত' হোটেলে। সেখানে সামনের বাগানের বার-বি-কিউয়ের ফূর্তিও মাঝে মাঝে বোনাস হিসেবে জুটে যায় আর পাঁচটা রুটিন প্রাপ্য ফূর্তির সঙ্গে।

সূর্যাস্ত দেখার মুগ্ধতায় 'ওফ্' 'দারুণ' 'এক্সেলেন্ট' 'হাউ নাইস' ইত্যাকার উচ্ছ্বাসবাণী ও হাততালিতে যে আবহাওয়া তৈরি হয় তাতে আশ্রমের গাছে বাসাবাঁধা পাখিসব রকবাজি করা ছেলেদের মত দেরি করে ঘরে ফেরে। এই ক'দিন অনসূয়াও তাই করেছে। সারাদিন বাগানে বসে থেকে এই সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ আগে, বুড়ো ফারের ছায়া যখন লম্বা হয়ে নিচে খাবার ঘরের মাথা পর্যন্ত পৌঁছে যায়, পাহাড়ি

বাতাসে হঠাৎ অদ্ভুত এক স্তব্ধতা নেমে আসে, তখন অনসূয়া আস্তে আস্তে আশ্রমের চৌহাদ্দি ছেড়ে পাশের রাস্তায় নামে। ওই রাস্তাটা ধরে বেশ খানিকটা হেঁটে গেলে নিচে গ্রাম। সেখান থেকে সকালের দিকে দল বেঁধে তরুণী মেয়েরা, কখনো-বা বুড়ো মানুষরা উঠে আসে। বেশিরভাগ সময়েই পিঠে ছোট বড় কিছু বোঝা নিয়ে। আর বিকেলের দিকে, সন্ধ্যের আগেই তারা সব গ্রামের রাস্তায় নেমে যায়। অনসূয়া অতদূর যায় না। রাস্তাটার এক দুটো পাক নিচে গিয়ে বসে থাকে। তারপর সূর্য ডুবে যাবার একটুখানি আগে উঠে আসে।

গান্ধী আশ্রমের উল্টোদিকে, রাস্তার ওপাশে একটা বাড়ির ছাদ। রাস্তার সমতলে। বাড়িটা রাস্তা থেকে নিচে, পাহাড়ের ঢালে, রাস্তা থেকে দু'হাত লম্বা একটা তক্তার ওপর দিয়ে গিয়ে ছাদটায় পৌঁছন যায়। এইখানেই ইস্কুলের মত কয়েকটা লম্বা বেঞ্চ আর লম্বা টেবিল পেতে ওরা আলগা একটা চায়ের দোকান করেছে। তিন চারটি ছেলে। ওরা কি এই পায়ের নিচের বাড়িটারই ছেলে আর তার বন্ধুবান্ধব, নাকি বাইরের ছেলে ছাদটা ভাড়া নিয়ে দোকান বসিয়েছে—তা অনসূয়া জানে না। যখন এই চার-পাঁচ দিন ধরে রোজ বিকেলে এসে বসে—জিজ্ঞাসা করতে পারত, কিন্তু ওর ইচ্ছেই করেনি। ট্যুরিস্টদের প্রশংসাবাণীর ঝড়ে কক্ষচ্যুত সে যখন বিকেলের শেষে এই দোকানটায় এসে এক গ্লাস চা নিয়ে বসে, মাঝখানের বিপুল ফাঁকা জায়গা পার করে তার আসন থেকে সরাসরি ত্রিশূলের দিকে তাকান যায়, তার আর ওই তুষার শিখরমালার মাঝে আর কোনও আড়াল থাকে না—কখনও কখনও ওদের গলার কাছে, মাথার ওপর লেগে থাকা হালকা গোলাপি এক টুকরো মেঘ জমে থাকতে দেখে অনসূয়ারও গলার কাছে কিরকম ব্যথা করে ওঠে। ক'মাসের জন্য গজিয়ে ওঠা এই চায়ের দোকানটায় লম্বা টেবিলের পোকায় কাটা কাঠে এমন ইকড়িমিকড়ি দাগ, দেখলে মনে হয় খুব সরু গভীর করে কাটা অক্ষরে প্রাচীন কোনও লিপি। একটু ধৈর্য ধরে চেষ্টা করলেই যেন ওগুলো পড়ে ফেলা যাবে। চায়ের গ্লাস হাতে অনসূয়া চুপ করে বসে থাকে। তারপর সূর্য ডুবে গিয়ে আকাশ থেকে রঙের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে গেলে রাস্তার এপারে ছোট ঢালু পথ পেরিয়ে আশ্রমের খাবার ঘরের লাগোয়া ছড়ানো জায়গাটায় উঠে আসে। এখানে গোটাকতক কমলালেবুর গাছ, আর তার তলায় পিঠছাড়া কাঠের বেঞ্চি পাতা। রান্নাঘরে যারা কাজ করে তারা দুপুরের একটু ফাঁকা সময়ে মাঝে মাঝে ওখানে এসে বসে। এখান থেকে পাহাড়ের গায়ে এবড়োখেবড়ো ধাপকাটা একসারি সিঁড়ি উঠে গেছে আশ্রমের ছড়ানো বিরাট বাগানে। সেই খোলা মাঠের মত চত্বরেই থাকার জায়গা, প্রার্থনাঘর, অফিস। পুরো জায়গাটা থেকেই পুবে তাকালে পাহাড়ের সারি। মাঝখানে অনেকখানি ফাঁকা জায়গার ওপারে প্রথমে ঘন সবুজ, তারপর নীল। তার পেছনে ঝকঝকে সাদা চূড়াগুলি এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত—কে যেন বলেছিলেন পৃথিবীর মেরুদণ্ড।

এখন কৃষ্ণপক্ষের শুরু। চাঁদের আলো বেশ স্পষ্ট, তাছাড়া এই ক'দিন পায়ের

তলায় রাস্তারও খানিকটা আন্দাজ হয়ে গেছে। যেমন অনসূয়া জানে এই ছোট চড়াইটা যেখানে কমলালেবুতলায় শেষ হচ্ছে, ঠিক সেইখানে ডানদিকে একটা পাথরের পাশে একটা বুনো গাছ আছে। পাতাগুলোর গড়ন অনেকটা পালং পাতার মত, কিন্তু অনেক খসখসে। গাছটাও কিছুটা পালং গাছেরই মত। তার মাঝখান থেকে ফুটখানেক উঁচু ডাঁটির ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এক কুঁড়ি। একটা মাত্র। দিব্যি মোটাসোটা গোলগাল, কিন্তু একেবারে ঢাকা এখনও সবুজ বৃতির আড়ালে। অনসূয়া প্রথম দিকে খেয়াল না করে, পরে খেয়াল করেই, কুঁড়িটাকে দেখে রোজ যাতায়াতের পথে। ক্রমশ তার মনে একটা কৌতূহল, নাকি আগ্রহই, তৈরি হয়েছে কী রঙের ফুল ফুটবে কুঁড়ি থেকে, জানবার জন্য। তার কেমন মনে হয় হালকা হলুদ কিংবা আকাশী নীল একটা ফুল আছে কুঁড়িটার মধ্যে। বড়ো পাউডার পাফের মত শুঁয়ো শুঁয়ো। যদিও এরকম কোনও ফুল কখনও দেখেনি সে। ক'টা ফুলই বা দেখেছে। চারপাশে ভিড় লোকজন আর সবসময় তাড়া। ঊর্ধ্বশ্বাস তাড়া। সেই কোন্ স্কুল যাবার সময় থেকে কলেজ পেরিয়ে চাকরি খুঁজে বেড়ানো, বাবার পেনশন তোলা, অফিস যাওয়া—সমস্ত সময়টাই তো কেটে গেছে সকালবেলা ছুটতে ছুটতে আর সন্ধ্যার পর সারাদিনের সেই ছোটার ক্লান্তিতে ভেঙে। অঞ্জন বলত, কলকাতা শহরে নাকি অনেক বিরল সব ফুলের গাছ আছে, সাহেবরা এনে বসিয়েছিল। ভিক্টোরিয়ায়, ময়দানে, ডালহৌসি পাড়ার জব চার্নকের কবরখানায় বসে থাকতে হাঁটতে হাঁটতে অনেক ফুলের গাছ সে দেখিয়েছিল অনসূয়াকে। নাম মনে নেই তাদের, ফুলের চেহারা অনেকের দেখেনি, কারো দেখেছিল—মনে নেই। কেবল সেইসব গাছগুলো যাতায়াতের পথের পাশে ক্ষতচিহ্নের মত দাঁড়িয়ে আছে।

এসব কথা সে ভাবতে চায় না। ভাববে না মনে করেই সমস্ত পরিচিত জায়গা পরিচিত অনুষঙ্গ ছেড়ে সে এখানে এসেছে। এত সুন্দর একটা জায়গায়। বারে বারে, চারদিক ঘুরতে ফিরতে নিজেকে সে এটাই দেখাতে চায় যে অনেক বড়ো এই পৃথিবী, কতরকম মানুষ আছে, কতরকম সুখদুঃখ তাদের। সেই-বা কেন মেনে নিতে পারছে না তার যন্ত্রণাকে? সময় গেলেও কেন এত জ্বলন্ত তার ক্ষতগুলি? এই দ্রুতির যুগে যখন দাঁড়িয়ে দু'দণ্ড ভালোবাসার লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখার সময় নেই লোকের—দু'বছর কি কম সময় ভোলবার পক্ষে?

সূর্যোদয়ের আধঘণ্টার মধ্যেই রোদে ঝলমল করে ওঠে গান্ধী আশ্রমের বিরাট বাগান। বাঁদিকের দোতলা বাড়ির পিছনের একতলায় সমাগত ট্যুরিস্টরা, যাঁদের প্রায় সকলেই সূর্যোদয় দেখে আবার গিয়ে শুয়েছিলেন, কয়েকজন যাঁরা পাহাড়ি পথে মর্নিংওয়াক সেরে ফিরেছেন, এবারে একে-দুইয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন। এক্ষুণি বাগানের একপাশে বিরাট দুই কেটলি নিয়ে ফৌজি এসে হাজির হবে। ঠাণ্ডা বাতাস মাখতে মাখতে সবাই ওই গাছতলায় জড়ো হবেন। নিজের নিজের পাত্রে চা

নিয়ে আবার জটলাটা ভেঙে গড়িয়ে যেতে থাকবে। সেই মুহূর্তটা শুরু হতে আর একটুখানিই দেরি আছে। অনসূয়া বাগানের একেবারে কিনারে যেখানে নিচু পাঁচিল দিয়ে পাহাড়ের ঢালের ঘাসজমি থেকে বাগানের ঘাসজমিকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে তাকিয়েছিল সামনে দূরের চূড়াগুলোর দিকে। এখন ঘুরে ভেতরের দিকে আসতে গিয়ে তার নজরে পড়ল ম্যানেজার দুবেজীর হাতে একটা পুরনো প্লাস্টিকের বালতি, যেটায় করে উনি রোজ সকালে সযত্নে তুলে নেন গাছতলায় পড়ে থাকা এক-দুটো শুকনো পাতা, ভাঙা ডাল। এখন সেই বালতিতেই কুড়িয়ে তুলছেন ফাঁকায় পড়ে থাকা কাচের বোতল, উড়ে বেড়ানো এঁটো শালপাতা। মুখে রাগ নয়, বেদনার ছাপ। এগুলো সেইসব উৎসাহী ট্যুরিস্টদের দান যাঁদের ফূর্তির প্রথম অনুষঙ্গটির নাম মদ। তার ওপর যদি সেটা 'আমিষ ও মদ নিষেধ' কোনও আশ্রমে বসে মাংস দিয়ে খাওয়া যায় তাতে কতো বেশি 'থ্রিল' জমে। এই চিন্তাধারাকে বুঝতে পারে না অনসূয়া। যা করার নয়, যা করলে কেউ কষ্ট পায় সেরকম করতে ভালো লাগে কেন মানুষের? কিছু কিছু মানুষের? খুব শক্তিশালী কোনও প্রতিষ্ঠান কিংবা লোককে তারা ঘাঁটায় না, এমনকি অন্যায় করলেও নয়। কিন্তু যাদের শক্তি কম, যারা কেবল কষ্ট পাবে, ভয়ঙ্কর কোনও প্রতিশোধ নিতে পারবে না, তাদের যত্নের ফুলের বাগানে মাংসের হাড় ফেলে, হাসিমুখ কিশোরীর গায়ে নোংরা কথা ছুঁড়ে দিয়ে, দশ বছর ধরে বিশ্বাস করে থাকা একজনকে অক্লেশে আয়নায় নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখতে বলে—কী লাভ হয়?

দুবেজী মুখ তুলে তাকিয়েছেন। বালতি আর ছোট কোদালটা নামিয়ে রেখে দু'হাত জুড়ে নমস্কার করলেন।

অনসূয়ার মনে আছে প্রথমদিন কীরকম শুকনো খটখটে ব্যবহার করেছিলেন এই ভদ্রলোক। কলকাতা থেকে সে রওনা হয়েছে পরিচিত কয়েকজনের সঙ্গেই। তারা চলে গেছেন দিল্লি। সেখান থেকে মথুরা বৃন্দাবন দেরাদুন রাণীক্ষেত নৈনিতাল সেরে দিন দশ পরে কৌশানি পৌঁছবেন। এখানে একরাত্রি কাটিয়ে সূর্যোদয় দেখে কাঠগোদাম থেকে সবাই একসঙ্গে ট্রেন ধরবেন। আলমোড়া থেকে একা একা বাস ধরে আসবার সময়ে তার মনে ক্ষীণ ভরসা ছিল সে চিঠি দিয়ে আসছে, একটা ঘর তার জন্য থাকবে। বেলা এগারোটায় পৌঁছে, বাসস্ট্যান্ড থেকে সুটকেস হাতে এতখানি চড়াই উঠে এসে দেখেছিল সে চিঠি অফিসঘরের কোণে মাটিতে পড়ে আছে।

—এখানে চিঠি দিয়ে আগাম বুকিং করা যায় না। এটা হোটেল বা হলিডে হোম নয়।

একটু শক্ত মুখে বলেছিলেন ম্যানেজার। জায়গা অবশ্য করে দিয়েছিলেন একটা বড় ঘরে আরও দু'জন মহিলার সঙ্গে।

—আজ এখানে থাকুন, কাল অন্য জায়গা খালি হলে পাবেন। তখনই বলেছিলেন আশ্রমে যাঁরা থাকবেন তাঁদের কাছ থেকে কিছু নিয়ম পালন আশা করেন ওঁরা,

সাধারণ কিছু ব্যবহারিক নিয়মমাত্র, কোনও ধর্মীয় আচার নয়। যেমন নিরামিষ খাওয়া, নিতান্ত অসুস্থ না হলে ডাইনিং হলে গিয়ে সকলের সঙ্গে বসে খাওয়া, সম্ভব হলে সন্ধ্যেবেলা ওঁদের ভজন গানের ওখানে গিয়ে একটু বসা—এইসব। কোনও অসুবিধা হবার কথা অনসূয়ার মনেই হয়নি। এখানে খাবার না পাওয়া গেলে সে দু'দিন শুকনো কিছু খেয়েই কাটিয়ে দিতে পারে। এগুলো কোনও সমস্যা নয় যে কোথায় কার সঙ্গে বসে কি খেল। প্রতিদিনের অভ্যস্ত একঘেয়েমি থেকে বেরোবার জন্যই তো আসা।

রুটিন আর অর্থহীন কোলাহলের বাইরে, নিরর্থক সব সম্পর্কের বাইরে ক'টাদিন কেবল নিজের সঙ্গে একটু থাকবে, এইটুকুর জন্য এত রাস্তা পার হয়ে এসেছে সে। কে যে বলেছিল কৌশানির নাম স্পষ্ট মনে পড়ে না, কিন্তু নানান জায়গার বিখ্যাত অখ্যাত নামের মধ্যে এই নামটাই যে কেন তার মন টানল বলা মুস্কিল। কী এখানে আছে, কেন সে ভেবেছে সাত-আটদিন এখানে থাকবার কথা, কোনও কিছুই অনসূয়ার কাছে স্পষ্ট ছিল না, কেবল এই খবরটুকু ছাড়া যে এখানে থাকবার জন্য এই গান্ধী আশ্রম আছে আর এখানে থেকে প্রায় আড়াইশো কিলোমিটার লম্বা বরফ পাহাড়ের সারি দেখা যায়। এবং ওখানে লোকে যাতায়াতের পথে একদিনের জন্য থাকে, জায়গাটায় ভিড় নেই।

আলমোড়া পর্যন্তও যেন বড়ো বেশি ভিড়, শহর যেন পায়ে পায়ে জড়িয়ে আসছে। তার ভয় হচ্ছিল শেষপর্যন্ত এখানেও কি এক ভুল আশা অপেক্ষা করে আছে তার জন্য, পথের শেষে?

এসে ভারি ভালো লেগেছিল। তাই প্রথমদিন সন্ধ্যেবেলাতেই তাকে নতুন ঘর দিতে এসে দুবেজী যখন বলেছিলেন,

—এটা হোটেল নয়, যতদিন খুশি এখানে থাকা যায় না, আমরা কেবল তিনদিন থাকবার জায়গা দিতে পারি। এখানে লোকে ছুটি কাটাতে নয়; শান্তি পেতে আসে—

আপনিই তার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল যা বলবার কথা সে এক মুহূর্ত আগেও ভাবেনি,

—আর যদি কেউ এমন অভাগা হয় যে তিনদিনেও শান্তি না পায়?

দুবেজী একটুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন।

—এখন তো থাকুন দুদিন।

ছয়দিন পার হয়ে গেছে সে আছে কৌশানিতে। এদের সঙ্গে মিশে থাকতে তার ভালো লাগছে। সকালবেলা কমলালেবুর গাছের নিচে বসে ঝুড়ি করে সে চৌকা ঘরের তরকারি কেটে দেয়। রান্নাঘরে কাজ করে মাত্র চারজন, তারা রান্না আর পরিবেশন দুই-ই করে, জলখাবার ভাগ করে, চা বানায়। আশ্রমে এখন অতিথির সংখ্যা মোটামুটি রোজই একশোর ওপর। হয়রান হয়ে যায় লোকগুলি। দ্বিতীয় দিন থেকে একটু একটু করে অনসূয়া ওদের সঙ্গে জুটেছে। একা থাকা মানে কি আর হাত

পা কোলে করে চুপ করে বসে থাকা? তেমন কি তার অভ্যেস আছে কোনওদিন? এখনও তো অফিসে বেরোবার আগে তাকে অরণির জামা-কাপড় সারা ঘর থেকে তুলে গুছিয়ে রাখতে হয়। রান্নাঘরের বাইরে টুকিটাকি অজস্র কাজে মাকে সাহায্য করতে হয়। এতদূরে একেবারে একা সে আর আসেনি আগে। দু-তিনদিনের জন্য বন্ধুরা বা অফিস কলিগরা মিলে বেড়াতে যাওয়া হয়েছে, তাও অনেকদিন পরপর কাছাকাছি কোথাও। কিন্তু এবারের আসা অনসূয়ার নিজের কাছে ঠিক বেড়াতে আসা নয়, ভেতরে ভেতরে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সে। গত দুটো বছর অনেক চেষ্টা করেছে পুরনো স্মৃতি সব মন থেকে মুছে ফেলে জীবনকে সহজভাবে মেনে নিতে। পারা কি যায়? বাইশ থেকে চৌত্রিশ—কত বছর? কি আর আছে তার হাতে, পুরনো স্মৃতি ছাড়া! আছে হয়ত সবই—সংসার, বাবা-মায়ের স্নেহ, পুঁটলি—দিদির মেয়েটা, অরণির জন্য উদ্বেগ। এরা সবাই ভালোবাসে তাকে। সে তো প্রায় প্রতিদিনই দেখে এক একটা মেয়েকে, কীভাবে মুখে রক্ত তুলে পিষে যাচ্ছে সংসারের জন্য অথচ দিনান্তে একটা নরম কথা বলবারও কেউ নেই। বিবাহিত মেয়েদেরও কি দেখে না, এক সময়ে ভালোবেসে কতো প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিয়ে করা, গড়ে তোলা সংসার কিরকম মায়ামমতাহীন সঙ্গহীন নিরুপায়তা হয়ে উঠেছে। সেখানে সে তো ভালোই আছে। কিন্তু বোঝালে কি মন মানে? এখন তার মাঝে মাঝে মনে হয় কলকাতার বাইরে কোথাও চাকরি পেলে সে চলে যেত। হয়ত ভালো হত তাই। এই শহরটার আনাচ-কানাচ থেকে গত দশ বছরের অজস্র স্মৃতি, প্রসঙ্গ সর্বক্ষণ তাকে ছুঁচের মতন বিঁধতে থাকত না।

এইতো এখানে ক'দিনে কতরকম লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। কেউ কেউ এসেছেন শুধুমাত্র নতুন জায়গায় বেড়াতে। আবার অনেকেই বাইরে বেরিয়েছেন ভুলতে—কেউ যন্ত্রণা, কেউ শোক। এক-একবার মনে হচ্ছে এই যুবক ছেলে হারানো মা বাপ, সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে সহোদর ভাইয়ের হাতে লাঞ্ছিত প্রৌঢ় বড়ভাই, এদের চেয়ে তো তার কষ্ট অসহনীয় নয়। এক মহিলা এসেছিলেন ভাই আর ভাইবৌয়ের সঙ্গে। যেদিন ছিলেন প্রায় সমস্ত সময়টাই বসেছিলেন পাঁচিলের পাশে বড়ো ফার গাছটার নিচে। অন্ধ। জন্মান্ধ নন। একসময়ে দেখেছেন পৃথিবীর রঙ রূপ, সতেরো বছর বয়সে দুর্ঘটনায় অন্ধ হয়ে যান। এখন বয়েস নিশ্চয়ই ষাটের ওপর। আশ্চর্য, কোনও ক্ষোভ ছিল না মানুষটির মুখে।

অনসূয়া জিজ্ঞেস না করে পারেনি,

—আপনি এতদূরে এসেছেন, পাহাড়ের দিকে ফিরে বসে আছেন, আপনি তো কিছু দেখতে পাচ্ছেন না—

আর উত্তরে কিরকম শান্তভাবে তিনি বলেছিলেন,

—ওই যে বরফের দিক থেকে বাতাস দিচ্ছে সেই বাতাস দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি।

গতকাল সকালে চলে গিয়েছেন মহিলা। তার আগের সন্ধ্যায় তাঁর কাছে বসে বসে অনেক গান গেয়ে শুনিয়েছিল অনসূয়া। অনেকদিন পর এতগুলো গান গাইল সে। হয়ত চোখে জল এসেছিল, কিংবা তার গলার স্বর কিছু বলে থাকবে সেই শ্রবণে দেখতে পাওয়া মানুষটিকে। গানের পরও অনেকক্ষণ ঘরের জানলা দিয়ে আসা আবছা আলোয় অনসূয়ার পিঠে একটি হাত রেখে চুপ করে বসেছিলেন তিনি।

চলে যাবার পর থেকে বারে বারে মুখখানা, অন্ধকার চোখদুটি মনে পড়েছে অনসূয়ার।

এসে অবধি অনেকের কাছেই শুনছে এখান থেকে খুব কাছেই নাকি বৈজনাথ বলে মন্দির আছে, অপূর্ব সুন্দর পার্বতী মূর্তি আছে সেখানে। বাসে ঘণ্টাখানেকের রাস্তা। আগেরদিন মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়ে আর ঘুম আসেনি অনসূয়ার। একে একে ফুরিয়ে এল ছুটির দিন কটা। কিসের খোঁজে সে এসেছিল এখানে? শান্তি খুঁজতে? হ্যাঁ সত্যি, বড়ো সুন্দর এই জায়গাটা। দুপুর রোদে বরফের চূড়াগুলিতে ঝলক দেয়, ত্রিশূল পর্বতের তিনটি চূড়া দেখা যায় স্পষ্ট আর তাদের পিঠের দিকে ছায়া পড়ে, দুই পর্বতচূড়ার মাঝখানে বরফের বিশাল ঢালু কোণের মত, তার ওপর গাঢ় বেগুনি রঙের ছায়া দেখে দেখে মনে হয় ওইখানে একটি ছোট তাঁবু ফেলে যদি থাকা যেত। এই বাগানের একপাশে এক বিরাট বড় বৃদ্ধ ফারগাছ, কর্কশ বাকল, তার পায়ের কাছে ফুটেছে আলতা গোলাপি গ্ল্যাডিয়োলার একটা গোছা, যেন বাবার হাঁটু ধরে উঠে দাঁড়িয়েছে গোলাপি ফ্রক পরা পুঁটলি। কিন্তু এই আশ্রমের বাগানে তো জীবন কাটবে না। এর বাইরে আছে পৃথিবী। সেইখানেই ফিরে যেতে হবে তাকে আবার। কে আছে সেখানে যার জন্য বেঁচে থাকতে ভালো লাগবে? আর দুটো দিন পর মজুমদারদা রুণুবৌদিরা এসে পড়বেন, তার পরদিন সকালে কৌশানি ছেড়ে, পাহাড় ছেড়ে চলে যাওয়া। আবার বাড়ি অফিস সংসার, মা বাবার প্রত্যাশা, অরণির চাকরি না পাবার বিরক্তি। সবার সঙ্গে তার সম্পর্ক কোনও না কোনও খোপে রাখা প্রয়োজনের। অফিস—বাড়ি, বন্ধুবান্ধব—বন্ধু কোথায়ই বা আর। হয় সহকর্মীরা নাহলে পাড়া-প্রতিবেশী। কাজের ভিত্তিতে ভালোবাসা। কারণে ভালোবাসা।

সূর্যোদয়-দর্শনার্থীরা জাগবারও আগে বিছানা ছেড়ে নেমে পড়েছিল সে। সকালে চা খেয়ে হঠাৎ মনে হয় যাওয়াই যাক না বৈজনাথ। কেনই বা যাবে না? কেউ তো তার জন্য আর অপেক্ষা করে নেই যে জিজ্ঞেস করতে হবে, বলে যেতে হবে? অচেনা জায়গায় একা যাওয়া? হোক। চেনা জায়গায় একা যাওয়ার চেয়ে তো সহজ তা। এইসব ভাবতে ভাবতে সকালের খাবার না খেয়েই, খানিকটা যেন অন্যমনস্ক ভাবেই ঢালু পথ নেমে বাসস্ট্যান্ডে চলে এসেছিল। উঠে বসেছিল বাসে।

ঘণ্টা খানেকের একটু বেশিই পথ। প্রায় সমতলে গোমতী নদীর কিনারে ভাঙা ভাঙা মন্দির। ভিতরে সেই পার্বতী। উজ্জ্বল কালো পাথরে অপরূপা সুঠাম মূর্তি। ও

তো মূর্তি, ওকে সুন্দর করেই তৈরি করেছিল শিল্পীরা, তারপর রয়ে গেছে তেমনিই। একটা হাত ভাঙা, নাকের ডগাও, কিন্তু তাতে ওর সৌন্দর্যের এতটুকুও নষ্ট হয়নি। যতো সময়ই পেরিয়ে যাক ওর সামনে আয়না ধরে দিলে একই চেহারার ছায়া পড়বে। কিন্তু পার্বতীর আশপাশের পাথরগুলো ওরকম কালো কিংবা মসৃণ নয়, কারুকার্য করাও নয়। মনে হয় এখানকার নয় যেন ওই মূর্তি। যেন অন্য কোথাও থেকে এসে অন্য কোথাও যাচ্ছিল পার্বতী, মাঝপথে কে তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে গেছে। একটু ভারী ঠোঁট, নিমীলিত চোখ, অদ্ভুত মায়াবী চিবুক, কৃতাঞ্জলি মুদ্রায় জড়ো করা হাত দুটি। ও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে এরকমভাবেই, যতদিন না এই মন্দির ভেঙে পড়ে যায়। এমনকি যার জন্য ও দাঁড়িয়ে আছে সে যদি অন্য কাউকে বাঁহাতে কাছে টেনে নিয়ে অন্য পথ ধরে চলে যায়, পার্বতী জানতে পারবে না। কষ্ট পাবে না। এরকমই সুঠাম দাঁড়িয়ে থাকবে। আচ্ছা, কারা তৈরি করত এত সৌন্দর্যঢালা প্রসন্ন সব মূর্তি? তাদের জীবনে কান্না থাকত না?

মন্দিরের ঠিক সামনে পাথরের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে গোমতী নদী। সাদা রঙের ছোট ছোট অজস্র মাছ তার স্বচ্ছ জলে।

এতো একা কী করে থাকতে পারবে মানুষ? ফেরার পথে বাসে বসে সহযাত্রীদের দিকে তাকিয়ে দেখে অনসূয়া। স্থানীয় সাধারণ লোকজন। এতো বেলায় ভিড়ও কম বাসে। দু'জন বয়স্কা মহিলা, মুখে মেচেতার দাগ আর ক্লান্তি, পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে। হঠাৎ খেয়াল করে একজনের কোলে রাখা থলির মধ্যে থেকে মাথা বার করেছে একটা কুকুরছানা। একটি কমবয়সি মেয়ের কোলে একটা কাপড় জড়ানো বাচ্চা, পাশে আরও দুটো ছেলেমেয়ে। জামাকাপড় ময়লা, কিন্তু প্রায় সোনালি গায়ের রঙ আর গভীর কালো চোখ, মা ছেলে মেয়ে সবার। তার নিজের পোশাক এদের থেকে শুধু পরিচ্ছদে নয়, পুরো চেহারাতেই আলাদা—এটা খেয়াল না করেও সে পারে না। বাসের ভেতরটা বোঝাই নানারকম ছোট বড় বোঝা পোঁটলা—শুকনো পাতার টুকরি, একজন ফেরিওলার বাক্সের ডালায় সাজানো পুঁতির মালা, ছোট ছোট আয়না, নানারঙের টিপ, চুল বাঁধার দড়ি, কার, ঝুটো পাথরের বড়বড় কানের গয়না। এগুলো এখানকার মেয়েদের অনেককে পরতে দেখেছে।

বেলা প্রায় দুটোয় যখন সে কৌশানি বাসস্টান্ডে এসে নামে তখন খিদের বোধ নেই। কিন্তু অসম্ভব ক্লান্তি আর অবসাদে যেন সে একেবারে দুমড়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে এই আড়াই পাক রাস্তা উঠে আশ্রমে সে আর কিছুতেই পৌঁছতে পারবে না।

কমলালেবু গাছগুলোর নিচ থেকে ওরা চারজনই একসঙ্গে উঠে দাঁড়ায়, রান্নাঘরের লোকেরা।

—দিদি, কোথায় গিয়েছিলে তুমি কিছু না বলে। আমরা কখন থেকে খাবার নিয়ে বসে আছি।

থমকে দাঁড়াল অনসূয়া। ওদের মধ্যে সবচেয়ে কমবয়সী ছেলেটা এগিয়ে আসে,

—জলদি নহাকে আইও দিদি, সুবে কা নাশ্‌তা ভি তো নহী লিয়া।

স্নান পরে করলেও চলবে, অনসূয়া ঘরে আসে ওদের সামনে চোখ মুছবে না বলে। বুড়ো ফৌজি বলে, বলে কেন যাওনি বেটি, আমরা কতো চিন্তা করছিলাম।

উনুনের ওপরে গরমজলের হাঁড়ি রেখে তার ওপর বসানো ছিল খাবারগুলো। গরম আছে। স্নান করে বেরিয়ে দেখে দরজার সামনে ঢাকা দেওয়া থালাবাটি হাতে বাচ্ছা ছেলেটা, অরুণ দাঁড়ানো।

—দিদি, ঠাকুর বলল তুমি অনেক ক্লান্ত হয়ে আছ, নিচে যেতে হবে না, এখানে খেয়ে নাও। আমরাও খেয়ে নিচ্ছি।

আজ সন্ধ্যার মুখে মেঘ ছিল আকাশে। সূর্যাস্তের পাহাড়চূড়া দেখা যায়নি। কিন্তু মেঘে মেঘে রঙ বাহার খেলেছিল অনেক বেশি, রঙিন আভা ছিল বহুক্ষণ। চায়ের পয়সা নেবার সময়ে ছেলেদুটো হাসিহাসি মুখে জিজ্ঞেস করে চা কেমন হয়েছিল। ক'দিন ধরে রোজ আসা-যাওয়ায় এই হাসির আত্মীয়তাটুকু হয়ে গেছে ওদের সঙ্গে। তাছাড়া, ওরাও বোধহয় বুঝতে পারে অনসূয়ার এ-সময়ে আশ্রম ছেড়ে আসবার কারণটা। আজ যখন সে ফিরে এল তখন বেশ অন্ধকার। চাঁদ আরও দেরিতে উঠবে। প্রার্থনাঘরের ভিতরে আলো জ্বলছে, বাইরে তার আভায় আলোছায়া নড়ে উঠছে। অনসূয়া সেখানে এসে দাঁড়ায়। ভিতরে মেঝেয় পাতা বিরাট সতরঞ্চির ওপর কিছু লোকজন বসে আছেন। প্রার্থনা বলতে অন্যকিছু নয়—ধ্যান বা আরতি নয় কোন, কেবল বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আসা ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষেরা গান করেন। একদল যখন গান, অন্যরা শোনেন। আজও তাই হচ্ছিল। আজ সকালের দিকে দিল্লির গান্ধী ফাউন্ডেশান থেকে কয়েকজন ছেলেমেয়ে এসেছেন। ঝকঝকে স্মার্ট চেহারা। তাঁরাও প্রার্থনা ঘরে। হয়ত সেই কারণেই সূর্যনারায়ণ দুবে আর তাঁর আশ্রমের জনাচারেক কর্মচারী একসঙ্গে গাইছেন তুলসীদাসের ভজন—শ্রীরামচন্দ্র কৃপাল ভজ মন হরণ ভব ভয় দারুণম্‌। বেসুরে কিন্তু খুব দরদ দিয়ে গাইছেন, মগ্ন হয়ে। অনসূয়া খেয়াল করে দিল্লির টিমটি নিজেদের মধ্যে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। তারপর তারা ধরে নেয় গানটিকে, শিক্ষিত পরিশীলিত গলার সব মণ্ডনসুদ্ধ। দুবেজীরা প্রথমে চোখ খুলে চেয়ে দেখেন, গলা মিলিয়ে গাইবার চেষ্টা করেন, তারপর কিরকম যেন অপ্রতিভ হয়ে আস্তে আস্তে থেমে যান। বাকিদের অবস্থাও প্রায় তাই। ফলে চমৎকার সুরেলা গলায় কারুকার্যখচিত ভজনটি গীত হল। কিন্তু অনসূয়ার মনের মধ্যে যেন কী একটা ভালো-না-লাগা লেগে রইল অস্পষ্টভাবে। কেন যে, সে বুঝবার চেষ্টা করে। নিজে সে যথেষ্ট ভালো গান গায়, বিশেষত যখন ছোটবেলা থেকে শুনে শুনে এই ভজন তার গলায় নিপুণ বাঁধা আছে। কিন্তু কোথায় যেন মনে মনে সে নিজেকে এখানকারই লোকেদের দলের একজন মনে করে নিয়েছে আর এই নম্র, কমশিক্ষিত, অক্লান্তকর্মী মানুষদের প্রতি রাজধানী শহর থেকে আসা ঝকঝকে

মেয়েকটি ও তাদের সঙ্গী যুবকটির প্রচ্ছন্ন অবহেলা তাকে ভিতরে ভিতরে অসহিষ্ণু এমনকি বিরক্ত করে তোলে। বিশেষত আজ দুপুর থেকে এই লোকেরা তার মনকে এমনভাবে ছুঁয়ে আছে।

দু'তিনটি ভজন গেয়ে সেই মেয়েরা ছেড়ে দেওয়ার পর দুবেজী, যিনি এতক্ষণ কোলের ওপর হাত জড়ো করে চোখ বন্ধ করে বসেছিলেন, বাকি শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে একটু মিনতির সুরেই বললেন,

—আজ তো কান ধন্য হো গয়া। অভি ঔর কৌঈ সুনাইয়ে—

উপস্থিত কেউ নড়াচড়ার কোনও লক্ষণ না দেখালে আবার বললেন,

—সুনাইয়ে না, ইতনে আত্মা বৈঠে হুয়ে হ্যায়—

অনসূয়ার ভেতরে একটা অদ্ভুত দোটানা চলে। কোনওভাবে এতজনের মধ্যে এখানে গান গাইবার কথা সে চিন্তাও করেনি। অথচ বারেবারে মনে হতে থাকে এই সরল সহজ বিনয়ী মানুষগুলোর হয়ে একরকম একটা জবাব দেবার দায় যেন তারই ওপর পড়েছে।

সবার শেষে ঢুকবার দরুন দরজার কাছাকাছি বসেছে সে, বাইরে তাকালে বাগানের অন্ধকারের ওপারে শূন্যের ওপারে সে দেখতে পায় ছোট ছোট আলোর বিন্দু। ওগুলো দূর পাহাড়ের জনপদের আলো, নাকি তারা! অনসূয়া জানে না কখন তার গলায় উঠে এসেছে গান—আজ তারায় তারায় দীপ্তশিখায় অগ্নি জ্বলে।

প্রার্থনাঘর এখনও চুপ। সেই স্তব্ধতার সঙ্গে আগেকার স্তব্ধতার তফাৎ তবু বোঝা যায়। এই ঘরে হয়ত মাত্র কয়েকজনই আছেন এ গানের স্বভাষী, অধিকাংশজনই গানের কোনও কথা বুঝতে পারছেন না। তবু একটু আগেকার সমীহমূলক দূরত্বের নৈঃশব্দের বদলে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ছে এক ঘনিয়ে ওঠার নিঃশব্দতা। অনসূয়ার মধ্যে কিছু কাঁপছে না এখন আর। আস্তে আস্তে একান্ত হয়ে গেছে সে তার গানের সঙ্গে। তিনটে গান গেয়ে যখন সে চোখ মেলে তাকায় ততক্ষণে সমস্ত হল দরজার দিকে মুখ করে বসেছে। প্রথম সব অপরিচিত মুখ পেরিয়ে তার চোখ পড়ে দুবেজীর ওপর। মনে হয় দুবেজীর চোখে যেন কৃতজ্ঞতা ভেসে উঠেছে। আবার ভাবে, তার কল্পনা। আসলে গানটি সম্পর্কে মুগ্ধতা। যথেষ্ট ভালো বাংলা জানেন উনি। তখন দেখে ভাষা নির্বিশেষে সব চোখ তার মুখে। গান দেখছে।

ঘরের বাইরে এসে প্রথম তার হাত জড়িয়ে ধরেন এক বৃদ্ধ দম্পতি।

বৃদ্ধ কোনও কথাই বলেন না, হাত ধরে থাকেন দু'হাতে। মহিলা বলেন,

—আমরা চল্লিশ বছর পর দেশে ফিরেছি। বড়ো আশা নিয়ে ফিরেছিলাম। এখন দেখি কেউ আমাদের চেনে না। আমরাও যেন অতিথির মত হয়ে আছি। তোমার গান শুনতে শুনতে মনে হল এতদিনে পেলাম আমরা যা খুঁজতে এসেছি। আমাদের ভিতরটা যেন গলে গেল—

ভদ্রলোক কেবল মাথা নেড়ে সমর্থন জানাচ্ছেন স্ত্রীকে। অনেকেই জিজ্ঞেস করছেন তার নাম, কোথা থেকে এসেছে সে। অনেকে আবার চাইছেন প্রার্থনা বন্ধ হলে হোক, সে গান করুক চা দেবার গাছের নিচে, বারান্দায়, কারো ঘরে কিংবা যেখানে খুশি বসে। এক মাদ্রাজী দম্পতি বারেবারে তাকে ডাকেন তাঁদের ঘরে বসে গাইবার জন্য। অন্যদেরও আমন্ত্রণ করেন শুনতে আসবার জন্য। তাঁরা বাংলা বোঝেন, বলতে ভালো পারেন না। কলকাতাতেই থাকেন। তাঁদের ছেলে বলতে পারে। সে অসুস্থ বলে আসতে পারেনি, সে যাতে শুনতে পারে তাই ওঁরা মিনতি করছেন অনসূয়াকে।

অনসূয়ার মনে হচ্ছে তারও ভিতরে কোথায় যেন কী একটা হচ্ছে। এত মানুষ এত ভালোবেসে শুনেছেন তার গান। যাঁরা বোঝেননি তাঁরাও। মানুষ এত সহজে অন্যকে ভালোবাসে! ঠাণ্ডা বাতাসও তার ভিতরে অদ্ভুত উষ্ণতা দিচ্ছিল।

রাত্রে খাওয়ার ঘণ্টা পড়ে গিয়েছে।

আজ খাবার পরিবেশন করবার জন্য মেয়েরা প্রায় পাঁচ-সাতজন উঠে এসেছেন অনসূয়ার সঙ্গে। এক-দুজন বয়স্ক পুরুষ উঠে গরম রুটির ডেকচি রান্নাঘরের দরজা থেকে হাতে হাতে এগিয়ে দিচ্ছেন। দিল্লি থেকে আসা টিম থেকে একটি মেয়ে বলবার চেষ্টা, করেছিলেন,

—আপনারা বসুন। আমাদের অ্যাসিস্টেন্টরা দিয়ে দেবেন।

কিন্তু অনেকে একসঙ্গে তাকে নিরস্ত করলেন। শেষে ওদের দলের যুবকটিও উঠে এলেন হাসিমুখে।

অন্যদিন খাওয়ায় ঘরে রান্নার ধরন বা খাওয়ার কি বসবার অসুবিধা, গরম জলের অভাব—এসব নিয়ে টুকটাক কথা শোনা যায়। অতি সাদাসিধে খাবার শেষ করে সবাই তাড়াতাড়ি উঠে যাবার চেষ্টা করেন নিজের ঘরের অপেক্ষাকৃত উষ্ণতায়। আজ যেন সে ঘরটার চেহারাই পালটে গেছে। আলোগুলো অনেক উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। ফৌজি অরুণ রান্নাঘরের ভেতরে গরম রুটি উনুনের পেট থেকে হাত ঢুকিয়ে টেনে আনতে আনতে লাল হয়ে ওঠা ঠাকুর—ওদের কাছে অনসূয়া ওদের দলের লোক, ওদের দিদি। তার গানে আজ এখানে এতগুলো বেড়া ভেঙে পড়েছে। খাবার ঘরটা হয়ে উঠেছে যেন একটা উৎসবের ঘর, এটা যেন ওদের নিজেদেরও কী একটা গৌরব—এরকম জ্বলজ্বল করছে সকলের মুখ। এমনকি অনেকে যাঁরা চুপ করে খাচ্ছেন তাঁরাও শরিক হয়ে গেছেন এই আবহাওয়ার।

মাদ্রাজী দম্পতিটি খেয়ে উঠে যাচ্ছেন, একটা টিফিন কেরিয়ারে ছেলের খাবার। অনসূয়া একটু সঙ্কোচ নিয়েই ওঁদের সঙ্গে যায়। এখন খাবার সময়ে একটি অসুস্থ ছেলের সামনে যাওয়া—! ঘরে ঢুকে সে বেশ অবাক হয়। ছেলে বলতে এতক্ষণ সে ভেবে এসেছে নিতান্ত কোনও কিশোর কি তরুণ। ঘরে যে ছিল, যে তাকে মা বাবার সঙ্গে তাকে ঢুকতে দেখে টেবিলের সামনের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সে অনসূয়ারই

কাছাকাছি বয়সী এক যুবক। এবং তার চেহারায় কোনও অসুস্থতাই অনসূয়ার চোখে পড়ে না। ভদ্রমহিলা টিফিন কেরিয়ার টেবিলের একধারে নামিয়ে রাখতে রাখতে নবাগত মেয়েটির সঙ্গে ছেলের আলাপ করিয়ে দেন। তার নাম রবি। সে জোড় হাত বুকের কাছে তুলে স্পষ্ট বাংলায় বলে,

—নমস্কার।

রবির মুখ তার বাবা মায়ের মত নরম নয়, অনেক গম্ভীর। যেরকম ভেবেছিল তার চেয়ে অন্যরকম হওয়ায় অনসূয়া একটু অস্বস্তিতে পড়েছে ঠিকই, কিন্তু সন্ধ্যেয় জ্বলে ওঠা আলো এখনও জেগে আছে তার মাথার ভেতর। বৃদ্ধের নাম এখন সে জেনেছে কৃষ্ণমূর্তি, তিনি তাকে আবার অনুরোধ করেন গানের জন্য। অনসূয়া ঘরের অন্য চেয়ারটিতে বসে। একটু সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে,

—ওঁর খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে—

বৃদ্ধ বলেন,

—ওসব ঠিক আছে, একদিন একটু ঠাণ্ডা খাবার খাওয়া যাবে এরকম গান শুনলে—

অনসূয়া কথা না বাড়িয়ে গান ধরে। সে ভেবেছিল একটা গেয়েই চলে আসবে। রবিই বলে আর একটা গাইবেন, প্লীজ?

গানের পর সারা ঘর একটু চুপচাপ। তারপর রবির মা তার পিঠে হাত রাখেন উঠে এসে। কিছু বলবার চেষ্টা করেন হিন্দি মিশিয়ে। তাঁর কথা সবটা না বুঝলেও ভাবটা বোঝে অনসূয়া। কৃষ্ণমূর্তি বলেন,

—য়ু হ্যাভ আ ডিভাইন ভয়েস।

অনসূয়া যাবার জন্য ওঠে। রাত্রি হয়েছে। ওঁরা তিনজনই ওর সঙ্গে বারান্দায় আসেন। সিঁড়ি দিয়ে কয়েকটা ধাপ নেমে উঠোন। সবাই সেদিকে এগোচ্ছে দেখে ভদ্রমহিলা কি একটা বলতে গেলেন। তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় সিঁড়িতে নামবার মুখে মুহূর্তে বিপর্যয় ঘটে গেল, কিভাবে যেন পা ফসকে টাল সামলাতে না পেরে রবি ছিটকে পড়ল মাটিতে। ওর মা একেবারে পাগলের মত ছুটে গিয়েছেন, মিঃ কৃষ্ণমূর্তিও। দু'জনে মিলে ছেলেকে ধরে তোলার চেষ্টা করছেন। অনসূয়া কি করবে বুঝতে না পেরে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, কেবল একটা জিনিস তার অবাক লাগল—রবি নিজে থেকে উঠবার চেষ্টা করছে না, যদিও অজ্ঞান হয়ে যায়নি। একটু পরে ধীরে ধীরে ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা ছেলেকে ধরে তুলে বারান্দায় দাঁড় করিয়েছেন। অনসূয়ার মনে হল ছেলেটির মুখ যেন খুব ফ্যাকাশে, এই কম আলোতেও খেয়াল করা যাচ্ছে। অস্পষ্ট একটা বিদায় নিয়ে দোতলায় নিজের ঘরের দিকে এগোল সে।

জানালার পাল্লা খুলে দিলে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস। কিন্তু মরা জ্যোৎস্নায় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বরফ পাহাড়। আজকের দিনটা যেন খুব লম্বা। সেই কোন্ সকালে শুরু হয়েছিল—বৈজনাথ যাওয়ারও কতো আগে থেকে, দুপুরে কমলালেবু গাছের তলা,

অরুণের ভাত নিয়ে আসা, কিরকম অবাক আনন্দে ভরে যাওয়া সন্ধ্যেবেলা। অথচ শেষ হওয়ার মুহূর্তটা যেন কি হয়ে গেল আবার! কি হল ভদ্রলোকের! বেশ লম্বা চওড়া চেহারা, দেখে মোটেই অসুস্থ বলে মনে হয় না, অথচ নিচে খেতে যান না—হঠাৎ তার মনে পড়ল মিসেস কৃষ্ণমূর্তির হাতের টিফিন কেরিয়ারের কথা। ইশ্ কে জানে সুস্থ হয়ে উঠে রাত্রে খাবে কি না বেচারি।

ঠাণ্ডা বাতাসে একটু কেঁপে উঠল অনসূয়া আর এতক্ষণে একটু ক্লান্তি অনুভব করল শরীরে। শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করল।

খুব কম বয়েস থেকে ও ছিল একেবারে ফুটবল পাগল। স্কুলের উঁচু ক্লাসে ওঠার পর যখন অন্য সব ছেলেরা সিরিয়াসলি ফাইনাল পরীক্ষার জন্য রেডি হচ্ছে আমি তখনও ওর নামে কমপ্লেন পাচ্ছি স্কুল থেকে 'হি স্পেন্ডস মোর টাইম ইন প্লেয়িং ফুটবল দ্যান ইজ গুড ফর হিম।' কতোদিন মেরেছি। অন্য সব ব্যাপারে খুব ভালো—সোবার, ভেরি ওয়েল বিহেভ্ড—লেখাপড়ায় খারাপ নয়, কিন্তু ওই—কোথাও থেকে যদি কেউ একবার খবর দিয়েছে ম্যাচ খেলতে যাবার জন্য তাহলে তুমি আর কিছু করতে পারবে না। ক্লাস ইলেভ্নে টেস্ট পরীক্ষার আগে কোথায় খেলতে গিয়ে কলার বোন ডিস্লোকেশন হল। সেই প্রচণ্ড যন্ত্রণা চেপে রাখল ওই ছেলে দুইদিন ধরে। বন্ধুদের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি। খেলতে খেলতেই বি এসসি পাশ করল। চাকরিও পেল রেলে। আমরা, বিশেষ করে ওর মা, কতো বলেছি বিয়ে করার কথা, সে শুনবে না। বলে, তোমরা দু'জনেই প্রায় খেলা বন্ধ করার জোগাড়, তারপর আবার বৌ এলে! আসলে ইদানীং আমরা ভয়ও পাচ্ছিলাম বেশি—গত কয়েকবছর ধরে ঝোঁক হয়েছিল মোটর বাইক রেসিংয়ের। চাকরিতে জয়েন করেই যখন মোটর বাইক কেনে, ওর মায়ের একেবারে মত ছিল না। কিন্তু আমাদের ওই একটাই ছেলে—বড়ও হয়ে গিয়েছে, শখের জিনিসে কি করে বাধা দেব। ওর বয়সী ছেলেরা কতো বাজে নেশা করে। এক-দুটো ছোট ছোট র‍্যালিতে ফাস্ট হল, অফিসও উৎসাহ দিচ্ছিল, তৈরি হল ট্রান্স হিমালয়ান র‍্যালির জন্য, গত বছর....

একটু থামলেন কৃষ্ণমূর্তি। চুপ করে তাকিয়ে রইলেন সামনের জঙ্গলে হাওয়ায় বেঁকে আবার সোজা হওয়া চীর গাছগুলোর দিকে। তারপর একটা ছোট্টো নিঃশ্বাস ফেলে কথার উড়ে যাওয়া সুতোটা ধরলেন আবার,

—দিল্লির আট কিলোমিটার আগে বাঁক নিতে স্কিড করল গাড়িটা, একটা প্যাঁচিলের ওপরে পড়ল গিয়ে। ডান পাটা হাঁটু পর্যন্ত বাদ দিতে হল—

অনসূয়া চমকে বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকায়।

কাল তো স্বাভাবিকভাবেই—

—ইয়াস মাই চাইল্ড, ইট্স আ জয়পুর ফুট—হি নাও ওয়াক্স উইথ। ছ'মাস আগে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে। তারপর ওকে নিয়ে বম্বে গিয়েছি আমরা—

মাস খানেকের বেশি থেকেছি ওখানে। এখন ও ওই পায়ে চলাফেরা করে। কিন্তু এখনও ইজিলি পারে না। তার চেয়েও বড় কথা—হি ইজ ইন আ স্টেট অব ডীপ ডিপ্রেশন। ও কিছুতেই কলকাতায় থাকতে চাইছে না, পাছে বন্ধুবান্ধব পরিচিতরা ওকে দেখতে আসে। হি'জ আফ্রেড দ্যাট এভরি বডি উইল পিটি হিম। আমরা অনেক বুঝিয়েছি, আমাদের পরিবারের গুরু আছেন, তিনি বুঝিয়েছেন—ও কিছুতেই নিজের এই অবস্থাটা মেনে নিতে পারছে না। হি ইভ্‌ন ট্রায়েড সুইসাইড—

আবার থামলেন কৃষ্ণমূর্তি। অনসূয়া এতক্ষণ যেন ঘোরের মধ্যে শুনছিল, এখন সে আস্তে আস্তে বৃদ্ধের কোলের ওপরে রাখা হাতটি ধরে। ঠাণ্ডা শীর্ণ আঙুলগুলি, ক্লান্ত।

—তাই আপনারা ওঁকে নিয়ে এখানে এসেছেন?

—হ্যাঁ। হি ওয়ান্টস টু গো টু প্লেসেস ভেরি ফার অ্যান্ড আননোন। আমরা এখন আর নিজেরা কিছু ভাবতে পারছি না—

অনসূয়া তাঁর মুখের দিকে তাকায়। মাথার পাতলা চুলগুলি সব সাদা। কালো মুখখানার ওপরে অনেক রেখায় যেন এক জটিল দীর্ঘ দুঃখের কাহিনী লেখা। এখন তো ওঁদের ছেলের আশ্রয়ের নিরাপত্তায় থাকার কথা, তার জায়গায় কি না ছেলের পাশে লেখা 'ডিপেন্ডেন্ট' বাপ মাকে আসতে হয়েছে অতোবড়ো ওরকম ভেঙে পড়া ছেলেকে নিয়ে!

এতক্ষণে রোদ্দুরে একটু তাপ টের পাওয়া যাচ্ছে। বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা। কাল রুণুবৌদিরা এসে যাবে। কালকেই এখানে তার শেষ দিন। সকালে দেখতে গিয়েছিল, কুঁড়িটা এখনও একেবারে ঢাকা। কিন্তু যেন সময় হয়ে এসেছে ফুটবার, যেন যেকোন মুহূর্তে ফেটে যাবে সবুজ ঢাকনা। দুবেজীর মুখোমুখি পড়তে একটু চুপ করে থাকলেন। তারপর কেবল শুধোলেন,

—আজ ভী গায়েঙ্গী না আপ?

মাথা নাড়ল অনসূয়া। ভদ্রলোক নিজের মনেই বললেন,

—আত্‌মা তক্ রওশান হো গয়া—তারপর হঠাৎ নিচু হয়ে পাশের পপিগুলোর গা থেকে শুকিয়ে যাওয়া পাপড়ি সরিয়ে দিতে লাগলেন। আজকের সকালের সঙ্গে যেন ভালো লাগা আর মন খারাপ কেমন মিশে আছে। এই ক'দিন ধরে কেন নিজেকে এমন বন্ধ করে রেখেছিল সে? আজকে খুব বাঁচতে ইচ্ছে করছে। খুব করে ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে সবাইকে। কমলালেবু গাছতলায় যেখানে বসে সে এ ক'দিন তরকারি কাটত, আজ গিয়ে দেখে তিন-চারজন পাঞ্জাবি মহিলা সেখানে বসে গল্প করছে। সে যেতে ঠাকুর এসে তরকারি ঝুড়ি বার করে দিল। ওই মহিলারা একটু অপ্রস্তুত হেসে একবার জিজ্ঞাসা করল,

—আমরাও কাটি?

উত্তর পাবার আগেই দু'জন চলে গিয়েছে খাবার হলের ভেতর, আরো ছুরি

চেয়ে আনতে। হাসতে হাসতে ভাঙাচোরা ভাষায় নিজেদের মধ্যে গল্প হয়। ছুরিতে ওদের হাত অনসূয়ার চেয়ে অনেক দ্রুত চলে। পনেরো-কুঁড়ি মিনিট তরকারি কাটা শেষ। তারপর উঠে এসে মিস্টার কৃষ্ণমূর্তিকে দেখেছিল। তিনি নাকি ওকেই খুঁজছিলেন। গতকাল রাত্রের ঘটনায় বিব্রত এবং একটু লজ্জিত ছিলেন বৃদ্ধ। সকাল থেকে ওঁর স্ত্রীও নাকি কয়েকবার বলেছেন অনসূয়ার কথা। রবি ভেঙে পড়েছে আরও বেশি। অনসূয়ার সামনে খুব স্বাভাবিক থাকতে চেয়েছিল ও, তাই এগিয়ে দিতে আসে। ব্যথাও পেয়েছে অবশ্য। সকাল থেকে নাকি কিছু খায়নি, বই মুখে করে চুপ করে শুয়ে আছে।

থার্মাসে চা ভরে নিয়ে আধঘণ্টার আগেই কৃষ্ণমূর্তিদের ঘরে আসে অনসূয়া। ফৌজিকে বলতে করে দিয়েছে চা। রবির মা চেয়ারে বসে বাইরে তাকিয়েছিলেন। রবি শুয়ে। অনসূয়া এক মুহূর্ত দ্বিধা করে তারপর হেসে মিসেস কৃষ্ণমূর্তিকে বলে,

—দেখুন একটু চা ম্যানেজ করেছি, খাবেন?

মহিলা একটু অবাক হয়ে তাকান। কি বোঝেন কে জানে, দুটো ছোট ছোট স্টিলের গ্লাস বার করে দিয়ে বলেন তিনি, মাত্র একবারই চা খান। অনসূয়া চা ঢেলে নিয়ে সোজা রবিকে বাড়িয়ে দেয়। সে মুখ থেকে কাগজ নামিয়ে এদিকে তাকিয়েছিল। তার মা প্লেটে করে সরু লম্বা কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো বিস্কুট জাতীয় কি দেন। সেটা আর নিজের চায়ের গ্লাস নিয়ে অনসূয়া চেয়ারটা খাটের পাশে টেনে নিয়ে এসে বসে। খুব সহজভাবে খুব আস্তে জিজ্ঞেস করে,

—ব্যথা কমেছে এখন? রবি তীব্র চোখে তাকায়। হাতের চায়ের গ্লাস ঠোঁটের দিকে উঠতে গিয়ে থমকে যায়। অনসূয়া চোখ সরায় না। রবি গ্লাস মুখে তোলে। দু'জনেই একটু চুপ করে থাকে। মিসেস কৃষ্ণমূর্তি উঠে একবার দরজার চাছে পর্যন্ত যান, আবার ফিরে এসে বসেন। রবি বিছানাতেই উঠে বসে। তাকে শুকনো দেখায়। এমনিতে তার চোখ বেশ উজ্জ্বল। সে চা শেষ করে গ্লাসটা নামিয়ে রাখে, তারপর বলে,

—আপনাকে বাবা আমার কথা বলেছেন?

পরিষ্কার বাংলা বলে সে। টানও নেই কথায়। অনসূয়া মাথা নাড়ে,

—না, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম বলে উনি আমাকে নিজের কথা বলেছিলেন।

—কি কথা?

—এইসব—ছোটবেলায় কিরকম সাহসী ছিলেন আপনি। কলারবোন ভেঙে গিয়েছিল চুপচাপ সহ্য করেছিলেন, তাও খেলা ছাড়েন নি।

—আর?

মিস্টার কৃষ্ণমূর্তি ঘরে ঢোকেন। অনসূয়াকে দেখে প্রথমে খুশি। তারপর তাঁর মুখে বিব্রত ভাব, দুশ্চিন্তা এবং নিশ্চিন্ততা একসঙ্গে খেলা করে যায়। এদের হাতে চায়ের গ্লাস দেখে অকৃত্রিম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন,

—হাউ কুড য়্যু ম্যানেজ দিস?

—আপনি নেবেন একটু?

হ্যাঁ, বলতে গিয়ে আড়চোখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে না বলেন বৃদ্ধ। তারপর হঠাৎ খুব সাহসী ভঙ্গি করে একটা কাচের গ্লাস নিয়ে আসেন,

—আছে আর?

চা হাতে নিয়ে তিনি এসে রবির খাটে বসেন। স্ত্রীকেও ডাকেন। ভদ্রমহিলা এতক্ষণ যেন কিছু ঠিক করতে পারছিলেন না কি করবেন, স্বামী বলতে উঠে এসে বসলেন। কৃষ্ণমূর্তি কিছুটা জোর করে স্বাভাবিক হবার চেষ্টায় ওদের কথায় যোগ দিতে চান।

—কি গল্প হচ্ছিল তোমাদের?

—এই বাড়ির কথা—এইসব। কতদিন আছেন আপনারা কলকাতায়?

—অনেকদিন। আমার বড়দাদা রেলে ছিলেন। আমি শুরুতে রেলস্কুলে টিচিং করেছিলাম, পরে লাইব্রেরিয়ানশিপ পড়ে ন্যাশনাল লাইব্রেরির তামিল সেকশানে ছিলাম ত্রিশবছর। তোমাদের বাড়ি কোথায়?

—ঢাকুরিয়া।

—রিয়ালি? তবে তো তুমি কাছেই থাক। মনোহরপুকুর রোডে থাকি আমরা, ফ্ল্যাট কিনেছি ওখানেই।

মিসেস কৃষ্ণমূর্তি খুব আগ্রহী গলায় বলেন,

—ওকে আমাদের ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর দিয়ে দাও। অনসূয়াকে বলেন,

—ঠিক যাবে তো আমাদের বাড়ি? তাঁর গলায় প্রায় ব্যাকুলতা ছিল। কলকাতা মনে পড়তেই তার ভেতরটা ধক্ করে ওঠে। আবার সেই পথঘাট, অফিস। আবার সেই অফিস পাড়ায় অঞ্জনকে দেখতে পাওয়া। আচ্ছা, বিয়ে করেছে ওরা? হঠাৎ খেয়াল করে কৃষ্ণমূর্তিরা তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

দুপুরে পরিবেশন ও খাওয়ার পালা শেষ হলে অনসূয়া আবার কৃষ্ণমূর্তিদের ঘরে আসে। রবির মা থালা গ্লাস ধুচ্ছিলেন, টিফিন কেরিয়ার কালকের মতই টেবিলে রাখা ছিল। রবি দজরার দিকে চেয়ে শুয়েই ছিল। অনসূয়া জিজ্ঞেস করে,

—খেয়ে উঠে বাগানে হাঁটবেন একটু? সকাল থেকে শুয়ে আছেন—!

রবি সকালের মতই তীব্র চোখে অনসূয়াকে দেখে। যেন বুঝে নিতে চায় তার কথার মধ্যে অন্য কোন খোঁচা বা করুণা আছে কি না।

অনসূয়া তার দৃষ্টির তীব্রতা ও উৎকণ্ঠা একটুও গ্রাহ্য না করে আবার বলে,

—ঠিক আছে, আপনি খেয়ে নিন আমি আধঘণ্টা পর আসছি। খেয়ে উঠে শুলে শীত করে।

—কেন আপনি ভাবছেন যে আপনার আর কিছু করবার নেই? একটা পা জখম

হলে যদি মানুষের সব নষ্ট হত তবে তো কেবল একটা পা-ই থাকত তার—বাকি পা-হাতগুলো বেকার? মাথাটা—

—আপনি বুঝতে পারবেন না—একটা পা না থাকা মানে একটা মানুষ তো শেষ, কিছু আর করতে পারবে না সে—

—তাহলে যাদের ধরুন কোনও অ্যাক্সিডেন্টে দুটো পা-ই কাটা গেছে তাদের তো এক্ষুণি মেরে ফেলা উচিত? কিংবা যাদের চোখ নষ্ট হয়ে গেছে, যার ধরুন স্পাইনে চোট লেগেছে, সোজা হয়ে হাঁটতে পারবে না?

বাগানের একেবারে কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে তারা। ঝলমল করছে বরফের চূড়াগুলো।

—একদিনও বাগানে হেঁটেছেন এসে থেকে?

—না। লোকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে—

—কেন থাকবে? আর যদি থাকেও—কেউ তাকিয়ে থাকবে এই ভয়ে আপনি নিজে ঘরে ঢুকে বসে থাকবেন?

—এটা ভয়ের কথা নয়—সামান্য উত্তেজিত হয় রবি, লোকে বেচারা বলবে, আই হেট বীয়িং পিটী'ড।

—ওই চূড়াগুলো দেখুন—কথাটা ঘোরায় অনসূয়া। ওই যেই উঁচু হয়ে ছড়িয়ে আছে—চৌখাম্বা ওই যে বাঁ পাশে যেটার ভাঁজভাঁজ হয়ে ছায়া পড়েছে, ওইটে ত্রিশূল, ওদিকে দেবীস্থান মৃগথুনি, এই বাগানের ওপাশে ছোট ইন্ডিকেটার আছে, চলুন দেখব—

রবি চুপ করে তাকিয়ে থাকে তুষারশিখরগুলির দিকে। তার চোখ তৃষিতের মত। প্রায় ফিসফিস করে, নিজের মনেই হয়ত, সে বলে,

—কখনো যেতে পারব না ওখানে, কোনওদিন না—

দু'বার পুরো বাগানটার এমাথা ওমাথা পায়চারি করেছে তারা। প্রায় স্বাভাবিকভাবে হাঁটছে রবি। এতো সামান্য আড়ষ্টতা যে যারা জানে না তাদের চোখেও পড়বে না।

আজ সকালে এসে পৌঁছনো বোর্ডাররা বেশিরভাগই বাগানে এপাশে ওপাশে বসে আছেন। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস। বরফ ছুঁয়ে আসা সাদা বাতাস—বলেছিলেন সেই মহিলা।

কথাটা শুনে রবি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। অনসূয়ার ভালোলাগা জায়গাটায় এসে বসে তারা, প্রার্থনা ঘরের সিঁড়িতে। ঠিক সামনেই দাদুর কালো পায়ের হাঁটু ধরে দাঁড়ানো গোলাপি ফ্রক পরা পুঁটলি। হাঁটতে এসে প্রথমে অনেকক্ষণ রবি কোনও কথা বলেনি। আসতেও চায়নি। এমনকি তারপরও নিজের প্রসঙ্গে কথা উঠলেই কঠিন আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। অনসূয়ার অস্বস্তি হয়েছে, সংকোচও। কিন্তু তার মনে হচ্ছে কতো ছেলেমানুষ এই ভদ্রলোক, একটা পা হারানোকে জীবনের সবচেয়ে

বড়ো হারানো ভেবে ভেঙে যাচ্ছে। আসলে ছোট থেকে এ জিতে এসেছে। কখনও ধাক্কা খায়নি, তাই জানে না কী কী বাদ গেলেও বেঁচে থাকতে হয় মানুষকে। অন্য মানুষদের জন্য কতো দায় তাকে বয়ে চলতে হয়। জানে না বলেই নিজের দুঃখ নিয়ে নিজেকে বন্ধ করে রেখেছে। কৃষ্ণমূর্তি বলছিলেন ছ'মাসের পব আরও ছুটি বাড়াতে চাইছে রবি। চেষ্টা করছে অন্য কোথাও ট্রান্সফারের, যেখানে তাকে কেউ চেনে না। অথচ চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছরের পুরনো সংসার তুলে নিয়ে এখন কোথায় যাবেন তাঁরা—

কতো ছেলেমানুষ ভদ্রলোক! অনসূয়া আবার ভাবে। জায়গা বদলালে কি নিজেকে বদলাতে পারে কেউ। কলকাতা ছেড়ে যাবে, কোথায় যাবে? এতদূরে যাওয়া যেখানে নিজের থেকে সরে দাঁড়াবার জায়গা পাবে?

উঠে আস্তে আস্তে রবিদের ঘরের দিকে পা বাড়ায় তারা। আর কোনও কথা বলেনি রবি। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার মুহূর্তে ভিতরে ভিতরে উদ্বেগে শক্ত হয়ে যায় অনসূয়া। ওকে উঠতে সাহায্য করা অসম্ভব, যদি এক্ষুণি ঘরের ভিতর থেকে কৃষ্ণমূর্তি বেরিয়ে আসেন তবুও। অথচ কাল ঠিক এখানেই ওইভাবে পা ফসকে গিয়েছিল রবির। বাইরে খুব সাধারণভাবে সে দাঁড়িয়ে থাকে সিঁড়ির ধাপগুলোর নিচে রবির একটু পেছনে। যদিও জানে ওই লোকটি কোনওভাবে পড়ে গেলে সে ধরতে পারবে না।

পার হয়ে যায় মুহূর্তটা। সিঁড়ির ওপরে বারান্দায় উঠে রবি ঘুরে দাঁড়ায়, তার মুখ একটু লাল। কিছু একটা বলতে গিয়ে শেষপর্যন্ত কেবল মাথা নেড়ে একটা 'নড়' করে ঢুকে যায় ভেতরে।

আজ শেষবারের মত সেই চায়ের দোকানটায় ঘুরে আসে অনসূয়া। শেষবারের মত চোখে চোখে তাকিয়ে বরফ পাহাড়গুলিকে চলে যাচ্ছি বলতে তার গলা ব্যথা করে।

সন্ধ্যাবেলা প্রথমবারের মত আপন ইচ্ছেয় পরপর গান গায় সে আজ। প্রথমে ভজন, তারপর রবীন্দ্রসঙ্গীত। আগামীকালের পরকে ভয় করে তার। যেন সে জন্যই কালকে সন্ধ্যার জ্বলে ওঠা আলোকে সে স্থিরভাবে বসিয়ে নিতে চায় নিজের ভিতরে। মনে মনে আজকের গানগুলিকে সে চিহ্ন দিয়ে রাখে সামনের দিনগুলোর জন্য।

অন্যদিনের চেয়ে অনেক বেশিজন ছিলেন আজ সন্ধ্যেবেলা। ঘরের বাইরে বারান্দাতেও বসেছিলেন কেউ কেউ। বেরিয়ে এসে তাদের মধ্যে রবিকেও দেখতে পায় অনসূয়া। আবছা অন্ধকারে দুপুরের সিঁড়ির ধাপে বসা। অনেকে কথা বলতে আসেন অনসূয়ার সঙ্গে আজও। কালকের সেই বৃদ্ধ দম্পতি আজও কাছে এসে দাঁড়ান তার। কাল ভোরের বাসে কৌশানি ছাড়বেন তাঁরা। ঠিকানা নেন অনসূয়ার কাছে। গতকাল সন্ধ্যেয় যাঁরা ছিলেন তাঁদের অনেকেই আজ নেই, নতুন কেউ কেউ

এসেছেন। কৃষ্ণমূর্তিরা দু'জনেই আজ তার কাছাকাছি বসেছিলেন।

আজও খাবার পর একবার তাঁদের ঘরে যায় অনসূয়া। অল্পক্ষণের জন্য। সাধারণ দু-একটা কথা হয়। কোথায় গান শিখেছে সে, তার মা গান করেন কি না। মা ভালো গাইতেন একসময়ে একথা বলতে গিয়ে হঠাৎ যেন মায়ের ক্লান্ত উদ্বিগ্ন মুখটা নতুন করে মনে পড়ে। কতদিন গান গায়নি মা! কৃষ্ণমূর্তি বলেন,

—হতেই হবে। হেরিডিটারি না হলে এমন গলা হয় না।

রবি প্রায় কোনও কথাই বলেনি, খানিকটা যেন চিন্তিত মনে হচ্ছিল তাকে। কথায় কথায় অনসূয়া যখন বলে কালই এখানে তার শেষদিন, তখন কি একবার রবি তাকিয়ে দেখে? কৃষ্ণমূর্তিরাও যাবেন তার একদিন পরে। ভাওয়ালি হয়ে ভীমতাল যাবেন ওঁরা। অনেকবার করে মনে করান অনসূয়াকে তাঁদের বাড়ি যাওয়ার কথা। অনসূয়ার ঠিকানা নেন।

কথা বলতে বলতে দরজার সবচেয়ে কাছে চেয়ারটা নিয়ে বসেছিল অনসূয়া। সে প্রায় হঠাৎ উঠে রাত্রের মত বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসে। কাউকে এগিয়ে দিতে আসার কোনও সুযোগ না দিয়েই। এই একটা কারণেই এখন ওঁদের ঘরে যাবার ব্যাপারে দ্বিধা ছিল তার। বেরিয়ে এসে তার এবার মনে হয় মিস্টার কৃষ্ণমূর্তি খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধির মানুষ। তিনি তার দ্বিধা এবং সমস্যা দুটোই বুঝেছেন এবং যেভাবে সে বিদায় নেবার সমস্যাটা সমাধান করতে চায়, সেটাতে সাহায্য করেছেন। তাকে বারান্দা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে না আসা দিয়েই এটা বোঝা যায়।

পরদিন ভোরবেলা প্রশান্ত হোটেল থেকে উপছে আসা ভিড়ের থেকে একটু দূরে চা দেবার গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আজকের সূর্যোদয় দেখে অনসূয়া। আশপাশে লোকজন আছে আরো। কিন্তু পাহাড়ে সূর্যোদয় হয় প্রায় শেষরাত্রির অন্ধকারে, সূর্যকে দেখবার আগে কেউ কারো মুখ দেখতে পায় না।

একটু পেছনে রবিকে দেখে খুব অবাক হয় না, ভারি ভালো লাগে তার। সে হেসে একটু এগিয়ে যায়। রবি যেন একটা দোটানার মধ্যে আছে, তার মধ্যে থেকেই কথা বলে।

—একদিনও দেখেছেন এর আগে? জিজ্ঞেস করে অনসূয়া।

—না।

—কী সুন্দর না? এরকম একটা দৃশ্য দিয়ে দিন শুরু করলে দিনটাই ভালো হয়ে যায়।

রবি একটুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে,

—যাদের মন সুন্দর তাদের সব দিন এমনিই সুন্দর হয়। ফৌজি তার চকচকে মাজা বিশাল চায়ের কেটলি দুটো নিয়ে গাছতলায় পৌঁছায়। একটায় চিনিছাড়া কালো চা, একটায় সাধারণ। এই সময়ে অতিথিদের গরম চাটুকু দেবার জন্য কোন

অন্ধকার থাকতে যে ওঠে ওরা!

চা নিয়ে রবির কাছে ফিরে আসে অনসূয়া।

—কালকে কি ভাবছিলেন অতো? রবির কথাটা এড়িয়ে যায় সে।

—ভীমতাল গিয়েছেন আপনি?

—না। শুনেছি খুব সুন্দর জায়গা।

—কেন গেলেন না? এখান থেকে দূর তো নয়?

—আমি কৌশানিতে থাকব বলেই এসেছিলাম।

—ক'দিন থাকলেন এখানে?

—আটদিন। আজ নিয়ে ন'দিন হল।

—আ-ট দিন। এইখানেই রয়ে গেলেন? কেন? আপনি কি এদের মেম্বার? একটু হাসে অনসূয়া।

—মিস্টার রবি, কখনো মানুষ তো অনেক দূরে কোথাও পালিয়ে যেতে চায়, ভাবে দূরে অচেনা জায়গায় শান্তি পাবে, কষ্ট ভুলতে পারবে—

—আপনি—!

—কিন্তু কোথায়ই বা যাবে? যেখানেই যাক নিজেকে তো সঙ্গে নিয়ে যেতেই হয়। বরাবরের জন্য পালিয়ে থাকা যায়? সব মানুষের জীবনের সঙ্গেই তো অন্য অন্য মানুষদের জীবন জড়ানো থাকে, নিজের দুঃখের জন্য তাদের দুঃখ দেব কেন? তাদেরও তো কতো দুঃখ এমনিতেই আছে।

—কি হয়েছে আপনার? আপনাকে দেখে একবারও মনে হয়নি আপনার কোনও দুঃখ থাকতে পারে।

চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। কাপ দুটো ভেতরে দিতে যায় অনসূয়া। রবি বাধা দিচ্ছিল। হেসে বলে,

—এর পরের বার আপনার টার্ন।

—বলবেন না—?

—চলুন একটা জিনিস দেখাব। রবিকে কমলালেবু বাগানের কিনারে নিয়ে যায় সে। ওপরের ধাপ থেকে একটু ঝুঁকে দেখায় গাছটা।

—কোনওদিন খেয়ালই করিনি এত সময় লাগে একটা কুঁড়ি থেকে ফুল ফুটতে। আমরা তো ফুলটাই দেখি খালি। এখানে এসে ওই গাছটা আমার সবচেয়ে বড়ো পাওয়া, জানেন। কতো সময় নিয়ে কতো আস্তে একটা কুঁড়ি পালটে একটা ফুল হয়, তাই অতো সুন্দর হয়।

রবি একটুখানি তাকিয়ে দেখে অনসূয়ার দিকে তারপর সামনের দিকে চোখ ফেরায়। এদিকটায় নিচে আশ্রম থেকে বেরিয়ে যাবার রাস্তা। তার ওপারে জঙ্গল। আশ্রমের সিঁড়ির মুখোমুখি কী একটা বিশাল বড় গাছ, তাতে থোকা থোকা হলুদ রঙের ফুল ফুটে আছে। পাহাড়ে যে পাশ থেকে বাতাস দেয় সমস্ত গাছগুলি তার

উল্টোমুখে একটু নোয়ানো। সেদিকে তাকিয়েই প্রায় স্বগতোক্তির মত মৃদুস্বরে রবি বলে,

—আপনার চোখ খুব সুন্দর। আপনার কথাগুলো আমার মনে থাকবে।

অনসূয়ার সমস্ত রক্ত ছুটে কানে উঠে আসে। প্রায় চমকে রবির দিকে তাকায় সে। মুখ দেখতে পায় না, ওপাশে ফেরানো। না, ও কিছু মীন করেনি নিশ্চয়ই।

রুণুবৌদিরা আসেন সকাল দশটায়। গতকাল নৈনিতাল থেকে আলমোড়া এসেছেন। রাত্রিটুকু আলমোড়ায় কাটিয়ে আজ ভোরের বাস ধরেছেন। ছ'জন এসেছেন, জায়গা হয়ে গেছে দুটো ঘরে। ঠিক করেই এসেছেন সকালের দিকটা বিশ্রাম করে দুপুরে খাওয়ার পর যাবেন গরুড় চটি বৈজনাথ। কাল সকালে এখান থেকে বাসে আলমোড়া, সেখান থেকে গাড়ি নিয়ে কাঠগোদাম। হৈ চৈ বাধিয়ে দেন রুণুবৌদি আর তাঁর বোন মানু। কি করেছে অনসূয়া এতদিন, কোথায় কোথায় গিয়েছে? কোথাও যায়নি? সেকি! নিশ্চয়ই শরীর খারাপ হয়েছিল। যাকগে আজ গরুড় চটি বৈজনাথ যেতেই হবে। বৈজনাথ দেখে এসেছে? তা হোক, না হয় দু'বারই দেখেবে।

তারপর দু'দিন পর থেকে তো আছেই সেই সংসারের জোয়াল। তোমার অফিসের বাস আর আমার, মীনুর রান্নাঘর। তাও তুমি বাপু এক হিসেবে ভালো আছ এই খাঁচাটিতে ঢোকোনি। জানো না তো—সারাদিন খেটে মরো, তারপর দেখবে কেউ তোমার একটি কথা শোনে না, এই তো সামনেই বলছি, এই ছেলেমেয়ে আর তাদের বাপের কথা তো আর বলে কাজ নেই—সারা জন্মে আমার একটা কথা শোনেনি—

রুণুবৌদির ভগ্নিপতি শিশিরদা ফোড়ন কাটেন,

—তাই তো দেখছি।

সবাই হেসে ওঠে। রুণুবৌদিও। কিন্তু হেসেও দমেন না। হাত নেড়ে বলেন,

—এই ভালো করে শুনে রাখো, প্রত্যেক বছর আমাকে নিয়ে আসতে হবে পাহাড়ে। কী সুন্দর সব জায়গা। দেখলে আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না।

সন্ধ্যাবেলা বৈজনাথ থেকে যখন ফিরেছিল তারা প্রার্থনা শেষ হয়ে গেছে। দু-একজন দুঃখ করলেন, সে ছিল না বলে জমেনি। আজ সূর্যোদয়ে আবার রবিকে দেখেছে। আজও প্রায় চুপ করেই ছিল সে। অনসূয়া চায়ের ভাঁড় হাতে দিলে রবি বলে,

—কাল আমরা চলে যাব।

—ভীমতাল?

—হ্যাঁ। ভাবছি ওখান থেকে কলকাতাতেই ফিরে যাব।

অনসূয়া ওর মুখের দিকে তাকায়। বরাবরের মতই অন্যদিকে তাকিয়ে আছে রবি, কালকের কথাটাই আবার বলল সে,

—আপনার কথাগুলো আমি মনে করে রাখবো।

—প্লীজ—। আপনার নিজের জোর আমার চেয়ে অনেক বেশি দেখি।

একটু থেমে যেন একটু ভেবে নিয়ে রবি বলে,

—আমরা কলকাতা ফিরে গেলে আপনি আমাদের বাড়ি আসবেন?

আশ্রমের সিঁড়ি পর্যন্ত আসেন দুবেজী। ওরা সবাই বারে বারে বলে,

ফির আইয়ে গা দিদি, জরুর আইয়ে গা।

দুবেজী বলেন,

—আপনার জন্য একটা ঘর এখানে সবসময় থাকবে। আসবেন।

শেষ মুহূর্ত একবার গাছটাকে দেখতে যায় অনসূয়া। একটু একটু ফাট ধরেছে বৃতির গায়ে। মনে হয় আজ দুপুরের মধ্যে ফুটে উঠবে।

শারদীয়া প্রতিবেশ

অস্বচ্ছ

লিন্ড্‌সে স্ট্রিট ধরে সন্ধ্যেবেলা চৌরঙ্গির দিকে হেঁটে আসতে আসতে অশীন বলেছিল দ্যাখো, চাঁদের দিকে তাকাও। আর সত্যি চৌরঙ্গি থেকেও চাঁদ দেখা যায়। সরু একফালি চাঁদ পশ্চিম দিকে, যাকে বলে কাস্তের মতো। ওই চাঁদের ফালি আর পতাকায় আঁকা কাস্তে দেখেই তো জেনেছে কাস্তে দেখতে কেমন। অনেককাল আগে কে শেখাত চাঁদের রং লালচে দেখালে দু-একদিনের মধ্যে ঝড়বৃষ্টি হবে। কোথায় হবে তা কি বলত উন্নতিদাদা। চৌরঙ্গিতে অস্তগামী চাঁদের রং লাল দেখালে কি বোঝা যায় দাঁতনে প্রলয় হবে? এগ্‌রায়? উন্নতিদাদা তো মেদিনীপুরেরই লোক ছিল। মামার পিওন। মামা যখন যে শহরে থাকতেন, ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দিষ্ট বাংলোয় না থেকে শহরের খুব পুরনো কোনও ইতিহাসওলা বাড়িতে থাকতে পছন্দ করতেন।

মেদিনীপুরের সেই বিশাল থাম আর খিলানওয়ালা নাটমন্দির বাড়ির সামনের মাঠে বোনকে কোলে নিয়ে আর ঝুমুরকে পাশে বসিয়ে কত গল্প যে বলত উন্নতিদাদা। আর তার মধ্যে মামিমা কিংবা মায়ের ডাক কানে এলেই ডান হাতে নিজের কান ছুঁয়ে বলে উঠত, এই রে, মরিঠু।

কিছুই মনে নেই এখন আর মেদিনীপুর শহরটার, বাড়িটারও না, কেবল নাটমন্দিরের থাম, দেওয়ালির রাত্রে ছাদে ওঠা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে। তার, ঝুমুরের কোনও আনন্দ হত না দেওয়ালিতে, ভীষণ ভয় করত বাজির শব্দে। কেন ভয় সে জানে না, তখনও তো তার বিস্ফোরণের শব্দের সঙ্গে ধ্বংস কি মৃত্যুর সম্পর্ক শিখবার বয়স হয়নি, তবু ভয় পেত। দেওয়ালির রাত্রে কুকুরদের মতো। আর দাদারা যখন জোর করে তাকে টেনে নিত বাজি ফাটানোর উৎসবে আর কেউ তাকে বাঁচাত না—মা না, মামা নয়, সবাই কেবল বলত, যাও যাও ভয় পাচ্ছ কেন, দেখতো কেমন মজা করছে সবাই—খুব নিষ্ঠুর মনে হত বড়দের সকলকে। সেই দেওয়ালি।

একবার জিপে করে কোথায় যেন খুব দূরে বেড়াতে যাওয়া। চারদিকে জঙ্গল—ঠাণ্ডা ঘন। বড় বড় গাছের ভেতর দিয়ে আসা অল্প অল্প আলো। আর মনে আছে উন্নতিদাদাকে।

উন্নতিদাদাই কিন্তু প্রথম হিংস্রতা দেখিয়েছিল তাদের—

এক সপ্তাহও হয়নি অশীনের সঙ্গে হেঁটে আসছিল সে লিন্ড্‌সে দিয়ে, আর এর

মধ্যেই সেখান দিয়ে হাঁটছিল পুলিস আর মিলিটারির লোকেরা সাদা পোশাক পরে। অসম থেকে পালিয়ে এসে লুকিয়ে থাকা কাকে যেন ধরবে বলে। সেই লোক নাকি এখানে লুকিয়েছিল। আচ্ছা, সবাই কেন লুকোতে এই শহরটাতেই আসে। এটা একটা মজার শহর। শুকনো পাতায় ভরা একটা জঙ্গলের মতো। যেই তুমি একটা শুকনো পাতা অমনি এখানে মিশে গেলে।

ঝুমুর জ্বরের মধ্যে আজও বারবার সেদিনের সেই একফালি চাঁদকে দেখতে পাচ্ছিল। খুব সাদা হয়ে গেছে সেটা আর নেমে এসেছে তার বালিশের পাশে। পাশে সরে যেতে অশীন নয়, দেওয়াল লাগল গায়ে। কপালে কার হাত। মা যেন কী বলছে।

—শীত করছে?

সে জানে না। ভয়ংকর আলো আর তাপ বেরোচ্ছে সাদা চাঁদটা থেকে। ক্রমশ বিশাল-বি—শাল বড় হয়ে উঠছে সেটা। দেওয়াল বেয়ে নেমে আসছে প্রকাণ্ড সব পোকা। শুঁয়োপোকার মতো বেয়ে বেয়ে তার দিকে এগোচ্ছে। সেগুলোর মুখ ঝুমুর দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু তাদের হিংস্র রাগ দেখতে পাচ্ছে। তার দিকে আসছে পোকাগুলো। যত আসছে তত বড় হচ্ছে। হাত তুলে নিজেকে আড়াল করতে পারছে না ঝুমুর। তার আঙুলের মাথাগুলো কি ভারী! অশীন নেই, অশীন জঙ্গলের দিকে চলে গেছে। ঝুমুরের মুখ চোখ চুল পুড়ে যাচ্ছে রং খসিয়ে ফেলা সাদা চাঁদের আলোর তাপে।

অশী—ন! চিৎকার করে ডাকতে চায় সে। শব্দ করতে পারে না। হাসপাতালে বাবা শুয়ে রইল মুখে গজ-কাপড় ঢাকা দিয়ে, কেউ বাবার কাছে গেল না? মা গেল না? হলুদ আর মেরুন রঙের সব বড় বড় ছাপ, নাচছে, রং পাল্টাচ্ছে, ঘুরছে। না হলুদ রং কোথায়, ও তো আগুনের শিখা জ্বলছে। ধোঁয়ার অন্ধকার, চোখ জ্বলে যাচ্ছে।

কোথা থেকে ঠাণ্ডা নামছে। খুব ঠাণ্ডা। চেষ্টা করে করে চোখ খুলতে পারে শেষে। মা বউদি কিরণ। চোখের পাতা জুড়ে ঠাণ্ডা।

—জল খাবি? মা জিজ্ঞেস করে।

কিরণ জল নিয়ে আসে। মাথা তুলতে গিয়ে গলা কাঁধ পিঠ ভেজা। মাথার নিচের রবার ক্লথ ছাপিয়ে, বালতি ছাপিয়ে মেঝেময় জল। জামা পালটে দিয়ে মা বলে,

—একটু ভালো লাগছে? ঘুমোবার চেষ্টা করো, এখুনি ডাক্তারবাবু এসে পড়বেন।

কি করে ঘুমোবে! চোখ বন্ধ করতে ভয় করে ঝুমুরের। এখন দেওয়ালটা সাদা, কিন্তু চোখ বন্ধ করলে যদি আবার পোকাগুলো—

বউদি জানে তার এই পোকা দেখতে পাওয়ার কথা, মা তো জানেই। কিন্তু ওরা তো কেউ দেখতে পায় না। ঝুমুরও তো অন্য সময়ে দেখে না, কেবল জ্বর হলে—।

যখনই মনে হয় আঙুলের ডগাগুলো বড় আর ভারী হয়ে যাচ্ছে, ঝুমুর বোঝে ওর জ্বর আসছে। আর এত ভয় করে। আবার সেই কালো সবুজ নরম ল্যাতলেতে পোকা। দেওয়াল বেয়ে বেয়ে। বড় হতে থাকবে। মুখ দেখা যাবে না কিন্তু ভীষণ রাগ নিয়ে এগোতে থাকবে ঝুমুরের দিকে।

অশীন বলে, কেন ভয় পাও?

বলে, আমি আছি না?

কিন্তু থাকে না তো অশীন! তখন কি ছিল? হঠাৎ লিফ্‌ট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে যোধপুর ম্যানসনের আটতলা বাড়িটার নিঃঝুম সিঁড়ি দিয়ে নামছিল যখন! একটা লোককে তিনটে লোক টানাটানি করে তুলছিল, সে লোকটার জামাকাপড় রক্তে ভেজা। ঝুমুরের পা আড়ষ্ট, গলায় পাথর। তিনটে লোকের একজন বলেছিল,

—অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাক্সিডেন্ট ঘাবড়াইয়ে নহী—আপ ঘর যাইয়ে।

তারপরও তো ঝুমুর নামতে পারছিল না। পিঠের দিকটা সিরসির করছিল। হাঁটু শক্ত হয়ে যাচ্ছিল। বাকি পাঁচটা তলার সিঁড়িতে একটাও লোক নেই। দৌড়ে নেমে যাবারও ক্ষমতা ছিল না তার। মাকে বলতে পারেনি। বললেই তো বলতে হত কেন গিয়েছিল যোধপুর ম্যানসনে।

চোখ বন্ধ করতে চায় না, চোখ মেলে থাকতেও পারা যাচ্ছে না। জ্বালা করছে। অথচ বাবাকে দেখতে যেতে হবে—

আচ্ছা, ওই লোকটাকে কি মেরে ফেলবে মিলিটারি আর পুলিসরা? যুদ্ধের সময়ে লোকে অচেনা লোকদের গুলি করে মারে। এই লোকটাও নাকি অনেক লোককে গুলি করে মেরেছে। খবরের কাগজ লিখেছে, 'হোয়েন গ্রিল্ড বাই দ্য পোলিস হি কনফেস্‌ড্‌—'। সিনেমায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখায় তার মানে কি। দেখায় কি রকম করে মানুষের মুখের জায়গায় একটা কাঁচা মাংসের দলা। 'দ্রোহকাল' নামের একটা ছবি দেখতে গিয়ে, খানিক পরে সে উঠে চলে এসেছিল। ভয় হয়নি, কষ্ট হয়নি, শুধু ভীষণ গা গুলোচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এখুনি উঠে না গেলে পাশের লোকটার গায়ে নিশ্চয়ই বমি করে ফেলবে। অফিসের তিন বন্ধু মিলে গিয়েছিল। পরে শ্রীলতাদি ওকে বলেছিল 'ন্যাকা'। কিন্তু শব্দের মানে কী করে এমন পালটে যায় আর সেই পালটে দেওয়া মানেগুলোকে মেনেও নেয় লোক। এ কথা তো সবাই জানে 'গ্রিলিং' মানে আসলে মাংসের টুকরো শিকে বিঁধিয়ে আগুনে ঝলসানো। কি করে পুলিস কিংবা মিলিটারিদের অত্যাচার করে জিজ্ঞাসাবাদের কাজকে খোলাখুলি এই শব্দটা দিয়ে বর্ণনা করা হয়। এমন নয় যে যা সত্যি ঘটে তাকে খুলে না বলা ভালো, কিন্তু এরকম করে বলবার মধ্যে কি যেন একটা মজা করার মতো ভাব থাকে যাতে একটা মানুষের শরীরকে ঠাণ্ডামাথায় অত্যাচার করে করে থেঁতো করে দেওয়াটা একটা ঠাট্টার ব্যাপার হয়ে যায়। যেমন ঠাট্টায় একটি মেয়ের বীভৎস খুনের নাম দাঁড়াল কাগজে কাগজে 'তন্দুর মার্ডার'। যেমন মজা শিখেছিল চুরাশি সালে দিল্লিতে

স্কুলের ছোট ছোট বাচ্চারা, নন্দিতা বলেছিল স্কুলে স্কুলে এটা একটা চালু রসিকতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, হোয়াট্‌স আ শিক কাবাব?

—হোয়াট—ইট্‌স আ শিখ প্রপারলি বার্নড।

সেই তখন, ইন্দিরা গান্ধী খুন হয়ে যাবার পর মহল্লায় মহল্লায় যখন পরিচিত শিখ পরিবারগুলোকেও ফুটপাথে টেনে এনে ল্যাম্প পোস্টে বেঁধে গায়ে পিচ ঢেলে দিয়ে আগুন ধরানো হচ্ছিল, দীর্ঘ সময় ধরে ধীরেসুস্থে পরনের ওড়না এমন কি জোগাড় করে আনা শাড়ি ছিঁড়ে লম্বা লম্বা ফালি করে তাই দিয়ে উলঙ্গ করে ফেলা প্রৌঢ়া কি বৃদ্ধাদের আঁটসাঁট করে জড়ানো হচ্ছিল, অল্প অল্প করে মোবিল ঢেলে বাঁধনের প্রতিটা স্তর ভালো করে ভেজানো হচ্ছিল, তারপর জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। আর, কারা করছিল এসব? জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আসা খুনি গুণ্ডা ধর্ষকামীরা নয়—কলেজ ইউনিভ্যার্সিটির ছেলেরা, ছোটখাটো গৃহস্থরা। হ্যাঁ, তাদের সঙ্গে অ্যান্টিসোশ্যালরাও ছিল, লুঠপাট খুন করেছিল, কিশোরী কি যুবতীদের—

কিন্তু এরাও ছিল। যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েই ছিল।

এক মাস পরে স্কুলে যাওয়া নিজের সাত বছরের ছেলের মুখে ওই জোক শুনে রেগে কেঁদে সেই বন্দনা যখন ছেলেকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেবে ঠিক করেছিল, জয়ন্ত বলেছিল,

—ডোন্ট বি সিলি। এর মধ্যেই ওদের লড়ে বাঁচতে হবে। ভুলে গিয়েছ কীভাবে ভর্তি করতে হয়েছিল ওই স্কুলে?

সত্যি সে স্কুল ছাড়ায়নি। বন্দনাও এখন ওরকম ছটফট করে না, টিভিতে কত খুনজখমের এন্টারটেইনিং প্রোগ্রাম দেখে বসে বসে। দিল্লিতে মানিয়ে নিয়েছে ওরা। কিন্তু ঝুমুর বুঝতে পারে না বাঁচবার কথায়, ভবিষ্যতের কথায় ওরকম চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে, দাঁতে দাঁতে চেপে 'লড়ে বাঁচা'র কথা বলে কেন লোকে? মিলে-মিশে কি বাঁচা যায় না? যত বুঝতে পারে না ততই ভয় করে তার। চারদিকে তাকিয়ে ভয় করে। চারিদিকে তাকাতে গিয়ে ভয় করে। বাইরে পথেঘাটে ভয়, কেউ তো কারও দিকে তাকিয়ে দেখে না। একজন দেখতে গেলেও যে অন্যরা তাকে—। বাইরে না গেলেও তো ভয়, চোখের আড়ালে কী যে হচ্ছে কোথায়!

অশীন তাকে বলে, ভয় কেন করো?

বলে, আমি তো আছি।

কিন্তু অশীনের কি ভয় নেই? তাকে থাকতে হয় না নিজের সঙ্গে একা একা? বাবা মা ভাইবোনের পরও তো নিজের জীবনে একাই একটা লোক। তাকে নিজেই খুঁজে বের করতে হবে দাঁড়াবার জায়গা। অথচ এত অনিশ্চিতি চারদিকে। কতদূর যে তুমি কখন যেতে পারো আর কখন হঠাৎ বুঝতে পারবে আর সামনে যাবার জায়গা নেই!

মাঝে মাঝে অশীনকে সে আদর করে বলে, অশ্মি।

প্রথম প্রথম অবাক হত, এটা কি রকম নাম?

—জানে না? অশ্ম থেকে অশ্মি—পাথর।

—আমি পাথর নাকি?

—পাথরই তো। জলে ডুবে থাকো অথচ একটু জল ভেতরে ঢুকতে দাও না।

তারপর নিজেই হেসে অশীনের হাত ধরেছে—না, না, সেজন্য নয় মোটেই। তোমার ওপর আমি ভর রাখতে পারি যে! কিন্তু সেই বা কতদিন! অশীন! এক বছরও হয়নি ওরা পরস্পরকে চিনেছে। তারও কত পরে কাছাকাছি আসা একটু একটু করে। দু'জনের অনিশ্চিতি অবিশ্বাসকে একসঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখে একটুকরো খুব ছোট ভরসার জমি খোঁজা। অথচ মনের ভিতরে ভিতরে কেন যেন এ-কথা একেবারে নিশ্চিত মনে হয় যে থাকবে না অশীন। ঠিক যেমন কেউ থাকে না, কিছুই থাকে না বরাবরের মতো। বরাবর বলে কোনও কথা কি আর আছে? তবু অশীন বলে—

—আমি ঠিক জানি তুমি আছ। আর কী যে অদ্ভুত এই জানাটা। একজন কেউ আছে যার সঙ্গে আমি আমার সব ভালো লাগা খারাপ লাগা শেয়ার করতে পারি। বলে, ভালোবাসা বলে সত্যি সত্যি কিছু হয় কি না জানে! অত সব আমি ভাবতে চাই না। শুধু এটা ঠিক যে তোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়তে পারব না—একজন নিজস্ব কেউ আছে এই ফিলিংসটাই কি রকম অদ্ভুত।

সেদিন, জ্বরের আগে সেই হেঁটে আসবার দিন অবশ্য এসব কথা কেউই বলেনি তারা। একটু আগে বেরিয়েছিল ছবি দেখে—ভিয়েতনাম যুদ্ধের পুরনো ছবি। খড়ের চালে লাফ দিয়ে ওঠা সিপিয়া রঙের আগুনের শিখা। ছুটে বেরিয়ে আসা বুড়ির চিৎকারের শব্দহীন শট। ফ্রিজ। কার যেন আঁকা একটা ছবি দেখেছিল 'ক্রাই' বলে, ঠিক সেটা মনে পড়ল। ব্রিজের সবচেয়ে সামনের প্রান্তে একটা শব্দহীন ভয়ংকর আর্তনাদের চিৎকৃত মুখ। বিস্ফারিত হাঁ। আর যা ছবিটার সবচেয়ে ভয়ংকর অংশ মনে হয়েছিল ঝুমুরের সেটা হল, সেই আর্ত নিথর চিৎকারের ঠিক পিছনে নির্বিকার দাঁড়িয়ে কথা বলছে দু-তিনজন নারী-পুরুষ। এরকমই হবে? এরকমই হয়েছিল যখন বাবাকে লোকেরা—

কিন্তু বাবা চুপ করে থাকেন নি। বাবা তো বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে, বাস থেকে নামিয়ে যে-ছেলেটাকে সবাই মারছে ও বোধহয় পকেটমার নয়, কিংবা পকেটমার হলেও ওকে এভাবে মারতে থাকা—বাবা ওদের বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন, যারা মারছিল। বাবা বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তারপর কখন একজন বাবাকেও বলল ওর সাকরেদ! কখন ওরা বাবাকে ঘিরে ধরেছিল? পরে তো সবাই বলেছিল বাবার বাধা দেবার কোনও মানে ছিল না, তার আগেই ফুটপাথে পড়ে গিয়েছিল ছেলেটা। লোকে ঘিরে ধরে ওর সব আঙুল নিজেদের লাইটার

দেশলাই জ্বেলে জ্বেলে পুড়িয়ে দিয়েছিল। সব সব জায়গায় সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়ে পুড়িয়েছিল। সমস্ত জামা-কাপড় আগেই খুলে নিয়েছিল। সবাই মিলে ওর অণ্ডকোষ জুতো দিয়ে মাড়িয়েছিল। তখন কি মরেছিল ছেলেটা? বাসের ভেতর থেকে বার করে আনা একটা লোহার শিক যখন কে জানে কি দিয়ে ঠুকে ঠুকে ওর কানের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছিল, তার আগেই কি মরেছিল? শহরের রাস্তার মাঝখানে বিকেলবেলা ঘটেছিল এইসব, ভিড় উপছানো সিনেমা হলের দশ-পনেরো হাতের মধ্যে। বাবাকেও কি ওরা তাই করত সময় পেলে? বাবার একটা হাত শুধু পিছন দিকে হ্যাঁচকা টেনে ভেঙে দিয়েছিল আর বাবাব তামাটে-সাদা দাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। যদি পুলিসের গাড়ি না এসে পড়ত! পুলিসরা যদি বাবার কাঁধের ব্যাগে কলেজ লাইব্রেরির বই না পেত! আচ্ছা, যদি বাবা প্রফেসর নাই হত? ছোট কোনও দোকানদার হত যদি? খুব নিচুতলার কোনও কেরানি? যারা মারছিল তাদেরই মধ্যে যদি কেউ হত বাবা? কিংবা শিক্ষক অধ্যাপক ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তাররা কি কখনও থাকে না এরকমভাবে সবাই মিলে একজনকে পিটিয়ে পিটিয়ে মারায়? থাকে তো। কিন্তু সেদিন বাবাকে চিনতে না পারলে কি পুলিস বাঁচাত না বাবাকে? অথচ তারা—মা দাদা বউদি সে কিরণ, তারা তো একইরকমভাবে অপেক্ষা করে থাকত। পুলিসের জিপে হাসপাতালে গিয়ে বিছানায় বাবার মলম মাখা গজ কাপড়ে ঢাকা মুখ দেখবার বদলে রাস্তায় ফুটপাথে থ্যাঁতলানো ইঁদুরের মতো—মাছিতে ঢাকা—রক্ত থক্‌থকে—সে দেখেনি। অন্যরা বলেছিল।

কেসও হল। কেউ ধরা পড়েনি। পুলিস অফিসার বাবার খোঁজ নিতে এক-দু'দিন এসেছেন বাড়িতে। বলতেন,

—আসলে এসব মবিংয়ের ব্যাপার তো, খুব একটা কিছু করে ওঠা যায় না। এরা ঠিক ক্রিমিনাল তো নয় যে স্পষ্ট করা যাবে—

আর, ঝুমুর ভাবে এই মবিং মানে? মব বললে কি কোনও লোক থাকে না আর? তা কি করে হবে? যে হাতটা সিগারেট ধরিয়ে একটা প্রাণভয়ে কাঁদতে থাকা ছেলের চোখে চেপে ধরে সেটা তো একটা লোকেরই হাত? যে হাতটা কানের মধ্যে রড ঢুকিয়ে দিচ্ছিল সেই হাতটার মালিক লোকটা কি বাড়ি যাবে, হাতমুখ ধুয়ে চা খাবে? ভিড়ের মধ্যে থাকলে কি হয়, ওরা সবাই তো আলাদা আলাদা লোক! পরদিন আবার যখন রাস্তায় বেরোবে, বাসে উঠবে, ভিড়ের মধ্যে কারও পা মাড়িয়ে ফেলবে—ওদের ভয় করবে না যে আজ হঠাৎ বাকি লোকেরা 'মব' হয়ে যেতে পারে?

আচ্ছা, যদি বাবার কোনও ছাত্রও থাকত ওই ভিড়ের মধ্যে, তাহলে অন্য একজনকে বাঁচাতে গিয়ে বাবার যা হচ্ছিল তাতে সে কি বাধা দিতে যেত? বাবাকে বাঁচাতে যেত? নাকি যারা মারছিল নিজেকে তাদের বিশ্বাসযোগ্য রাখার জন্য সেও—দেওয়ালের পোকাগুলোর গা বেয়ে ঘন কালো রং গড়িয়ে পড়ছিল। অসহ্য যন্ত্রণা

হচ্ছিল ঝুমুরের কানের ভিতর, মাথার ভিতর। তাকে আর বোনকে গাড়ির বনেটের ওপর বসিয়ে রেখে উন্নতিদাদা 'মুরগির নাচ দেখবা' বলেছিল, আর তারা অপেক্ষা করবারও আগে, কিছু বোঝবারও আগে, ঝুড়ি চাপা দিয়ে রাখা তিনটে মুরগির মাথাগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল উন্নতিদাদা। আর সেই মুরগিগুলো, মাথা ছেঁড়া গলা দিয়ে রক্ত ছিটকাতে থাকা মুরগিগুলো ডানা ছড়িয়ে উঠোনময় ছুটছিল। বোন আর ঝুমুর চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল। এত জোরে যে ঘরের ভেতর থেকে মামা মামিমা আর মা ছুটে বেরিয়ে এসেছিল। ততক্ষণে মুরগিগুলো হয়তো মাটিতে পড়ে গেছে, সে আর জানে না। মা তাদের কোলে চেপে ধরে রেখেছিল, মামা জুতো নিয়ে উন্নতিদাদাকে মারতে গিয়েছিলেন।

সেই রাতে খুব জ্বর এসেছিল ঝুমুরের। মাথায় আইসব্যাগ, বোধহয় সারারাত। ক'দিন পর সেরে উঠে চলে আসবার আগে সে আর কিছুতেই উন্নতিদাদার কাছে যায়নি। উন্নতিদাদাকে দেখলে ভয় পাচ্ছিল। উন্নতিদাদারও খুব কষ্ট হয়েছিল। সে তো ভেবেছিল তাদের দু'বোনকে মজার একটা জিনিস দেখাবে, তারা যে ভয় পাবে সে কথা ভাবতেও পারেনি।

কেবল মামিমা একবার কেমন করে যেন বলেছিলেন, মেয়েছেলে হয়ে জন্মেছে, রক্তে এত ভয় পেলে পরে কি করবে? মেয়েদের কোনও ঘেন্না-ভয় টেঁকে নাকি শেষ অবধি? মানে বুঝতে পারেনি তখন, কিন্তু কেমন যেন অদ্ভুত লেগেছিল।

বাবা আবার কলেজ করছেন। এক্সটেনশন নিয়েছেন। শুধু তার, ঝুমুরেরই যে কেন এরকম!

বন্ধ চোখের পাতায় বড় আঁচ লাগে। পোড়া পোড়া আঁচ। আলো জ্বলছে ঘরে। সাদা তীব্র চাঁদ দেখেছিল তারা সেদিন? অশীন কি মেদিনীপুরের কথা বলেছিল? মেদিনীপুরে—? কোনও গন্ধ এসেছিল ওর কথা বেয়ে? যে গন্ধ ঝুমুরের মাথার মধ্যে এলোমোলো ঘুরছিল? তারপর অশীন কোথায় গেল সেখান থেকে। না, এটা তো হাসনুহানার গন্ধ। গেটের মুখটা জঙ্গল হয়ে গেছে। হাসনুহানাটা ছাঁটা হয়নি। বাবার হাতটায় তো জোর ফিরে আসেনি আর। দাদা বাড়ি ঢোকে সন্ধ্যার পর, ও এসব কোনওদিনই করে না। মায়ের জুঁইলতা বেড়ে বেড়ে জানালা ঢেকে দিয়েছে। ওটাকে সরানো হয়নি, ওটা দিয়ে অন্ধকার ঢুকছে। মাকে বলবে—

—মা, ওই জানলাটা বন্ধ করে দাও? ঝুমুর চোখ খুলে মাকে দেখতে চায়। হাত তুলে লতাটা দেখাতে চায়। কিন্তু কত-বড় তার আঙুলের মাথাগুলো! পাথরের। তাই এত ভারী। অন্ধকার হয়ে আসতে থাকা লতাটার মধ্যে লালরঙের কি যেন! টক্‌টকে লাল। জুঁইলতায় সাদা তারা তারা ফুল। তার মধ্যে কি ওটা? অশীন তো আসে না, কাকে তবে জিজ্ঞেস করবে যে ওটা কি? লতা বেয়ে পিছলে নেমে আসছে। ওই তো আরও কাছে এল। সাদা সাদা ফুলমাখা একটা পিস্তল। লাল পিস্তল। ঝুমুরের দিকে আসছে? এই পুরো বাড়িটার দিকে? মা—

কপালে মায়ের হাত—ঝুমুর, এই দ্যাখ তোর বাবা এসেছেন।

দেখা যায় না। চোখ মেলা যায় না। আগুনের আঁচ। অন্ধকারের আঁচ। এত পিস্তল বন্দুক কট্‌মট শব্দ করছে, মেশিনগান, কোথায় যাচ্ছে! না যাচ্ছে না—বাবার দিকে না, অশীনের দিকে না।

কিরণের জন্মদিনে মোমবাতি আর ফুল আর বেলুনের সঙ্গে সবাই আদর করে দিয়েছেন টেবিলে ভরা বন্দুক পিস্তল টমিগান। কিরণ মেশিনগান তুলে ভয় দেখাচ্ছে, লাল আলো ঝলক দিয়ে উঠছে কট্‌কট কট্‌কট—

—বউদি।

—কি বলছিস বউদিকে? এই তো এখানে—

মায়ের গলা। যেখানে মাথার মধ্যের অন্ধকার গড়িয়ে বাইরে আসছে তারও পেছন থেকে খুব কষ্টে ডেকে ঝুমুর বলে,

—বউদি, কিরণের হাত ধুয়ে দে।

সাপ্তাহিক দেশ

তাম্রসরস্বতী

এখন চাঁদও ডুবে গেল। পেয়ারাবাগানের নিচে শাদা মাটির ওপর সরুসরু ডাল আর পাতার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্নার জালিকাটা ছায়া পড়েছিল সেটা অন্ধকারে মুছে গেছে এতক্ষণে। আলোর টুকরো ঢাকা পড়ে সবটাই ঘন কালো হয়ে গিয়েছে। সেই কোন শুরুর দিকে শুয়েছিলাম ছায়া নাকি কালো হয় না—গাঢ় বেগুনি হয়, ম্যাটেড গ্রে হয়, গাঢ় সিপিয়াও হতে পারে কিন্তু কালো নয়। অথচ এখন ওখানে ছায়া মানে অন্ধকার কালো ছাড়া আর কি! আমার এই শরীরটার থেকে এই দুই হাতের থেকেও বোধহয় বেশি ভালো। না, তাকি হয়। আমার তো একটা ভাল্যুম আছে, মাস আছে তার ঘনত্ব ফাঁকা জায়গার ঘনত্বের চেয়ে বেশি হতে বাধ্য। ফাঁকা? ফাঁকা নাকি জায়গাটা? বিকেলে ফাঁকাই দেখেছিলাম। উঁচু জমিটা যেখানে ঢাল হয়ে নেমেছে তার পেছনে একটা ছড়ানো জলা। হঠাৎ। মানে এদিক থেকে ভাবাই যায় না ওখানে হঠাৎ একটা জলা থাকতে পারে। সেটা পার হয়েই জমিটা আবার উঁচু হয়ে উঠেছে। যেন এই ছোট টিলাটারই একটা ধারাবাহিকতা। চারদিকে উঁচু জমির মাঝখানে যেন একটা—যেন একটা বাটি নয় ঠিক, বরং ছড়ানো প্লেট। দেখলেই বোঝা যায় অগভীর। বোধহয় বর্ষাকালে চারদিকের থেকে গড়িয়ে আসা বৃষ্টির জলেই এটা তৈরি হয়েছে। জলের কিনার ঘেঁষে দু এক জায়গায় গোছা গোছা শর ঘাস। এই শীতশেষের সময়ে সেগুলো শুকনো, হালকা ব্রাউন। জলাটার পাশ দিয়ে ঘুরে কাঁকুরে লালচে মাটির টিবির পার হয়ে আবার ইচ্ছে মত হেঁটে গেলে দেখা যায় একটু দূরে পাম্পঘর আর তার পাশে এই চারদিকের ইয়েলো অকার থেকে বার্ন্ট সিয়েনা খেলানো ল্যান্ডস্কেপের মাঝখানে হঠাৎ বেমক্কা কতোগুলো সবুজের প্যাচ। বেশ বড়োবড়ো প্যাচ। ওপাশে কাদের সব চাষবাসের জমি। সেখানেই শসার মাচা, পেয়ারা বাগান।

পেয়ারা বাগানটা প্রথমে কি একটা অদ্ভুত লেগেছিল। পেয়ারা গাছ তো দেখে আসছি কোন ছোটবেলা থেকেই, পাড়ায় স্কুলের মাঠে তাছাড়া যখন পূর্বদিকের জমিটায় বাড়ি ওঠেনি তখন তো আমাদের নিজেদের বাড়িতেই একটা পেয়ারা গাছ ছিল। অবশ্য তখন আমি স্কুলের বেশ নিচদিকের ক্লাসেই পড়ি কিন্তু খানিক মনে আছে। ছোট মতনই গাছ ছিল, হালকা, হলুদ ছোট ছোট একেবারে গোল ফল। তারপর তো গাছটাই কেটে দিল। কদিন সেখানটায় ইটের পাঁজা আর কি সব হাবিজাবি। তারপর পাশের ওই তেতলা বাড়ি। এখন আর মনেই পড়ে না যে আমাদের ঘরগুলোয় কখনো রোদ আসত, সামনে সেই ছোট বাগানমত ছিল। কিন্তু

এই পেয়ারাবাগানটা অন্যরকম। কি যে অন্যরকম সেটা প্রথমে বুঝতে পারিনি। মাথার ওপরটা যেন পাতার একটা সিলিংয়ের মত, তার ভেতর দিয়ে, দুপুরবেলাতেও কড়া রোদ আসছিল না, আসছিল একটা সবুজ হালকা ফিল্টার চালানো আলো। আর গাছগুলোর তলায় কোন ঝোপঝাড় নেই একদম সাদা ঝুরঝুরে মাটি। চারপাশের লাল ডাঙার মত নয় মাটিটা। তারপর হঠাৎ বুঝতে পারলাম, গাছ নেই চড়বার মত। গাছ আছে, মানে গুঁড়ি দেখা যাচ্ছে, গোটা দশবারো হবে। কিন্তু নিচে কোথাও ডালপালা নেই। গাছের গোড়াগুলো যেন হলঘরের থাম। ডালপালা ফ্যাকড়া পাতা সব কিরকম ওপরে একটা আরেকটার সঙ্গে মিলে মিশে একটা প্যান্ডেল গোছের হয়ে গেছে। কোন্‌টা যে কোন্ গাছের ডাল বোঝার উপায় নেই। পেয়ারা গাছ তো জানি বেশ শক্তপোক্ত গাছ, খাড়া সব ডাল, এই বাগানের গাছগুলো এরকম কেন! কিরকম লতানো গোছের। কে জানে—আজকাল চাষবাসে বহুকিছু হয় শুনেছি, পেয়ারা লতাও হচ্ছে হয়তো! মানুষ পারেও বটে। অথচ এতো কিছু পালটাতে পারে, এতোকিছু বোঝে তাহলে নিজেদের পাল্টাতে পারে না কেন! একজন অন্যজনকে বোঝে না কেন? রিণা সেদিন মেয়েটাকে একবার কোলে করতে দিল না, একটু ছুঁতে পর্যন্ত দিল না। অজুহাতে দেখানো তোমার হাতে তার্পিন তেল লেগে আছে। সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে এলে কি দিতো? দিতো না।

আমি জানি।

জানি মানে ও নিজেই তো বলেছে,

আমার মেয়ে আমার একার। ওকে আমি আমার পছন্দমত মানুষ করব, তোমাদের মতকরে নয়। তুমি যখন ওখানেই থাকব, নিজের ডিসেন্ট সংসার করবে না আমাদেরও তোমাকে দরকার নেই। তুমি আর আসবে না। কেন এরকম হয়ে গেল রিণা?

অথচ প্রথমদিকে যখন আমার ছবি দেখত, ললিতকলায় আসত তখন কি রকম স্বপ্নময় চোখ ছিল ওর। তখন তো আর কারো সঙ্গে আলাপ পর্যন্ত করতে চাইত না। আমার বন্ধুদের পাগলাটে জীবনযাত্রা, ওদের ধরধারণ সাজ পোশাক ওর একেবারে পছন্দ ছিল না। কতোবার বলেছে,

তুমি ওদের থেকে একেবারে আলাদা। তুমি কতো সুন্দর—

হ্যাঁ এই কথাটা সেইসব সময়ে ও বারেবারে বলত। ওর চোখে আমার এই রঙিন পাঞ্জাবী, কাঁধের রঙিন ঝোলা এসব তখন সুন্দর লাগত। এই চেহারাটা নাকি ওর সুন্দর লাগত। আমি হাসতাম। বলতাম,

আমার কালো রঙের পাশে তোমার ওই ধপ্‌ধপে ফর্সার জেল্লা বেশি খোলে বলে আমাকে পছন্দ করো—

ও খালি হাসত। অথচ সেইসব কিছু কেন পালটে গেল বিয়ের পর অতো তাড়াতাড়ি। বিপিনবাউলের দেওয়া সেই ঝোলাটাকেই 'সভাসমাজে নিয়ে যাওয়ার জিনিস নয়' বলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। আমি পুরো মানুষটা সম্পর্কেই ওর এই

মতটা ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল—

সভাসমাজে নিয়ে যাওয়ার মত নয়। প্রেজেন্টেব্‌ল নয়।

ওর সভাসমাজ মানে ওর বাড়ি, সে বাড়ির আত্মীয়স্বজন, সে বাড়ির প্রতিবেশিরা ওর সব পুরোণ বন্ধুবান্ধব। জানি ওখানে ওইভাবে ও বড়ো হয়েছে, ওর রুচি পছন্দ ওদের সঙ্গেই মিলবে। কিন্তু আমাকেও তো ও পছন্দই করেছিল। আমি এই এখন যেমন এরকমই ছিলাম, আমি তো ওর মন ভোলাবার জন্য অন্য কোন রকম ভান করিনি। কখন ঠিক কোনখান থেকে যে বিণার ভালো-না-লাগা শুরু হয়েছিল আমি আজও বুঝতে পারি না। কখন অতোতাড়াতাড়ি সেটা ওরকম জায়গায় পৌঁছল। ভালো-না-লাগা নয়, আমাকে যেন ও ঘৃণা করতে শুরু করেছিল। আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না কি করব সব সময়ে সব কিছুতে বিরক্ত হয়ে থাকা। এক একদিন ঝগড়া করত আমি কোনদিন ওকে কিছু এনে দিই না বলে। কিছু মানে যুঁইফুলের মালা কিংবা একবার সেই কতো কষ্ট করে কতো উঁচু থেকে পেড়ে আনা নাগকেশরের পুরো একটা মঞ্জরী এগুলোকে ও 'কিছু' বলে ভাবতোনা কোনদিন। নাগকেশরটা পাড়তে গিয়ে দাঁড় করানো ঠেলাগাড়িটা থেকে পড়ে খুব ব্যথা পেয়েছিলাম, গোড়ালি মচকে ফুলে একাকার, ও কোন পাত্তাই দিল না। মা চুণহলুদ লাগিয়ে দিয়েছিল বলে ও 'গেঁয়ো চিকিৎসা' বলল। ব্যথায় সারারাত জেগে ছিলাম। চোখ জ্বালা করছিল খুব কষ্ট হয়েছিল, পায়ের ব্যথায় না রিণার উল্টোদিকে ফিরে নিশ্চিন্ত ঘুমিয়ে পড়ায় জানিনা। অথচ ইডেন গার্ডেনে নাগকেশর গাছের নিচে বসে ঘাসের ওপর থেকে ফুলটার বড়ো বড়ো ঝরা পাপড়ি কুড়োতে কুড়োতে দু'বছর আগে এই রিণাই মুখটা হতাশ করে বলেছিল।

একটাও আস্ত ফুল পেলাম না।

সেদিনই ভেবেছিলাম যেমন করেই হোক ওকে একদিন কেবল একটা আস্ত ফুল নয় একেবারে আস্ত একটা গোছা পেড়ে দেব। কি রকম অবাক হাসিতে ভরে যাবে মুখখানা। তক্ষুণি পাড়িনি। কোন ব্যাপারে ওরকম তাড়াহুড়ো করাটা আমার আসে না। মনে হয় তাতে কি রকম একটা দেখানেপনা রয়ে গেল, এক্ষুণি দেখ, এক্ষুণি প্রশংসা করো। ধুর্। কিংবা কে জানে, যারা ওটা করে হয়ত তারাই একরকম ঠিক করে। সময়টাই আসল। এক একজনের সময় এক মাপে চলে—কারোটা ধীরে সুস্থে, কারোটা খুব তাড়াহুড়ো করে পেরিয়ে যায়। আর তারা আগেকার কথা কেবল ভুলে যায়, নিজেদের কথাও। অথচ আবার যখন অন্যদের মত একদিন ওরজন্য শাড়ি কিনে আনলাম সেদিনও খুব রেগে ছিল। ভালো করে শাড়িটা হাতে করে তাকিয়েও দেখল না। সেদিন মায়ের সঙ্গে কিছু একটা ব্যাপার নিয়ে খিটিমিটি বেধেছিল বোধহয়। মা ভাবত রিণা আমাকে দখল করে নেবে, বদলে দেবে। রিণার মনে হত আমি বড্ড বেশি মায়ের দখলে থাকি। মা তো চিরকালই আমার স্বভাবকে দোষ দেয়—কুঁড়ে, বাউণ্ডুলে, খেয়াল খুশিমত চলিস—এইসব বলে। রিণারও এইগুলিই অভিযোগ—

তাছাড়া খিটিমিটি তো আমাদের রোজই বাধে, কোথাও, কারো না কারো সঙ্গে—তাবলে একবারও কি খুশি হবে না? নাই যদি হবে তো কখনোই হবে না, কিন্তু কখনো কখনো খুশি কখনো নয়, একই জিনিস একসময়ে ভালো লাগবে অন্য সময়ে তাতেই ক্ষেপে উঠবে—এরকম হবে কেন? রিণাকে ছুঁতে ভয় করত প্রথম প্রথম—পাছে ব্যথা দিয়ে ফেলি। আসলে সব মেয়েদের ব্যাপারেই আমার কী একটা অস্বস্তি, ভয়—যেন ওরা ঠিক যেমন তেমন রোজকার ব্যবহারের জিনিস হতেই পারে না, ওদের ক্ষেত্রে সবসময় খুব যত্ন খুব সাবধানতা—অথচ আজকে এই মেয়েটাকে—!

ও কেন শেষ বিকেলের আলো আঁধারিতে ওরকম অদ্ভুত একা বসে ছিল জলার ধারে শরগাছগুলোর কাছে পা মেলে? কেন মনে হল ও এখানকার কেউ নয়, আমাদের এই পুরো দঙ্গলটার কেউ নয়, অসম্ভব একা আর শান্ত? ওই জলাটার মতই?

এখানে তো সবাই আমরা হৈ হৈ করতেই এসেছি। স্কেচ্ করা এসব তো হবেই কিন্তু আসলে সবাই জানি সবাই নিজের নিজের মতো করে ঢাকনা ছেড়ে বেরিয়ে যেতে চায়। তার জন্যই তো ন-দশটা লোকের জন্য একটা এতোবড়ো বাড়ি এতো বড়ো বাগান ভাঙা পাঁচিল খিলান রঙিন কাঁচের নকশা। চারিদিকে এমন ত্রিভুবন ছড়ানো মাঠ। অপরেশদার কোন রইস বন্ধুর পড়ে থাকা বাড়ি। বাড়ি আর তার কেয়ারটেকার কাম মালি। সে লোকটাও বেশ। কি অদ্ভুত একটা বাংলা বলে, অর্ধেক কথা বোঝা যায় না। বাগানে কাল একটা গাছ দেখিয়ে বলেছিল সেটা নাকি চন্দন গাছ। গন্ধ টন্ধ কিছুই তো নেই। মায়ের ঠাকুরের চন্দন ঘর্ষার কাঠের সঙ্গে কোন মিল নেই। গুল! লোকটা বলল গুল নয়, চন্দনগাছে গন্ধ আসতে নাকি একশ' বছর সময় লাগে। বোঝ! যে লোকটা লাগাচ্ছে সে তারমানে গন্ধটা পাবার আশাই করতে পারে না। তো লাগায় কেন! অনেকদিন পর অন্যরা গন্ধ পাবে ভেবে? এমনি এমনি—চন্দনগাছ লাগাচ্ছি সেই আনন্দে? খানিকটা আগেকার দিনের মাস্টারদের ছবি সেই সব কিংবদন্তির মত ছবির মত ব্যাপার, আঁকছে লোকটা না এঁকে পারছে না তাই। কে কি বলছে, কার ভালো লাগছে কার লাগছে না পরোয়া করছে না। বিক্রির তো কথাই ওঠে না।

রিণা ভাবতো সেই সব গল্পের মত, আমি হাজার কি একলক্ষ ডলারে বিক্রি হবে আমারও ছবি! ভাবতো পেইন্টার মানেই ওরকম বিশ্বজোড়া নাম, সবাই চিনবে একডাকে আর ওর দিকে লোকে তাকিয়ে থাকবে অবাক হয়ে। যখন সেসব কিছুই হল না, দেখল নিতান্ত দুটো ঘর একটুখানি উঠোনের রংচটা গৃহস্থালী আমাদের, সেই মা বাবা দুটো নয়নতারা ফুলের গাছ, ছাদের সিঁড়িতে জল চোঁয়ানোর দাগ—ও ধীরে ধীরে ছবির ওপর রাগতে শুরু করল। ছবি আঁকার সব জিনিস শোবার ঘর থেকে বার করে নিলাম, ছাদের সিঁড়ি ঘরটায় রাখলাম। ওখানেই কাজ করেছি

দিনের পর দিন। অসহ্য গরমে। একজিবিশানের আগে সারারাত্রি জেগে কতোদিন। তবু ওর রাগ হত। রাত্রে এক একদিন উঠে আসতো, ছুঁড়ে ফেলে দিত ব্রাশ। আগুন-আগুন নিষ্ঠুর দেখাতো ওর সুন্দর মুখ। পাছে বাবা-মা জেগে ওঠেন আমি সব ফেলে নেমে আসতাম। সকালে উঠে কতোদিন দেখেছি ছুঁড়ে দেওয়া ব্রাস গুলো কাঠ হয়ে পড়ে আছে এধার ওধার। মনে হত ঠিক যেন মরে পড়ে আছে। সেইসব সময়ে রিণা চাইত আমি যেন ওকে আদর করি। আমি কি চাইতাম না? আমি তো প্রতি মুহূর্তে চাইতাম ওকে আদরে ভাসিয়ে নিতে। কিন্তু ও যেমন নিজেকে যেন একেবারে বন্ধ করে ফেলে সারাদিনের তার আগের দিনের আগের সপ্তাহের সব কিছুকে মুছে ফেলে দিয়ে কেবল সেই মুহূর্তটার উল্লাস চাইত সেটা আমি পারতাম না। সিঁড়িঘর থেকে সেই নেমে আসা, দশ মিনিট আগেকার রিণার আগুন হওয়া মুখ দাঁত চিপে বলা কথা আমার মাথার ভেতর বাজতে থাকত আমাকে অন্যমনস্ক করে দিত ওর মধ্যে ডুবতে দিত না। আস্তে আস্তে ওকে ভয় পেতে শুরু করেছিলাম আর তখন একদিন ও হঠাৎ আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে দাঁত চেপে হিস্‌হিস করে সেই কথাটা উচ্চারণ করেছিল। আমার মাথার মধ্যে এক ঝলক আগুন উঠে এসেছিল। এক মুহূর্তে আমি ওকে আঘাত করতে পারতাম কিংবা—কিংবা মনে হয়েছিল এখুনি ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিই, ঠিক যে ভাষায় যে প্রকাশ ভঙ্গিতে আমার বন্ধুরা কথা বলে ঠিক সে রকম করে ওকে বুঝিয়ে দিই আমার ক্ষমতা আছে কি নেই। কিন্তু বাস্তবে সে সব কিছু হয়নি। দরজা খুলে ছাদে চলে গিয়েছিলাম। সকালে বেরিয়ে এদিক ওদিক বন্ধুদের বাড়ি, ললিতকলা একাদেমি ঘুরে যখন শরীর ক্লান্তিতে একেবারে চুরমার তখন বাড়ি ফিরলাম। মাথায় তখনও গাঁথা ছিল শব্দটা আর সব কিছু। বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। ফিরে দেখলাম রিণা চলে গেছে। ওর মা বাবার কাছে। আমার যেন খুব স্বস্তি হয়েছিল, খুব ফাঁকা, সারা ঘরে ওর জিনিসপত্র। ওর গন্ধ। কেবল আয়নাটা কিছু দিয়ে ঠুকে ভেঙেছে। অজস্র চির-চির কাঁচে ফাটা ফাটা হয়ে ছায়া পড়েছে।

তারপর গিয়েছি। মায়ের কাছে ওর শারীরিক খবর শুনে অদ্ভুত অবাক হয়ে, ব্যস্ত হয়ে গিয়েছি। ওর বাবা মা দিদি খুব ভদ্র। নিরুত্তাপ। রিণা কখনো বাড়িতে ছিল কখনো ছিল না। ওরা কেউ কোনদিন আমাকে থাকতে বলেনি। আমার মেয়ে আমার মত হয়েছে! কালো। এক বছরের একদিনও ওকে কোলে নিইনি আমি। হাত দিয়ে ছুঁয়েছি দু একবার। রিণা পাথরের মত মুখ করে বলে—

তুমি কোলে নিতে পারবে না। ও ব্যথা পাবে

রিণার মা বলেছেন বাড়ি বিক্রি করে ভালো জায়গায় ফ্ল্যাট কিনতে যাতে মেয়ে ভালো পরিবেশে বড়ো হয়। ওসব ছবি আঁকার তো কোন ভবিষ্যত নেই, বম্বে টম্বেতে যে সব কানেকশন আছে সেসব কাজে লাগিয়ে দ্যাখো যদি—

অথচ ছোটবেলা থেকে মা বলত মেয়েরা শিল্পসঙ্গীত ভালোবাসে। দেখো না

সরস্বতী জ্ঞান আর শিল্পের দেবী। সরস্বতী।

কাল তো ওই মেয়েটাকে ওরা স্বাতী বলে ডাকছিল আজ জলার ধার থেকে উঠে আসবার সময় বলল কেন আসলে ওর নাম সরস্বতী? সেকেলে নাম বলে স্বাতী করে নিয়েছে? তাই যদি নিয়েছে তাহলে আজকে ওই উঁচুনিচু মাঠ একদিকে সূর্য ডোবার লাল অন্যদিকে পূর্ণিমার চাঁদ ওঠার সোনালি সে সবের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমাকেই কেন সেকেলে আসল নামটা শোনালো? আসল নাম! কেউ জানে কোন্‌টা কার আসল নাম। ওই জলাটার সাথে ওর কী!

এই এখন মধ্যরাতের একটু আগে যখন আকাশের নিচে জ্বালা আগুনের শিখা আপন মনে উঁচু হয়ে জ্বলছিল, হাতে হাতে ঘুরতে থাকা বোতলগুলো খালি আর আমাদের শরীর আগুন হয়ে উঠছিল আমি তো নিজের মনে হাঁটব বলেই জটলা থেকে উঠে গিয়েছিলাম জলার কাছে টিলার ওপর একা? চাঁদের নিচে ওরকম একা থাকতে হয়? ও জানেনা? আমি যখন ওর হাত ধরলাম ও নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালো যেন আমার সঙ্গে যাবে বলেই বসে আছে। কাল যখন সুদীপ্তার সঙ্গে আমি খেলবার চেষ্টা করছিলাম ও ওতো যাবার জন্য তৈরি ছিল কিন্তু সেটা এরকম যাওয়া নয়। জেনেশুনে খেলতে যাওয়া। শেষপর্যন্ত আমি গেলাম না। পারলাম না। সুদীপ্তাকে কাছে টানবার চেষ্টা করতেই ভেতরে কি যেন নিভে গেল।

এই মেয়েটা কি আসলে ওই জলাটাই? যার ওপর চাঁদের ছায়া? যার ধারে শুকনো শরবন? একটু পরে যে আমার বুকের তলায় মাটির ওপর জলাটার মতই শান্ত হয়ে শুয়ে ছিল আমার মধ্যে অনেক ভিতর কি সব যেন জেগে উঠছিল যার আমি কোন মানে জানি না যেন মাটির অনেক নিচ থেকে আমার পা বেয়ে বেয়ে আদিম কোন জঙ্গলের লতা উঠে আসছে। আমি কি ওর হাত ধরে ছুটছিলাম? কি করে পৌঁছলাম পেয়ারাবাগানে? আগুনের মত জ্বলছিলাম আমি। প্রচণ্ড গরম লাগছিল। জ্যাকেট সেই আগুনের ধরেই পড়েছিল। এই আগুনটা আমার মুখ বুক হাতের আঙুল পুড়িয়ে ফেলছিল। আমি ওর মুখ দেখিনি। প্রায় আছড়ে ওকে মাটিতে ফেলেছিলাম। শাদা মাটির মত শাদা ওর বুক। গলা। তাকিয়ে মনে হল চাঁদের আলোয় ভিজে যাচ্ছে। মনে হল ওর বুকের ওপর চাঁদের ছায়া টলটল করে উঠেছে। আমি ঠোঁট নিতে চাইলাম কাছে ওর হাত আমাকে জড়িয়ে নিল। এত শান্ত যেন ওর হাত মাটি ছেড়ে ওঠেইনি। যেন জ্যোৎস্নার জাফ্‌রির নিচে ও একটা আশ্চর্য গাছ। ডালপালা মেলে আমার ডালপালা ছুঁয়ে নিচ্ছে। আমি ওর কাছে যেতে চাইলাম। আরও, সবচেয়ে কাছে। আমার ভিতরে কোন আগুন নেই আর। শান্ত। বরফের চূড়া ছুঁয়ে আসা বাতাস আসছে সরস্বতীর বুক থেকে। আমি হাত তুললাম। দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরলাম নিবিড়। ডানহাত গলার ওপর রেখে খুব ধীর নিশ্চিতভাবে আমি ওর গলা টিপে দিলাম।

যখন চলে আসছি ওর নামিয়ে দেওয়া মাথা কাত হয়ে পড়েছিল কিনা আমি দেখে আসিনি। জ্যোৎস্নার মাটি রঙ শাদা রঙ ছাড়া আর কোন রঙ ছিল না।

কেউ ছিল জলার ধারে? পেয়ারা বাগানে?

সূর্য ও সাদাপাখিটি

সন্ধ্যা পার হয়ে গিয়েছে, ছেলেমেয়েরা এখনও ফিরল না দেখে মনে মনে উদ্বিগ্ন হচ্ছিল শ্রীলতা। অন্ধকার হয়ে গেল, তার চেয়েও বড় কথা কার্তিক মাসের হিম। বল্লীর এমনিতেই বারোমাস টনসিলে ব্যথা, কাশি। তার ওপর মাথায় হিম লাগালে আর দেখতে হবে না। সবচেয়ে অস্বস্তি হচ্ছে পাশের বাড়ির অন্বেষাকে নিয়ে গিয়েছে সঙ্গে করে। নিয়ে গিয়েছে মানে অবশ্য অন্বেষার মাই বলেছিল,

—যাক। একা তো যেতে পারত না। তিনজনে দল বেঁধে গেলে যাক না। মাসিও খুব খুশি হবে। এতবার করে বলেছে—মাসি মানে সুবালা। পাশাপাশি দুই বাড়িতেই কাজ করে সে। তোলা কাজ অবশ্য, অন্যান্য আরো তিনটে বাড়িতেও করে, তবে সেগুলো এই রাস্তায় নয়। সকাল সাতটায় আসে, যন্ত্রের মত কাজ করে, শ্রীলেখার বাড়ি আগে, তারপর চিত্রার বাড়ি। অন্বেষার মা চিত্রার তার আগে এক প্রস্থ রান্না হয়ে যায়। ওর স্বামী সকাল সাতটায় জলখাবার খেয়ে স্কুটার নিয়ে কারখানায় চলে যান। বারোটায় খেতে আসেন। শ্রীলতার বাড়ির কাজ শেষ করে চিত্রার বাড়ি যায় সুবালা। ওর ঘরদোর পরিষ্কার করে রান্নার যোগানও দেয়। কেটে বেটে দেওয়া, ভাতটা নামান—এই আর কি! তারপর যায় অন্যান্য বাড়িগুলোয়। শেষ দুপুরে নিজের বাড়ি ফিরবার আগে আরেকবার আসে শ্রীলতার বাড়ি। দুপুরের বাসনপত্র ধুয়ে মেজে রাখা, বিকেলের রুটি করে যাবার জন্য।

অনেকদিন এই বাড়ির সঙ্গে আছে সুবালা। পূর্ব যখন ক্লাস ফাইভে উঠল, যে মেয়েটি এখানেই থেকে ওকে দেখাশুনো করত তার বাবা বিয়ে দেবার জন্য তাকে নিয়ে গেল দেশে। তারপর থেকে আর সারাদিনের লোক রাখেনি শ্রীলতা। সেই তখন থেকে এই সুবালা। পূর্ব হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করল, কলেজে ভর্তি হল আর এখন কম্পিউটার নিয়ে নিজেই টুকিটাকি কীসব ছাপার কাজ করে। সুবালা দুবেলা যাতায়াত করতে করতেই এতগুলো বছর পার হল। পড়াটাও শেষ করল না পূর্ব। সেকেন্ড ইয়ারের শুরুতে ছেড়ে দিল কলেজ। বলল,

—গ্রাজুয়েট হতেই হবে এটা তোমাদের একটা কুসংস্কার।

শ্রীলতা রেগে উঠেছিল। বোঝাবার চেষ্টা করেছিল গ্র্যাজুয়েশান করাটা দরকার। পূর্ব হাসতে হাসতেই বলেছিল,

—আচ্ছা, আমাকে বোঝাও কেন? গ্র্যাজুয়েট না হলে চাকরি পাওয়া যায় না। মা, তুমি নিজেই জানো, গ্র্যাজুয়েট হয়ে, মাস্টার্স ডিগ্রি করেও হাজার হাজার

ছেলেমেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার বন্ধুগুলোকে দ্যাখো—বি এ, বি এস সি পাশ করেছে, দিনের পর দিন কত রকম কম্পিটিটিভ এক্‌জাম দিচ্ছে, পোস্টাল ড্রাফট দিয়ে দিয়ে চাকরির দরখাস্ত পাঠাচ্ছে। চেনাশোনা না থাকলে ভালো চাকরি হয় না। সেরকম চেনাশোনা তোমার কি বাবার নেই। আমরা এখন আর চাকরির কথা ভাবি না। আমি নিজের কাজ করব, বরং এক-দুজনকে আমিই চাকরি দেব, দেখো না—

—কিন্তু কলেজ পাশ না করলে লোকে তো তোকে শিক্ষিত বলে মানবেই না।

—না মানল। তুমি বলো, আমি যতটা পড়াশোনা করি তোমার চেনা কটা শিক্ষিত ছেলেমেয়ে করে? মা, তুমি কি মনে কর আমি পড়াশোনা জানি না? সেটা শ্রীলতা বলতে পারবে না। এই তো ক'বছর আগেই জিজ্ঞেস করেছিল,

—মা, আমি কি এবার বড়দের বই পড়তে পারি? শ্রীলতা বলেছিল,

—বড়দের ছোটদের বলে কোন বই হয় না পূর্বাই, কতগুলো বই ভালো আর কতগুলো ভালো নয়।

—না, তোমার তাকের বইগুলো?

—বারে, আমার তাকের বইগুলো তো আছেই একদিন তোরা বড় হয়ে পড়বি বলে। তার আগে কিছু কিছু গল্পের বই পড়। বঙ্কিমচন্দ্র পড়।

আর এখন সে ছেলে এমন অনেক কিছু পড়ে যা শ্রীলতা পড়েনি। পূর্ব মাকে বোঝায় রক্তের মধ্যে ঘোরানো সিঁড়ির মতো ডি এন এর কথা। বলে কার্ল সাগানের তত্ত্ব। বল্লীকেও বলে। কখন ও পড়ল এতসব! এই কথা ভাবতে গিয়ে মনে পড়ে বল্লী জন্মাবার অল্পকদিন আগে সন্ধ্যাবেলা টেবিলে বসে নভেম্বর বিপ্লব সম্পর্কে লিখছিল শ্রীলতা, হঠাৎ চোখ তুলে দেখে দরজার সামনে মা। অবাক খুশি লেগেছিল,

—কখন এসেছ তুমি? ডাকনি কেন? দাঁড়িয়ে আছ—

—না, দেখছিলাম। কতটুকু হয়ে আমারই পেটের মধ্যে ছিলে। আমার রান্নাঘরে বসে অ আ পড়তে। এখন তুমি কতকিছু জানো, যা আমি জানি না—

একই বিস্ময় সব মায়েরই হয়? যখন মেয়ে নিজে দায়িত্ব নিয়ে সংসার সামলায়! যখন বাবা হোঁচট খেলে ছেলে ধরে ফেলে? পূর্ব এসব ভাবনা জানে না। সে বলেছিল,

—তাছাড়া, এক সময়ে তোমরাই তো বলেছিলে স্কুল-কলেজের শিক্ষা মুর্খ তৈরি করে। বলেছিলে না?

বলেছিল বটে। সমস্ত মানেটা না বুঝেও বিশ্বাস করেই বলেছিল। পুড়িয়ে ফেলেছিল অনার্স পাওয়ার সার্টিফিকেট, ছেড়ে চলে এসেছিল ইউনিভার্সিটির চত্বর। কিন্তু, মাঝে মাঝে অবাক লাগে ভেবে, যারা নেতা ছিল সেই যুবউত্থানের, তাদের প্রায় সকলেই এখন বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক।

এটা কি করে হয়? অধ্যাপনার চাকরি পেতে হলে তো ভালো রেজাল্ট, উঁচু ডিগ্রি এসবের দরকার হয়। তবে কি যখন তারা নিজেদের সার্টিফিকেট ছিঁড়ে

ফেলছিল, নেতারা যত্ন করে শেষ করেছিল নিজেদের পরীক্ষাগুলো? অবশ্য মাঝে মাঝে চিড়্‌বিড় করে ওঠা ছাড়া কোন ক্ষোভ নেই তার, নিজের জীবন নিয়ে। যে জীবন সে পেয়েছে, ক'জন পায়? স্বাধীন ভাবনার অধিকার অর্জন করেছে, ঐটুকু কি কম পাওয়া? পূর্বকে তাই তারা খুব জোর-জবরদস্তি করতে পারেনি। বিবেকে আটকেছিল। নিজের পথ বেছে নেবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে, বাবা-মা হিসেবে তারা একটা বয়স পর্যন্তই পথনির্দেশ করতে পারে, তারপর পরামর্শ দিতে পারে, অনুরোধ করতে পারে। বকতে শাসন করতেও পারে, কিন্তু বাধ্য করতে পারে না। সে তারা করেনি। বল্লীর বেলা এ প্রশ্ন ওঠেনি, বল্লী প্রথম থেকেই স্কুলকলেজে আগ্রহ করে গিয়েছে, ভালো রেজাল্ট করেছে। পড়াশোনার বাইরে বেশি কিছু বিষয়ে বল্লীর আগ্রহ কম। সেও বকেছিল, তর্ক করেছিল ভাইয়ের সঙ্গে, কিন্তু শেষপর্যন্ত ভাইয়ের পক্ষই নিয়েছে।

—যদি ওর একদম ভালো না লাগে সিলেবাসের পড়া পড়তে তাহলেও ওকে সময় নষ্ট করে ওটা পড়তেই হবে, কতগুলো উদ্ভট প্রশ্নের উত্তর লিখে নম্বর পেতেই হবে, এর কোন মানে নেই।

শেষকালে পূর্ব শ্রীলতাকে মোক্ষম প্রশ্নটা করেছিল,

—তোমার ছেলে গ্র্যাজুয়েট নয় বলে কি লোকের কাছে তোমার লজ্জা হবে মা?

না, তা হবে না। নতুন জিনিসে, অনভ্যস্ত জিনিসে লজ্জা ভাঙতে হয়। ভেঙে যায় সময়ে। ও আমাদের মত নয়, তাই ও ভালো নয়। আগ্‌লি ডাক্‌লিং। সে নিজে যখন জেলে বন্দী ছিল তার মা কি লজ্জা পেতেন? জানে না। মায়ের তীব্র উৎকণ্ঠা, উদ্বেগের পরেও কি লজ্জার আর কোন জায়গা বাকি ছিল? তার মত আরো অনেক অনেক ছেলেমেয়ের মায়েদের? লজ্জা করলে কি সেই সব মায়েরা দিনের পর দিন থানায় যেত, তর্ক করত পুলিসের সাথে? অনুরোধ করত, মিনতি করত? জেলগেটে ভিড় করত 'জেলখাটা' ছেলেমেয়েদের দেখবার জন্য? খবর দেওয়া-নেওয়া করত অপরিচিত কিন্তু একই নাড়িছেঁড়া কষ্টের সাথীদের সঙ্গে? শ্রীলতার শাড়ি পরে থাকা কালুদাদার মাকে দেখে নিজের লোক বলে চিনতে পেরেছিল শ্রীলতার বোন প্রীতিলতা। অচেনা অপরিচিত বহরমপুর জেলের গেটে সাদা পোশাকের পুলিসকে চিনতে না পেরে তার সঙ্গে কথা বলতে দেখে বসুদেবের বাবাকে ডেকে নিয়েছিলেন স্বাতীর বাবা। নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। লজ্জা নয়, বরং ভয় কষ্ট সবকিছুর পরও একরকম চাপা গর্বের নির্ভয় পেয়েছিলেন হয়ত সেই মা-বাবারা, স্বজনরা। ছাব্বিশদিন থানার অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত ডালিয়াকে দেখতে এসে ডালিয়ার মা প্রথম প্রশ্ন করেছিলেন,

—কাউকে ধরিয়ে দিসনি তো? একই কথা শুধিয়েছিলেন পটুর মা,

কারো নাম বলে দাওনি তো?

শ্রীলতা দুঃখ পেতে পারে, তর্ক করতে পারে, রাগারাগি করতে পারে, কিন্তু

ছেলে নিয়ম ভাঙছে বলে লজ্জা পেতে পাবে না।

কিন্তু এই এরকম সব সময়ে উদ্বেগে বাগ হয। মনে হয় ছেলেমেয়েকে এতটা স্বাধীন মতামতে চলতে দিয়ে ঠিক করছে না সে। দাযিত্ববোধ তৈরি হচ্ছে না ওদের। বার বার করে বলে দিল,

—যাচ্ছ যাও, অন্ধকার হবার আগে ফিরে আসবে।

কোথায় কী! ঘন অন্ধকার হয়ে গেল, সঙ্গে একটা পরের মেয়ে আছে। রাস্তায় হোঁচট খাবে, না ঠাণ্ডা লেগে জ্বরজারি হবে কে জানে। যতই বলুক একটুখানি রাস্তা, মাসি তো রোজ হেঁটে আসে—দিনকাল যা হয়েছে, অন্ধকারে দুটো ছোট মেয়ে। সুবালাতো আসে সকাল বেলায়। কলকলানি শোনা যায় চিত্রার দরজার সামনে। তারপরই বল্লী পূর্বর উত্তেজিত গলা সদর দরজায়। শ্রীলতা মুখ গম্ভীর করে থাকে। ওরা খেয়ালও করে না, উচ্ছ্বসিতভাবে বলতে থাকে, সুবালা কত খুশি হয়েছে ওরা যাওয়ায়, কিরকম হৈ চৈ করেছে ওখানে সবাইয়ের সঙ্গে, সেই সব কথা। পূর্বকেও ছাপিয়ে বল্লীর উচ্ছ্বাস,

কি যে সুন্দর মা বাড়িগুলো! মাটির দেওয়াল, মাটির উঠোনে সরু সরু সাদা দিয়ে কিরকম আল্পনা দিয়েছে। খড়ের চাল, তার ওপর আবার সাদাসাদা ফুল ফুটে আছে, দারুণ।

—হ্যাঁ—একদিন গিয়েছে তো তাই। পূর্ব দিদিকে ক্ষ্যাপায়, ওখানে থাকতে হলে টের পেতি। না মা, ঘরগুলোয় কিরকম ভ্যাপ্‌সা গোবর গোবর গন্ধ।

কিন্তু সেও মেনে নেয় যে খুব সুন্দর করে ঘর লেপেছে মাসিরা, প্রদীপ জ্বালিয়ে সাজিয়েছে চারদিকে। বারবার বলে,

—ভাগ্যিস আমরা গিয়েছি মা, নাহলে খুব বাজে হত। জানো মাসি গ্রাম থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

—সব্বাইকে বলে রেখেছিল মা, আমরা যেতেই সবাই দৌড়ে এসেছে।

—আর পুজো দেখলি?

—হ্যাঁ। আমরা ফুল নিয়ে গিয়েছি বলে মাসি কি খুশি। কত জনকে বলল। থালায় করে পুজোর জায়গায় দিল।

—পুজো শুরু না দেখে আসতে দিচ্ছিল না যে, তাই জন্যই আমাদের দেরি হল। সুবালাদের পাড়ায় ওরা কালিপুজো করে আজ। পাড়াসুদ্ধ মেয়ে-পুরুষ উপোস করে থাকে সারাদিন। প্রথম প্রথম শ্রীলতা বোঝাবার চেষ্টা করেছে,

—এমনিই এত পরিশ্রম কর, কী বা খাও। তার মধ্যে উপোস কর কেন? তোমরা না খেয়ে থাকলে কি ভগবান খুশি হবেন? জবাবে সুবালা অবশ্য উল্টে তাকেই বুঝিয়েছিল,

—তুমি তো পুজোপালা কিছুই করনা, তুমি জানবে কি করে? একদিন উপোস করলে কিছু হয়না। ওটি আমাদের নিয়ম, সবাই করে।

গত বছর দুর্গাপুজোর আগে থেকেই সুবালা বলতে শুরু করেছিল পূর্বকে তাদের পাড়ার পুজো দেখতে যাবার কথা। পূর্ব হ্যাঁ-না কিছু বলেনি। পরে সুবালাদের এক জ্ঞাতির ছেলে এনকেফেলাইটিসে মারা যায়, ফলে সেবছর পুজোয় ওদের কোন ভাগ নেওয়ার ছিল না। এ বছর তাই কালিপুজোর জন্য দু'দিন ছুটি নেবার আগে সুবালা এই কথাটা পাকা করে গিয়েছে। বল্লী পূর্ব যাবে বলে চিত্রাও ছেড়েছে অন্বেষাকে। বোঝাই যাচ্ছে ছেলেমেয়েরা যেমন খুশি, ওদিকে সুবালা, তার ছেলেমেয়েরা, পাড়া-প্রতিবেশীও সেরকমই খুশি হয়েছে এরা যাওয়ায়।

—এমা, বলতেই ভুলে গেছি। ওমা, মাসি অনেক প্রসাদ দিয়েছে। বিকেলে নারায়ণ পুজো করেছিল, তার।

একটা পলিথিন প্যাকেটে পাতায় মোড়া প্রসাদ হাতে করে এনে রান্নাঘরে একটা স্টিলের থালায় উপুড় করে দেয় বল্লী। পেয়ারা বাতাবিলেবু পেঁড়া সব কিছুর এক প্লেট ভর্তি। একটা জিনিসের ওপর শ্রীলতার চোখ আটকে যায়। একটা ছোট সাদা হাঁস, চিনির তৈরি। তারা নিজেরা ছোটবেলায় এগুলোকে বলত মঠ, চিনির মঠ।

ওরা হাতমুখ ধুয়ে নিজেদের ঘরে চলে যায়—বল্লী নিজের পড়ার টেবিলে, এ-বছর থিসিস শুরু করেছে সে। পূর্ব নিজের কম্পিউটারের সামনে। বসুদেব বসার ঘরের খাটে এক গাদা খবরের কাগজ নিয়ে। শ্রীলতা খাবার টেবিলের পাশের চেয়ারে চুপ করে বসে থাকে। সাদা হাঁস, ঠোঁট সাদা, পা। অকুশলী হাতের ছাঁচে তৈরি। কিন্তু শ্রীলতার মনে হয় পঁচিশ বছরের সময় স্রোত পার হয়ে আসতে হলুদ রঙ উঠে সাদা হয়ে গিয়েছে এই ছোট্ট হাঁস। ধুয়ে গেছে পায়ের লালটুকু। না, পা দুটোত—

একি দুঃখ না সুখ বোঝা যায় না। আপনিই চোখ ভরে আসে।

দোলের দু'দিন পর কৃষ্ণার মা এসেছিলেন প্রেসিডেন্সি জেলের গেটে, মেয়েকে একবার দেখতো। সরস্বতী মূর্তি যদি নিজের যৌবন ঝরিয়ে ফেলে ষাট-পঁয়ষট্টির চেহারায় দেখা দিতেন কখন, তাহলে তাঁকে কৃষ্ণার মা সাজতে হত। সেই রকম সুন্দর গম্ভীর মর্যাদাময়। সকালে স্লিপ এসেছিল, কৃষ্ণার ইন্টারভিউ এসেছে—বলেছিল ফিমেল ওয়ার্ডার। বেলা দুপুর গড়িয়ে যাবার পরও জেল অফিস থেকে কোন সিপাই কি ওয়ার্ডার আসেনি নিয়ে যেতে। ইন্টারভিউ স্লিপ মানে বাড়ি থেকে কেউ এসেছে দেখা করতে তারই খবর। তার তিন-চারদিন আগে দমদমে জেলভাঙার প্ল্যান ধরা পড়েছে বলে খুব কড়াকড়ি। সিপাই ওয়ার্ডাররাও ক্ষেপে আছে। সবাই জানে যে এ-রকম সময়ে ইন্টারভিউ পাওয়া খুব কঠিন। যার হাতে যতটা কত্তাত্তি আছে, সবাই বাড়ির লোকদের দেখায়। বন্দীদের তো আর কিছু দেখানোর নেই, তারা তো এমনিতেই, বিনা বিচারেই চব্বিশ ঘণ্টা, না সাড়ে তেইশ ঘণ্টা, সেলে বন্ধ। স্নান-পায়খানার জন্য আধঘণ্টা খোলা। তবু যা হোক বিকেলে ওয়ার্ডার এসে নিয়ে গিয়েছিল কৃষ্ণাকে। আধঘণ্টা হবার আগেই ফিরে এল। হাতে একটা কাগজের

ঠোঙায় কিছুটা চালকলাই ভাজা আর চিনির মঠ। সব কটা ভাঙা। দোলের পরদিন এই কলাইভাজা আর চিনির মঠ অনেক বাড়িতেই আনা হত। অনেক ছোটবেলায় শ্রীলতা নিজের ঠাকুমাকে দেখেছে, তাঁর কাছে এটা একটা বিশেষ ব্যাপার ছিল। এগুলোর জন্য সকাল থেকে এসে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে মাকে? ভাঙা কেন মঠগুলো? গেট পাহারার সেপাই মাকে দাঁড় করিয়ে এক এক করে ভেঙেছে সুন্দর সুন্দর প্রত্যেকটা পুতুল। টিয়াপাখি, বৌপুতুল, ঘোড়া—সব। ওগুলোর ভেতরে নাকি বোমা লুকোন থাকতে পারে। তবু হেরেছে লোকটা। একটা এসেছে আস্ত—হলুদ রঙের গা, লাল রঙের এই ছোট-ছোট পা একটা এতটুকু হাঁস। ভারি খুশি হয়েছিল তারা। একটা পাখি তো পালাতে পেরেছে বোকা নিষ্ঠুর লোকটাকে ফাঁকি দিয়ে।

শ্রীলতা বেশ অসুস্থ থাকায় সেই সময়টায় জোনাকি আর কৃষ্ণা রাত্রে তার কাছে থাকবার অনুমতি পেয়েছিল। কড়াই ভাজা আর ভাঙা মঠগুলো খাওয়া হল, একবারে নয়, একটু একটু করে কয়েকদিনে। কেবল হাঁসটাকে রাখা হল সাজিয়ে। কৃষ্ণা অনন্ত সিংহের দলের সঙ্গে এ্যারেস্ট হয়েছিল যাদুগোড়া থেকে। ও আর মেরি একসঙ্গে ছিল হাজারিবাগ জেলে। প্রেসিডেন্সি জেলের দোতলায় একেবারে বিচ্ছিন্ন এই পাশাপাশি তিনটে সেলে গল্পে কথাবার্তায় দু'বছর ধরে বারে বারে উঠেছে মেরির নাম। ব্রিটিশ মেয়ে মেরি টাইলার জার্মানিতে দোভাষির কাজ করতে করতে যার পরিচয় প্রণয় ও বিয়ে হয় বাঙালি তরুণ ইঞ্জিনীয়ার অমলেন্দুর সঙ্গে। অমলেন্দু দেশে ফিরে এসে সত্তরের বিপ্লবী দলে যোগ দিলে মেরিও এদেশে আসে। যাদুগোড়ার জঙ্গলে দলের সঙ্গে সমস্ত কষ্ট ভাগ করে নিয়েই ছিল বিদেশী মেয়েটি। পুলিসের হাতে ধরা পড়বার পর বাকিদের যে বর্বর পুলিসী অত্যাচার সহ্য করতে হয় মেরিকে শারীরিকভাবে তা করতে হয়নি অবশ্য কিন্তু তার দূতাবাস থেকে তার ওপর ক্রমাগত চাপ ছিল নিজের দেশে ফিরে যাবার জন্য।

—আমি ভ্যালিড পাসপোর্ট নিয়ে এসেছি। পুলিসের আমার বিরুদ্ধে কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে তার জন্য শাস্তি দিক বা অন্তত প্রমাণ করুক।

আমার ভিসার মেয়াদ ফুরোবার আগে যাব কেন? এই ছিল মেরির পয়েন্ট। জেলে মেমসাহেব হিসেবে কোন বিশেষ সুবিধা নেবার কথা ভাবেওনি ও। এমনকি কৃষ্ণা চলে আসবার পরেও না। হাজারিবাগে গ্রামীণ বন্দী মেয়েদের সঙ্গে মিশে তাদেরই একজন হয়ে থাকবার, দুঃখে অন্যায়ে তাদের পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। এতদিনে, চারবছর পর পুলিস চার্জশীট তৈরি করতে পেরেছে, ফোর্থ ট্রাইবুনাল তৈরি করে ওদের বিচার শুরু হতে চলেছে। কৃষ্ণার হাজারিবাগ জেলে পড়ে থাকা সঙ্গীসাথীদের কলকাতায় নিয়ে আসবার কথা শুরু হয়েছে বলে শ্রীলতারা আশায় আশায় আছে একদিন হঠাৎ মেরি এসে পড়বে।

তিনজনে মিলে ঠিক হয় হলুদ হাঁসটা খাওয়া হবে না, ওটা থাকবে মেরির জন্য। মেরি যখন আসবে এই প্রিয় সাথীকে তারা কি দিয়ে অভ্যর্থনা করবে জেলের সেলে।

চরম একঘেয়ে এই দিনগুলোর মধ্যে হাঁসটাকে রেখে দেওয়া মানে যে কতখানি দেওয়া সে কেউ তো আর বুঝবে না জেলের বন্দী ছাড়া!

পনের কুড়ি দিন পেরিয়ে গেল, আরো দুবার ডেট পড়ল ফোর্থ ট্রাইবুনালের। জজ পালটে গেলেন মাঝাখানে হঠাৎ। মেরির আসবার কথাটা কিরকম যেন ধামাচাপা পড়ে গিয়েছে, কোর্ট থেকে এসে কৃষ্ণাও কোন আশার কথা শোনাতে পারে না।

গরম বাড়ছে, জেলে দুপুর ও সন্ধ্যায় ভাত আর বাজরার রুটির সঙ্গে আসছে কেবল ভিণ্ডির তরকারি। রান্নার পদ্ধতিটা শিক্ষনীয়। বড় বড় লোহার কড়াইয়ে নুন আর হলুদ দিয়ে ফোটান হয় বাজার থেকে আনা ট্যাঁড়স। ধোয়া-কাটা-বাছার মত কোন বাহুল্য খাটনি করার প্রশ্নই ওঠে না। তাতেই তো জেল পরিদর্শনে আসা কারামন্ত্রীর সুসজ্জিতা সুন্দরী সঙ্গিনী অবাক হয়ে বলেছিলেন,

—এরা তো সব ক্রিমিন্যাল, এদের আবার ডালভাতের সঙ্গে তরকারি দেওয়া হয় কেন?

তো সেই মহিলার মনে দুঃখ দিয়েই তরকারির স্বাদগন্ধেরও একটা ব্যবস্থা হয়। আলাদা করে খানিকটা তেল গরম করে শুকনো লঙ্কা ভেজে ওপর থেকে তরকারিতে ঢেলে দেওয়া হয়। আংটা লাগানো কালো লোহার ড্রামে করে সেই তরকারি ওয়ার্ডগুলোয় পৌঁছয়। ট্যাঁড়সগুলো হয়ত বিশেষভাবে জেলে সাপ্লাই হবার জন্যই তৈরি হত। এক হাত করে লম্বা, বয়সে নিশ্চয়ই সুপারিন্টেন্ডেন্টের সমান। চিবেল ছিবড়ে তো হয়ই, ভালোমত জল দিয়ে ধুয়ে নিলেও ছিবড়ে বেরুতে পারে। সেই ছিবড়ে দিয়ে থালা মাজা যায়। দমদম জেলের ছেলেরা নাকি ওগুলোকে মাটি দিয়ে মেখে গুল তৈরি করে রেখে দেয়। সুযোগ পেলে সেলের ভেতর বাটি করে চা বানিয়ে খায়। শ্রীলতাদের চা পাবার ব্যবস্থা জেলের ডাক্তারবাবু করে দিয়েছিলেন অবশ্য কিছু সময়। তবে অধিকাংশ দিনই চিনি বা দুধ পাওয়া যেত না।

সেই বাহাত্তর সালে বাইরে র‍্যাশন ব্যবস্থার কড়াকড়ি, মাথাপিছু চালের যোগান যতটা তাতে বাচ্চাদের পেটও সবটা ভরবে না। হাসপাতালের দু-চারজন হারামখাউনি সর্দারনী ছাড়া ওয়ার্ডের প্রত্যেকটা মেয়ের চেহারায় সর্বদা খিদেয় থাকার ছাপ, জেলখানার ফিমেল ওয়ার্ডের চেয়ে বেশি সেটাকে দেখায় যেন হাঘরে ভিখিরিদের আস্তানার মত। শ্রীলতাদের নিজেদের অবস্থাও এর খুব একটা ব্যতিক্রম নয়। তবু তারা সমস্ত পীড়ন ব্যবস্থাটার মুখের ওপর হাসতে পারে, নিতান্ত অসহ্য হলে বিশেষত বাচ্চাকোলে মায়েদের খাবার নিয়ে খানিকটা চেঁচামেচি, পাণ্টা ভয় দেখানো এসবও করতে পারে বলে নিজেদের ভেঙে পড়াটা ঠেকিয়ে রাখা যায়। কিন্তু দিন সত্যিই কঠিন।

যখন সরাসরি বিরোধিতা কিংবা অত্যাচার নামে, তখন বরং ব্যাপারটা সহজ থাকে। প্রতিবাদ করবার কাজে নিজেদের সজাগ রাখতে হয়। সেই জীবন্ত থাকার

উত্তেজনায় সমস্ত শক্তি দপ্‌দপ করে উঠত, শিকল যে চেপে বসত তাতেই বোঝা যেত যে ভয় ও ঘৃণার সম্পর্ক দিয়ে তারা খুব বেশি করেই জীবিত রয়েছে শাসকদের কাছে। কিন্তু সে সময়টা চলছিল যেন একটা মরা নদীর মত— স্রোতহীন, তরঙ্গহীন, একঘেয়ে। প্রত্যেকটা দিন ঠিক আগের কিংবা দিনটার মত। প্রতিটা ঘণ্টা অবিকল আরেকটা ঘণ্টার মত। এমনিতেই জেলের ভেতরে সময় মাপা হয় খাবার আসা দিয়ে। সেই খাবারও রোজই আসছিল সকালে কাদামাখা ছোলাসেদ্ধ, কালো ডাল কালো ভিণ্ডি সেদ্ধ এক হাতা ভাত, বিকেলে কালো ডাল কালো ভিণ্ডি সেদ্ধ দুটো নোংরা বাজরার রুটি। রোজ। সপ্তাহের পর সপ্তাহ। পাঁচ ঘণ্টায় দিন না ছত্রিশ ঘণ্টায়, দশদিনে সপ্তাহ নাকি তিন বছরে—হিসেব রাখা সম্ভব ছিল না যেন। প্রাসঙ্গিকতাও ছিল না মনে হত। আর সেই সময়ে তাদের সেলের মধ্যে ভোট্‌কা কালো কম্বল, কাচতে-না-পারা আধনোংরা মোটা জামাকাপড়, ধুলো আর ঝুল ভরা মন-খারাপ-সেলের মধ্যে এক কোণে উপুড় করে রাখা টিনের বাটির মঞ্চে বিছিয়ে দেওয়া একটি রঙিন ব্লাউজের সজ্জার ওপর বসে থাকত সেই হলুদ হাঁস।

পায়ে বাঁধা বিরাট পাথরের মত ছেঁচ্‌ড়ে ছেঁচ্‌ড়ে এপ্রিল মাসও পেরোল শেষে একদিন। ত্রিশে এপ্রিল অনেকরাত্রি পর্যন্ত বসে বসে তিনজনে ভাবল কি করে পরদিন তারা উদ্‌যাপন করবে প্রিয় দিনটাকে। সারা পৃথিবী জুড়ে কোটিকোটি মুক্তমানুষ মালায় পতাকায় গানে উৎসব করবে। কি করবে তারা তিনজন, যাদের একজন আবার মেঝেতে পাতা কম্বলের বিছানা থেকে মাথা তুললেই বমি করছে, রক্ত উঠছে বমির সঙ্গে?

নিজেদের বাঁচিয়ে তুলবার চেষ্টা করতে করতে, উৎসবের আগের রাত্রে গলার, শরীরের সব শক্তি জড়ো করে এনে গান গাইবার চেষ্টা করতে করতে খানিকটা বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল শ্রীলতা। তাকে মাথাও তুলতে না দিয়ে মুখের পাশ থেকে রক্তবমি কাচিয়ে তোলে জোনাকি বাতে অবশ তার ডান হাত দিয়ে। কৃষ্ণা আর জোনাকি মায়ের মত কিংবা মায়ের চেয়েও বেশি, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সাথীকে বুকে জড়িয়ে ধরা ভালোবাসায় জেগে কাটিয়েছিল সমস্ত রাত্রি। স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে শুনিয়েছিল অসংখ্য কবিতা। শেষরাত্রের দিকে ঘুমিয়েছিল শ্রীলতা। তাকে চারহাতে জড়িয়ে ধরে হয়ত ওরা দুজনেও। ওরা ঘুমিয়ে জেগে উঠেছিল, নাকি জেগেই ছিল রাত পার করে সকাল পর্যন্ত—জানেনি শ্রীলতা। সকালে যখন সে চোখ মেলে তাকিয়েছিল কালো চা ভরা টিনের গ্লাস টিনের থালা নিয়ে বসেছিল কৃষ্ণা আর জোনাকি। খবরের কাগজ ছিঁড়ে মালা বানিয়ে থালাটাকে সাজিয়ে মে দিবসের সকালে উৎসবের ভোজের আয়োজন। দেওয়ালে হেলান দিয়ে আধশোয়া করে দিয়েছিল শ্রীলতাকে। আর থালায় কাগজের মালার আধঠাণ্ডা গেলাসের মাঝখানে সাজানো ছিল ভোজের প্রধান উপকরণ দুটি টুকটুকে কুচি পরিমাণ মিষ্টি। চিনির হাঁসের পা।

—রাখলিনা মেরির জন্য?

—দ্যাখ, আমাদেরও তো পা নেই, তাবলে কি আমরা আটকে আছি? হাঁসটাও মনে কর আমাদের বন্ধু। আজ আমাদের ও মিষ্টি খাওয়াল, কিন্তু ও তাতেও থাকতে পারবে।

—তাছাড়া—জোনাকি তাড়াতাড়ি বলে, ওতো মনে কর সাঁতার কাটছে, যখন হাঁসরা সাঁতার কাটে তখন কি ওদের পা দেখা যায়? ওর পা-ও মনে করনা জলের মধ্যে আছে—

আর তিনজনই হেসে উঠেছিল।

সেই হাঁসটাই পঁচিশ বছরে রং খুইয়ে সাদা হয়ে, ভালোবাসার নদী পাড়ি দিয়ে এল নাকি?

—কোথায় গেলে গো? কি করছ ওখানে একা একা? শুভময় বসার ঘর থেকে ডাক দেয়।

শ্রীলতা ওঠে, হাঁসটা হাতে করে শুভময়ের দিকে যেতে গিয়ে ছেলেমেয়ের ঘরের দিকে তাকায়। দেখে বল্লী কখন উঠে ভাইয়ের কাছে এসে বসেছে। দুজনে কী একটা করছে কম্পিউটারের স্ক্রীনের ওপর ঝুঁকে পড়ে। আগুন কখনো শিখা তুলে জ্বলে, কখনো ছাই চাপা, কিন্তু আগুন থাকে। আগুন তো মাটিতে জমে থাকা সূর্যতাপ, সে কি হারায়?

কালধ্বনি

দিনগুলি

সরস্বতী পুজোর দিন কে জানে কেন ছোটবেলার চেয়েও বেশি করে মনে পড়ে বড়োবেলারই কথা। দুর্গাপুজোর চেয়ে সরস্বতী পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে পড়বার স্মৃতি তো অনেক বেশি। একেবারে ছেলেবেলায় মায়ের কথা না শুনে মাঘমাসের শীতে কাঁপতে কাঁপতে ঠাণ্ডা জলে স্নান করা, তারপর গরম জামা গায়ে না দিয়েই বাসন্তী রঙের শাড়ি পরে মণ্ডপের দিকে দৌড়, কেন যেন ধারণা ছিল কৃচ্ছ্র সাধন করলেই বেশি প্রসন্নতা পাওয়া যাবে বিদ্যার দেবীর, যিনি নিজে শাদা পোষাক পরে থাকেন। অতো ছোটবেলা আর কীই বা কৃচ্ছ্র সাধন জানে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডাজলে স্নান করা আর খালি পা ছাড়া! তারপর কলেজ। সমস্ত রাত্রি জেগে আলপনা দেওয়া, প্রতিমা সাজানো দেখে ভগবান মানিনা বলায় বন্ধুরা বিশ্বাস করেনি। কে যেন বলেছিল অতোই যদি না মানার সাহস পা দে দেখি ঠাকুরের গায়ে! অমন মূর্তিতে পা দেব কেন! বলে সেই শেষরাত্রির হিমবাতাসে পাদপীঠে উঠে ঠাণ্ডা লাল টুকটুকে মাটির ঠোঁট দুটিতে ঠোঁট ছুঁইয়ে চুমু খেয়েছিলাম। বলতে গেলে সেই প্রথম চুম্বন।

তারপর সেই সব শখের দিনও গেল।

তবু প্রতিবছর সরস্বতী পুজোর দিনে সেসব দিনের কথা বেশি মনে পড়ে না। মনে পড়ে বাবাকে। সাহেবিয়ানা আর স্বদেশিয়ানার এক অদ্ভুত মিশ্রণ ছিল বাবার মধ্যে। সাহেবি স্বদেশিয়ানা। এদিকে এটিকেট ম্যানার্সে শিক্ষায়—একেবারে ব্রিটিশপন্থী। খাবার টেবিলে কারও চিবোনর এতটুকু আওয়াজ হলে, প্লেটেচামচে শব্দ হলে মুখ লাল। বাড়িতে অবসরে পরে থাকা পোষাকের ছাঁট পর্যন্ত ব্রিটিশ। ঠোঁটে সর্বক্ষণ জ্বলন্ত সিগারের আঁচে মিলিটারি মার্কা মোটা শাদা গোঁফের বাঁ দিকের অংশটা পাটকিলে। এক মিনিটও খালিপায়ে থাকতেন না। বাড়ির বৌদের কারও মাথায় কাপড় দেবার বিধি ছিল না। ওদিকে আবার কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে যাবেন না ধুতি পাঞ্জাবি ছাড়া। মা কাকিমাদের পায়ে আলতা পরা পছন্দ। কারো নাম বলবার সময়ে আগে 'শ্রী' বলতে ভুলে গেলেই মুখ লাল। সেই বাবাকে দেখতাম সরস্বতী পুজোর দিন সকালে খালি গায়ে ধুতি পরে ঠাকুরের সামনে একধারে একটি আসনে একেবারে পিঠ টান করে বীরাসনে বসা। ঘিয়ে রঙের পিঠ থেকে আলো যেন ঠিকরে পড়ছে। নিজে না খেয়ে থেকে অঞ্জলি দিতেন কোন সকালে। মন্ত্র বলতেন স্পষ্ট শুদ্ধ উচ্চারণে। তারপর ওই বসে থাকা যতক্ষণ না বাড়ির, পাড়ার—সকলের অঞ্জলি দেওয়ানো শেষ করে ঠাকুরমশাই নিজের আসন ছাড়েন। তার আগে ছিল ইলিশ

মাছের বরণ। একজোড়া ইলিশমাছ আসত, কাঁসার বড় থালায় রাখা হত তাদের। রান্নাঘরের ব্যস্ততা থেকে বেরিয়ে এসে মা তেল হলুদ সিঁদুর দিয়ে বরণ করতেন। এই অনুষ্ঠানটুকু দেখতে ভারি ভালোবাসতাম আমরা যদিও ভেবে পেতাম না, সরস্বতীর অর্চনা আর ইলিশ মাছ খাওয়া—দুটোর মধ্যে সম্পর্কটা কি। বিশেষ করে যখন জানতাম যে কোন কোন বছর এই আত্মীয়বান্ধব সবাই মিলে ইলিশমাছ খাওয়ার খরচে সংসারে কিছু ধারও হয়ে যেত।

বিয়ের পর যেখানে এলাম সরস্বতী পুজোর দিনটা সেখানে সেভাবে গ্রাহ্যই হত না বলা যায়। মাঘ পঞ্চমীর দিনটা আমার শ্বশুরবাড়িতে ছিল প্রধানত রান্না করবার দিন। ওঁদের উৎসব ছিল পরদিন—শীতলষষ্ঠি। বাড়িতে পুজো হবার প্রশ্ন ছিল না, মেয়ে বৌরা সরস্বতী ঠাকুরের কথা চিন্তাও করত না। করবার প্রশ্ন উঠত না। এমন নয় যে ঠাকুরদেবতা মানত না কেউ কিংবা লেখাপড়ার চল ছিল না। একেবারেই নয়। এই সংসার ছিল অনেকবেশি ফরমাল। বিধিমত স্নান করে সকালবেলা না খেয়ে পাড়ার মণ্ডপে গিয়ে অঞ্জলি দিয়ে আসত সবাই। শাশুড়িও যেতেন একবার। কিন্তু দেবদেবীদের সঙ্গে হৃদয় ঘটিত ব্যাপার কিছু ছিল না। দেবতাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্পষ্টই ভক্তির, আচারনিয়ম পালনের। আহ্লাদেপনা ঘরগেরস্থালি করবার নয়। এ বাড়িতে ভগবান মানতেন না একমাত্র আমার শ্বশুর। কেবল মানতেন না বললে কম বলা হয়, বিরোধিতা করতেন।

একবার আমার স্বামীর খুব অসুখ করে। ব্রঙ্কিয়াল এ্যাজমা আর টাইফয়েড একসঙ্গে বিছানায় ফেলে দিয়েছিল লোকটিকে। নিঃশ্বাসের কষ্টে জেগে থাকত সমস্তরাত। ডাক্তার মুখ এমন গম্ভীর করে রাখতেন যে আমার প্রাণ শুকিয়ে উঠত ভয়ে। খুড়শাশুড়ি আমাকে বললেন—শনিবার আর মঙ্গলবার উপোস করে থাকতে। এমনকি ও সেরে উঠবার পরও এই নিয়ম পালন করতে । আমি ভগবান মানি না, কিন্তু ওঁর মনে দুঃখ দিতে ইচ্ছে হয়নি। বিশেষত যখন বুঝতে পারছিলাম এই 'পালনে'র পেছনে আমার শাশুড়িরও সায় আছে। বাবা কিন্তু জানতে পেরে খুব রেগে উঠলেন,

উপোস করবে কেন? ভগবান কি বলেছেন তুমি না খেয়ে থাকো, তোমার খাবারটা আমি খাবো? তাই খুশি হবেন?

শাশুড়ি-মা একবার বলার চেষ্টা করলেন,

স্বামী-সন্তানের বিপদে মেয়েরা—

বাবা একেবারে কোন কথা শুনলেন না। বললেন,

বিপদে মেয়েরা মাথা স্থির রাখবে, ঠিকমত পথ্য দেবে রুগীকে। উপোস করতে যাবে কেন? ও যথেষ্ট লেখাপড়া জানে, দরকার হলে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলবে, দরকার হলে ডাক্তার পালটানো হবে। এতজন আছি, সকলে যত্ন নিচ্ছে চেষ্টা করছে তাতে অসুখ কমবে না আর কমবে কি না বৌ উপোস করে

থাকলে।

সুতরাং উপোসের সে যাত্রা সেইখানেই সমাপ্তি।

আমাদের বাড়িতে যেমন কারো মাথাতেই ঘোমটার বালাই নেই, এ বাড়িতে ঠিক উল্টো। বাবার ছায়া পর্যন্ত দেখতে পেলে কাকিমা চিবুকের নিচ পর্যন্ত ঘোমটা দিয়ে থামের পিছনে কিংবা কপাটের ভিতর অদৃশ্য।

উপোসের ব্যাপারে এতটা রাগ করলেও এই মানুষটি কিন্তু পুজোপালার অন্য কোন ব্যাপারে কাউকে কখনো বাধা দিতেন না। শাশুড়ি-মা প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন বলে সংসার সামলাত তাঁর দুই মেয়ে। যখন তিনি সুস্থ থাকতেন, তখনকার ব্রতপুজোর দিনগুলোয় রাণী মিনু তারপরের দিকে আমিও তটস্থ হয়ে থাকতাম—পাছে নিয়মভেঙে কিছু ছুঁয়ে ফেলি সেই ভয়ে। জয়মঙ্গলবার বিপত্তারিণী নীল-আরও কি কি সব চলতেই থাকত। পুজো মানেই তো লুচি মিষ্টি এটা সেটা। বাবাকে দেখতাম বাজার করবার ব্যাপারে ক্লান্তিহীন।

অবশ্য সেটা কেবল পুজোপালার নয়, বাবার রোজকার বাজার করাটাও ছিল দেখবার মত। সকালে মোটামুটি তাড়াতাড়ি এককাপ চা খেয়ে লম্বা একহারা শ্যামল চেহারার মানুষটি দুটো থলি হাতে করে চলে যেতেন বাজারে। আমার শ্বশুরবাড়ির খুব কাছেই মস্তবড়ো বাজার বসত মাছ তরকারির। একটা থলিতে কিছুটা মাছ আর কোন একটা মোটা তরকারি কিংবা কিছুটা টাটকা শাক নিয়ে ফিরে আসতেন। রান্নাঘরের সামনে মোড়ায় বসে এককাপ চা খেতে খেতে মাকে একটা পুরো ফর্দ শোনাতেন তখন পর্যন্ত বাজারে কি কি এসেছে তার। মা কালেভদ্রে তার কোন উত্তর করতেন। বাবা নিজেই ফর্দ থেকে নানা জিনিসের নাম বেছে বেছে জিজ্ঞেস করতে থাকতেন,

বেগুনের সঙ্গে তাহলে একটু কুমড়োও নিয়ে নিই, না কি বল? আর বুঝলে মটরশাকও উঠেছে চমৎকার, একটু তোমার সেই ডালের চাপটা দিয়ে রাঁধবে নাকি? শাশুড়ি-মা এদিকে মোটেই না ফিরে হয়ত বলবেন,

এক খানিকটা পালং এনেছ আবার মটরশাক—কে বাছবে শুনি।

ও, মেয়েদের আবার কলেজ আছে, না। আচ্ছা থাক তাহলে। কটা বেলেমাছ নিয়ে আসি বরং

আবার বাজারে চলে যাবেন। ফিরবেন।

খানিকটা ওল আর উচ্ছেও আনলাম, বুঝলে? সুরেন সেদিন বলছিল ওল খেলে নাকি ব্লাড প্রেশার কমে। আর উচ্ছে তো সুগারের মহৌষধ জানই। এবার থেকে সকালে আর চা নয়, বুঝলে? দুজনে বসে উচ্ছের রস আর ওল ভাতে খাব।

এহেন রসিকতায়, জানা কথাই, মা বেশ বিরক্ত হবেন। দুজনেই চা খেতে ভালোবাসেন আর মা কিছুতেই উচ্ছে খাবেন না। এরকম বার তিনেক একটু একটু করে বাজার শেষ করবার পরই সোয়া নটায় বাবা স্নান করতে যাবেন আর মা আমার ছোট ননদকে ডেকে বললেন শিগ্‌গির করে স্টোভ ধরিয়ে দিতে। ভাতটা সেখানে ফুটতে বসিয়ে এবার উনুনে নতুন করে কয়লা দিয়ে প্রাণপণ বাতাস হবে। সেটা প্রায় নিভে এসেছে।

এটাই রোজকার ব্যাপার। কিন্তু যথেষ্ট আগুন থাকতে এই কয়লাটা কিছুতে দেবেন না আমার শাশুড়ি-মা। প্রথম দিকে ভাবতাম উনি খেয়াল করতে পারেন না।

মা, উনুনের আঁচ কমে যাচ্ছে, একটু কয়লা দেব?

না—বেশ আঁচ আছে। এখন কয়লা দিলে আর ভাত ফুটবে না। তোমার শ্বশুরের দেরি হয়ে যাবে।

দু চারদিনে বুঝতে পেরেছি মায়ের কাজের একটা নিজস্ব ধরন আছে, সেটা পাল্টানোর চিন্তা মা পছন্দ করেন না। ফলে ওঁর হাতের ব্যঞ্জনগুলির স্বাদ একই রকম পাকা থাকে, ফলে খেতে বসবার মুহূর্তে আঁচ কমে যাওয়ায় ভাতের সঙ্গে কেবল মাছেব ঝোল আর আলু কিংবা ওল ভাতে দিয়ে খেয়ে বাবা অফিস চলে যান। মটর, ও পালং শাক, বেগুন ও টমেটো, কুমড়োফুল আর ঝিঙে উঠোনের একপাশে ঝুড়িতে পড়ে থাকে। ফলে এ বাড়িতে কখনো হাল্কা মাছের ঝোল হয় না, পেঁয়াজ দিয়ে কালিয়া কিংবা টমেটো সর্ষেবাটা দিয়ে টক। আমার মাকে কাজ করতে দেখেছি নিঃশব্দে। সকাল সাতটায় হোস্টেলে যাবার জন্য ট্রেন ধরতে গেলেও মাছের ঝোল ভাত কিংবা ডাল তরকারি ভাত খেয়ে যেতে হবে। বিরক্ত হব, এত সকালে ভাত খাওয়া যায় না বলে চেঁচামেচি করব কিন্তু খেতে হবেই।

দুজনে এত আলাদা। দুটো পরিবারের ধাঁচ-ধারা এত আলাদা রকম। মাঝে পড়ে প্রতিপদে ঠোকর খেতে থাকি। মাঝে মাঝে দিশেহারা লাগে, মাঝে মাঝে রাগ হয়। আগেকার দিনের মত তো আর ছোট মেয়েরা আসে না বৌ হয়ে, যে প্রত্যেক কথায় তাকে এটা করো ওটা কোরনা বলতে হবে। দিনকাল তো পাল্টায়ই। আমার শাশুড়ির বাপের বাড়ি ভবানীপুরে। সম্পন্ন ঘরের মেয়ে। চুয়ান্ন বছর আগে মেয়ের বিয়ে দেবার সময়ে গ্রাম-শহর এসব কেউ ভাবতনা বোধহয়। জমিজমা আছে, ঘরদুয়োর আছে, ছেলের স্বভাবচরিত্র খুব ভালো, ব্যস্। সতের বছর পর্যন্ত যে মেয়েটি চটি পায়ে দিয়ে কুঁচি দিয়ে শাড়ি পরে ভবানীপুরের রাস্তাঘাটে চলা ফেরা করেছে, সে বিয়ে হয়ে এসে পায়ে আলতা পরে উঠোনে গোবর ছড়া দেবে কি করে, কি করে গলা পর্যন্ত ঘোমটা দিয়ে রান্নাঘরে আর ভাঁড়ার ঘরে আটকা থাকবে যতক্ষণ না স্বামী শ্বশুর দেওর অফিস সেরেস্তা চলে যান, তারপর সংসারের উঠোন বারান্দা ঘর দোর—এই চালে অভ্যস্ত হবে এগুলো কোন ভাবনার বিষয়ই ছিল না। মায়ের শাশুড়ি নাকি আবার খুব রাগী ছিলেন। অদ্ভুত স্বভাবেরও ছিলেন। আমার শ্বশুর

বড়ছেলে ভালোমানুষ, মাইনে অন্য ভাইদের থেকে কম পেতেন, ভাইদের পড়াশুনো করিয়েছেন, মাথার ওপর বাবা নেই সেই দায়িত্ববোধ ছিল তাই খুব কম বয়েস থেকে চাকরি করছেন। পরে সেইসব ছোটভাইয়েরা যখন একে একে চাকরি পেয়েছেন ততদিনে আমার শ্বশুরের চার ছেলেমেয়ে। তো, তাঁর মা নাকি বৌদের শুধু নয়, নিজের ছেলেদের এমনকি নাতি নাতনিদেরও সেই রকম হিসেব করে ভালোবাসতেন। পাঁচভাই একসঙ্গে খেতে বসলে মাইনে হিসেবে ভালো কিংবা নীরেস মাছ তরকারি দুধের বাটি দিতেন । মায়ের কাছে সেসব কথা শুনে আমি হাঁ করে থাকি,

তবে যে তোমরা বলো একালের সব খারাপ আর তোমাদের কালের নাকি সবই ভালো ছিল!

আমার দেওর বলে

হ্যাঁ জানো না, বাবাদের ছোটবেলায় একটাকায় আটটা সাইকেল বিক্রি হত আর একটা ফাউ দিত—

দিদিশাশুড়ি অবশ্য মারা গিয়েছেন বহুকাল আগে। তাঁর ছেলেরাও বৃদ্ধ হয়েছেন এখন। সকলে আলাদা আলাদা বাড়ি করেছেন। তবে একই পাড়ার মধ্যে। ফলে অর্ধেকটা পাড়াই আমার শ্বশুরবাড়ি। তাতে আমার চেয়ে আমার ননদদের কষ্ট বেশি। দুজনেরই নিজের নিজের মত 'বন্ধু' আছে কিন্তু রাস্তায় তাদের সঙ্গে বেরোলে কোন না কোন কাকা কিংবা খুড়তুতো ভাইয়ের চোখে পড়বেই। সেসব নিয়ে খুব অশান্তি, মিছে কথা বলাবলি। এই সংসারে বিধি মেনে চলাটাই নিয়ম। কাকিমা, মানে আমার খুড়শাশুড়িরা কেউ কখনো হয়ত কোন কাজে কিংবা নেহাৎ গল্প করতেও, এসেছেন মায়ের কাছে-বাবা বাড়িতে ঢুকলেই দেখি ঝপ্ করে একগলা ঘোমটা। জ্যাঠামশাই এলে আমার শাশুড়িও তাই। সেইখান থেকে ফিসফিস করে মেয়েদের বলবেন,

জিজ্ঞেস কর চা খাবেন কি না—

এখনও পর্যন্ত যে এইসব নিয়ম কোথাও চালু থাকতে পারে ভাবা যায় না। মাঝে মাঝে মনে হয় আমার বাবার সঙ্গে আমার শ্বশুরের যেন কেমন একটা মিল আছে-দুজনেই ছফুটের বেশি লম্বা, ছিপছিপে টানা চেহারা দুজনের মধ্যেই একধরনের স্নেহময় নম্রতা আছে। যদিও বাকিটুকু প্রবাসী জাঁদরেল ডাক্তারের সঙ্গে বিধিসম্মত বাঙালি গৃহস্থালীর গৃহকর্তার অমিল। তবু আমার মনে হত ওই স্নেহপ্রবণতা, স্বাভাবিক উদার কুসংস্কার বিহীনতা, ওরকম বিধিনিয়মের সংসারের কর্তা হয়েও আমার শ্বশুর জাত মানতেন না, এসব জায়গায় দুজনের প্রকৃতিগত কিছু একটা মিল ছিল যেন। কিন্তু বরাবর দেখেছি মেয়েদের ব্যাপারে আমার বাবা খুব সতর্ক সচেতন, হয়ত এটিকেট সতর্ক বলেও কিছুটা, শ্বশুরকে কিন্তু এটা নিয়ে কখনো কোন কথা বলতেই দেখিনি—সে ঘোমটা দেওয়াই হোক আর মেয়েদের পড়াশোনা ছেড়ে ঘরের কাজ

করাই হোক।

তবে দুজনেই খুব ভালোবাসতেন লোকজন খাওয়াতে। বাবার তো সরস্বতীপুজো দুর্গাপুজো দোলের মালপোয়ার ব্যবস্থা করা ছিলই, এ বাড়িতে ছিল শাশুড়ি মায়ের বিপত্তারিণী, ওটা সেটা মানত শোধ। আসল উৎসব ছিল শীতলষষ্ঠী। সরস্বতী পুজোর দিনটা কেবল মাছকোটা পর্বতপ্রমাণ তরকারি কোটা আর রান্না রান্না। সরস্বতীকে ভালো করে দেখা তো দূরস্থান মাথাতুলে আকাশের রঙের দিকে তাকাবারও সময় হয়না। বাবা কেবল বাজার যাচ্ছেন আর ফিরে এসে জিজ্ঞেস করছেন,

দ্যাখো তো বৌমা, ষোল কিলো বাঁধাকপি কিনলাম, কম পড়বে নাকি মা?

কাঠের থালা ভরে বেছে রাখা সজনেফুল, টুকরো টুকরো কাটা বেগুন। এত পরিমাণ লাল পাকা টোপাকুল। টমেটো খেজুর। আর মাছ। সারাটা দিন ধরে আত্মীয় বন্ধু কুটুম যে যেখানে আছে সবাই সবার বাড়িতে মাছ পাঠাতে থাকবে। এটাই নাকি নিয়ম। যেমন নিয়ম সজনে ফুল। নিয়ম গোটা কলাই বেগুন মটরশুঁটি মুলো আরও কি কি সব তরকারি একসঙ্গে সেদ্ধ করা। কোনটাই কাটা চলবে না। সব নিয়ম ঠিকঠাক যেন বজায় থাকে সে ব্যাপারে শাশুড়ি মায়ের যতো দুশ্চিন্তা আমাদের তা নয়। আমরা তিনজন হলাম গিয়ে খাটিয়ে মিস্তিরি, যা বলা হয় করি।

নিয়মের মধ্যেকার ভয়টা গিয়েছে খসে। তাই নিয়মের জোরও নেই তেমন। সব নিয়মই হাতে হাতে যেভাবে পাল্টায় আর কি!

একবছর শাশুড়িমায়ের ভাইঝির বিয়ে না এরকম যেন একটা কি ছিল। মায়েদের পাঁচবোনের একমাত্র ভাই, তাঁর আবার একমাত্র মেয়ে। সুতরাং মা চলে গিয়েছেন কলকাতা। সংসারের 'কর্তা', বলতে আমরা তিনজন—দুই ননদ আর আমি। বড় ননদই সব নিয়মটিয়ম ভালো করে জানে। তাছাড়া মা যাবার আগে একসপ্তাহ ধরে দুই মেয়েকে পাখিপড়া করিয়ে গিয়েছেন।

—কিন্তু এবারে আমরা সরস্বতী পুজোর দিন বেরোবই দুই ননদকে আশ্বাস দিয়ে রেখেছি।

কিছুতেই হবে না দেখো! রান্নাই শেষ হবে না!

কেন হবে না? উনুনের আঁচ ঠিক রেখে খুব মন দিয়ে করে নেব, দেখো ঠিক হয়ে যাবে।

জানো বৌদি, সব বন্ধুরা সরস্বতী পুজোর দিন সন্ধ্যেবেলা বেরোয় একসঙ্গে—ও তো বলে তোমার বাড়িটাই একটা অদ্ভুত।

এতোবড় দুঃখের নিরসন না করলে কি চলে! বাবাকে নিয়ে বিশেষ চিন্তা নেই, বাবা সন্ধ্যেবেলা দাবা খেলতে চলে যান, ফিরতে রাত্রি সাড়ে দশটা। বোনেদের ভয় বাবার চেয়ে ছোটভাইকে। সে মায়ের দুলাল, ছোট থেকে জানে বাড়িতে দিদিদের চেয়ে তার আর দাদার মূল্য অনেক বেশি। বাড়ির কাজকর্ম বলতে যা কিছু তা সবই দিদিরা করে, দুজনেই লেখাপড়ায় তার চেয়ে অনেক ভালো কিন্তু সে কিনা একটা

পুরুষমানুষ! তার দাদা নিজের 'অধিকার' প্রয়োগ করুক কি না করুক, সংসারের মানসম্মানের ব্যাপারে দিদিদের সে রীতিমত শাসন করে। দুই দিদি সেটা মুখ বুজে সহ্য করে কেন না প্রতিবাদ করতে গেলে মা ধমক দিয়ে উঠবেন। কিন্তু সেই ভাইটিও সরস্বতী পুজোর দিন ব্যস্ত থাকবে নিজের ক্লাবের পুজো, ডেকোরেশান-নিয়ে।

সুতারাং সারাদিন খুব মন দিয়ে কাজ করেছি আমরা, ভোর থেকে উঠে স্নান করে লেগে পড়েছি রান্নাঘরে। বাবা আর তাঁর দুই ছেলে জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে গেলে বোনেরা গিয়ে অঞ্জলি দিয়ে এসেছে, পাড়া পুজোমণ্ডপে। ওই অঞ্জলির আনুষ্ঠানিকতায় আমার বিশাস নেই কোন, আমার নিজের মনে মনে এক সরস্বতী আছেন, সেই আমার ছোটবেলায় দেখা একটি পা নিচে ঝুলিয়ে ডান পা নিজের বাঁ কোলের ওপরে ভাঁজ করে রাখা 'কুন্দেন্দু ধবলা শুভ্রা' তাঁর সঙ্গে আমার মনেমনে কথা বলাবলি। অভিমান করে তাঁকেই বলেছি এই রান্নাঘরের বিপুল জেলখানা থেকে বেরিয়ে একটু অবসর নিয়ে তোমার মুখের দিকে যখন তাকিয়ে দেখতে দেবে তখন আমি অঞ্জলি দেব তোমাকে। সরস্বতীপুজোর দিন সকাল থেকে আমার গলার নিচে ব্যথা করে।

তবু সব শেষ হল। সাড়ে চারটেয় উনুন নিভিয়ে, রান্নাবান্না ঢাকা দিয়ে ওদের দুই বোনকে সাজগোজ করে নিতে বললাম। আমার মানুষটি আগেই জানে আমাদের অভিযানের কথা। সে থাকবে পাড়ার মোড়ে কোথাও, আমরা সদর দরজার চাবি তাকে দিয়ে বেরিয়ে যাব। সারা দিন ধরে এত মাছ কোটা হয়েছে আর রান্না হয়েছে যে আমি একবার স্নান করলাম। গা দিয়ে মৎস্যকন্যার মত গন্ধ বেরোচ্ছিল। দু বোনের খুশির সীমা নেই। ফ্রক ছাড়বার পর, মানে ক্লাস নাইনের পর আর কোন দিন এরকমটি ঘটেনি। সন্ধ্যেবেলা ঠাকুর দেখতে বেরোন। আর শুধু নিজেরা বেরোন? কোন গার্জেন ছাড়া? প্রশ্নই ওঠেনি কোনদিন।

সদরদরজা টেনে তালা লাগাচ্ছি কড়ায়, ধুতি আর শার্ট পরা একজন লোক এসে দাঁড়াল,

সামন্তবাবুর বাড়ি থেকে এই মাছ পাঠিয়েছে। পুকুরে জাল দিইয়েছি, তাই দেরি হল পাঠাতে।

বলেছিলাম না—কিছুতেই হবে না বেরোন—দু বোনের মুখে কালি ঢেলে দিল চক্‌চকে মাছে ভরা থলিখানা। নমস্কার জানিয়ে লোকটি চলে যাওয়ার মুহূর্তের মধ্যে উপায় ভেবে ফেলেছি আমি। প্রথমে ভয় পেলে, অরাজি হলেও অন্য আগ্রহে শেষ অবধি মেনে নিল মিনু।

আমরা দুজনে দাঁড়িয়ে রইলাম গলির মধ্যে, মিনু গিয়ে সেজকাকিমার দরজায় কড়ানাড়ল। সেজকাকিমার সব কটি ছেলে, কাজেই এই সন্ধ্যার মুখে তাঁর বাড়িও ফাঁকা। কাকিমা নিজেই দরজা খুললেন। মিনু সটান থলিটা ধরিয়ে দিল তাঁর হাতে।

মুখস্ত বলে গেল,

কাকিমা, বাবা বললেন এটা দিয়ে আসতে। বাবার বন্ধুদের পুকুরের মাছ।

এরপর আর প্রশ্ন ওঠে না। এটা নিশ্চিত যে কাকিমা কোনদিন বাবাকে মনের আনন্দ বা কৃতজ্ঞতা জানাতে যাবেন না। মা ফিরবেন অন্তত একমাস পর।

প্রায় দু ঘণ্টা ধরে ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখা হয়েছিল সেবার পাঁচ জন মিলে।

এরকমই সুন্দর করে তো চলে জীবন। ছোটছোট সুখ ছোট দুঃখ একটুখানি মজা, যেমন ছোট ছোট ঢেউ তুলে যায় বিরাট এক নদী। যতক্ষণ না হঠাৎ বেধে ওঠে যুদ্ধ। অর্থহীন, ভয়ঙ্কর। আর ভেঙে তছনছ করে দেয় সাধারণ মানুষের সেই জীবনকে, কেননা পৃথিবীতে কয়েকজন ক্ষমতাশালী লোক অস্ত্রের ব্যবসা করে।

বিনোদন বিচিত্রা

খেয়া

ঘুম ভেঙে গিয়েও খানিকক্ষণ চোখ মেলেন না সাগরময়ী। ঘুমের যে কখন শেষ কখন পুরোপুরি জেগে ওঠা শুরু চোখ বন্ধ রেখেই আজকাল সেটা যেন একটু একটু করে বুঝতে পারেন। চোখ মেললেই বা কি! চারপাশেই তো অন্ধকার এখনও। মশারির বাইরে বাঁ হাতে খোলা জানালার নিচে বড় বাতাবি লেবুর গাছটায় ফুলের গন্ধ ইদানীং কমে এসেছে। ফুল ঝরে গিয়ে জালি পড়তে শুরু করেছে বোধহয়। অন্ধকারেরও তো রকমফের আছে। এখন আর রাত্তিরের অন্ধকার নয়, ঘুম ভেঙেছে মানেই রাত ফুরিয়ে এসেছে। গাছে গাছে এবার পাখিদের জেগে ওঠার সময় হবে। সেই যে ডাকয়ে পাখি না ছাড়ে বাসা, খনা বলেন সে হল ঊষা, এখন সেই ঊষা আসবার সময়। অন্যদিনে এ সময়ে অন্ধকারের ভিতর দিয়েই রাত্রিশেষের হালকা বাতাসের স্রোত বয়। আজ যেন একটু দমচাপা লাগছে। এখন কি আর শুয়ে থাকার সময়! গোপালকে জাগরণ দিতে হত, শয়ন তুলে নতুন পোশাক পরানো, চন্দন দেওয়া, তারও আগে নিজের স্নান। উঠোনের অন্ধকারে সাদা শাড়িটা মেলে দিলেই যেন অন্ধকার একটু কম হয়ে যেত। তারপর সেই অন্ধকারের ভিতর থেকে টুলটুল করে তাকিয়ে থাকা ফুলের কলিগুলি, টগর গন্ধরাজ গাছের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা আঁকাশির ডগায় চাঁপা, গুলঞ্চ। আর একটু পরে ভোরের প্রথম আভাটুকু গায়ে মেখে নিয়ে ফুটে উঠবে স্থলপদ্ম, বাগানের পুবদিকের গাছটি থেকেই যেন আলো ছড়িয়ে পড়বে উঠোন জুড়ে, আর শরতের মেঘ উড়ান নিতে না নিতে ফুটতে শুরু করত শিউলি, অঘ্রাণের শেষপর্যন্ত। আহা, সেই গন্ধের যে টান! মাটির দিকে। অন্ধকারের মধ্যে গাছের তলায় বিছিয়ে থাকত রাশি রাশি ফুল, সেইসব ফুল দিয়ে আসন সাজাতে চন্দন ঘষতে গুনগুন গান গাওয়া, গোপালকেই তো জাগানো সাজানো। তারই মধ্যে কখন আলো ফুটতে শুরু করত। আর বিছানা ছেড়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে তামার ঘটিতে রাখা এক ঘটি জল ঢক্‌ঢক্‌ করে খেয়ে সেই মানুষটি উঠোনে পুবমুখো হয়ে বসতেন। একটি নিচু জলচৌকির ওপর আসন-পিঁড়ি, হাতের তানপুরোটি একবার-দুবার সুর ছাড়ত আর কী ভরাট গলা! অবাক হয়ে আড়চোখে মানুষটার দিকে দেখতে দেখতে এক-একদিন সাগরময়ীর মনে হয়েছে ওই বুকের ভিতর থেকে ওঠা গম্‌গমে আওয়াজের ধ্বনি ধরেই যেন সূর্য উঠে এল। কোনদিন কি বলেছেন সেকথা! ভয়ে মাটিতে মিশে থাকতেন না নিজের থেকে সাতাশ বছরের বড় স্বামীর সামনে? দশটায় ভাত খেয়ে তিনি অফিস চলে গেলে তবে যেন বাড়িতে

একটু খোলামেলা হতে পারতেন সাগরময়ী।

আজ কেন এখনও অন্ধকার একটুও হালকা হল না? তবে কি সত্যি এখনও মাঝরাত্রি? যেন অনুভব করেন জলতেষ্টা পেয়েছে তাঁর। একটু দূরের খাটে ছেলে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু তাকে কি ডাকা যায়? যাক্, একটু পরে হয়ত নিজেই জেগে উঠবে। এই হাত পা শরীর সব এমন অচল হল, কে বা জানত এমন হবে! যাদের বৌ করে ঘরে এনেছিলেন, তাদের কোলে যারা জন্ম নিয়েছিল তারা কতজন চলে গেল চিরকালের মত। কতজন এতদূরে চলে গেছে যে তারাও যেন চিরকালের মত— ষাট্ ষাট্ কি কথা ভাবলেন, যে যেখানে আছে ভালো থাক, দীর্ঘায়ু হোক। শুধু তিনিই কেন যেতে পারেন না। আর কতদিন এই পারের কিনারায় বসে অন্যদের চলে যেতে দেখবেন। নড়াচড়া করার ক্ষমতা, দুচোখ মেলে চেয়ে দেখার ক্ষমতা, তাও যে গোপাল নিয়ে নিল—তবে গোপাল তাঁকে কেন নেয় না? তিনি যে আর একা থাকতে পারেন না একথা কাকে-বা বলবেন। কতবার কত শিশুর মুখে গোপাল এসে দেখা দিয়েছে, তাঁর কোলে খেলা করেছে। কত মানুষজন কত কাজ ছিল সংসারময়। সাতাশ বছরের বড় স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হয়ে তিনি সংসারে এসেছিলেন, চোদ্দ বছর বয়সে। তাতেই তাঁর বাবাকে আত্মীয় পরিজন কতো গঞ্জনা দিত।

—এত বড় পাহাড়ের মত মেয়ে বুকের উপর বসা, দু'বেলা গলা দিয়ে ভাত নামে ক্যামনে? বাবার বড় আদরের মেয়ে ছিলেন সাগর। একটি মাত্র মেয়ে, অনেকগুলি ছেলের পিঠে। লোকে বলত, অমুকের মাইয়ারে মাথায় রাখলে উকুনে খায়, মাটিতে রাখলে পিপড়ায় খায়। কোন্ শাশুড়ি জানি কপালে নাচতে আছে।

না, শাশুড়ি ননদের ভরা সংসার পাননি তিনি। একটা কাজ যে শিখিয়ে দেবে, সাহায্য হবে তেমন কেউ ছিল না। হাতে গরম ফ্যান পড়ে গেলে, নোড়ায় আঙুল ছেঁচে গেলে 'আহা' করার একটি মানুষ অবশ্য ছিলেন কিন্তু তিনি নিজেই প্রায় অশক্ত শোকে আর বয়সে জীর্ণ এও সত্যি, অপমান-নির্যাতনও কখনও সহ্য করতে হয়নি তাঁকে সে সংসারে। স্বামী বড় শান্ত মানুষ ছিলেন। সংসারটি শান্ত ছিল। মনে কষ্ট কি পাননি? মনের কষ্ট ছাড়া নারীজন্ম কবে যায়? জলের দেশের মেয়ে তিনি, বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে আসবার সময় নৌকায় বসেই জিজ্ঞেস করেছিলেন, খোকার নাম কি?

আগেই জেনেছিলেন অন্যের ফেলে যাওয়া সংসারে ঢুকতে যাচ্ছেন তিনি। কচি ছেলে রেখে স্ত্রী মারা যেতে সেই সতী সুভাগার ছেলের দায়িত্ব নেবার জন্য দ্বিতীয়বার বিয়ে করছেন মানুষটি। একবার প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে ভেবেছিলেন নদীর শব্দে, দাঁড়ের শব্দে শুনতে পাননি স্বামী। দ্বিতীয়বার জিগেস করতে শুনেছিলেন—খোকা না, খোকারা। তিন ছেলে এক মেয়ে তোমার। চমকে ওঠেনি বুকের ভিতর? কষ্ট হয়নি খুব? জানতেন না ঠিক কিসের কষ্ট, কিন্তু তবু মনে হয়েছিল মা-বাবা কি সব

জেনে তার কাছে লুকোলেন? মা-বাবা কি জানেন না? কোন অজানা দেশের সেই অচেনা সংসারের ভয়ে আবার তাঁর বুকের মধ্যে কেঁপে উঠেছিল।

বড়ো আদরে মানুষ হয়েছিলেন, ঘর-সংসারের কাজও তেমনভাবে করেন নি কোনদিন। জানতেন নতুন সংসারে একেবারেই গৃহিণী হয়ে বসতে হবে তাঁকে, তাই জন্যই বড়োসড়ো মেয়ে খুঁজেছিলেন অঘোরনাথ। সামলে দেবার শাশুড়ি কি ননদ ছিল না সাগরের নতুন সংসারে। তবে কাজ শেখানোর ছিলেন একজন। তাঁর কথা কি কখনো ভুলছেন সাগরময়ী? নিজের শাশুড়িকে পাননি তিনি, কিন্তু স্বামীর শাশুড়িকে পেয়েছিলেন। স্বর্গগতা সতীনের মাকে। ভরাভরন্ত সংসার রেখে মেয়ে মারা যাবার পরও জামাইয়ের সংসারেই ছিলেন সেই বৃদ্ধা, আর কোথাও যাবার জায়গা ছিল না তাঁর। কালো গায়ের রং। তার ওপর একমাথা ধপধপে সাদা চুল। তখন একেবারে দুভাঁজ হয়ে গেছে শরীর, একটিও দাঁত ছিল না মুখে, চোখেও দেখতেন না ভালো, বলতেন,

—কাইন্দা কাইন্দা চোখ গইল্যা গেছে। বলতেন, সকল অঙ্গ নিল ভগবান, পরাণটুকু নেয়না, ওইটাই সক্কলের চেয়ে ভারী হইছে—

বেরিবেরিতে একজন আর ম্যালেরিয়ায় দুই ছেলে মারা যাবার পর মেয়ে-জামাই ছাড়া আর কেউ ছিলনা তাঁর। সেই মেয়েও যাবার পর তার সংসারে এসে পড়া সাগরময়ীর জন্যও স্নেহই ছিল তাঁর, কোন বিরূপতা ছিল না। কাজ করতে পারতেন না, কিন্তু হাতে লাঠি নিয়ে টুক্‌টুক্ করে চলাফেরা করতেন একটু আধটু। সকালে সাগর যখন রান্নাঘরে অনভ্যস্ত 'অফিসের ভাতে'র তাড়াহুড়ো করছেন, বঁটি পেতে বসে প্রায় দৃষ্টিহীন চোখেও সরু সরু করে তরকারি কেটে দিতেন। গ্রাম থেকে আসা সাগর চা করতে জানত না, চা খেতেও দেখেনি কাউকে কখনো, উনিই মুখে বলে বলে অঘোরনাথের আহ্নিকের পরে খাবার চা করাতেন। জামাইয়ের সামনে কিন্তু আসতেন না। বলতেন,

—যে নাই তার ঘরের ভাত খাই, লজ্জা করে। অথচ সেই দুঃখ নিয়ে যে সারাদিন বসে থাকতেন এমনও নয়। সূর্যের আলো যতক্ষণ থাকত দাওয়ায় বসে দড়ির শিকা বুনতেন, আষাঢ় মাসের রোদ্দুরে উঠোনে পাটি পেতে আমসত্ত্ব দিতেন, একটা কঞ্চি হাতে করে সারা দুপুর বসে তার থেকে পাখ-পাখালি তাড়াতেন। প্রায় দিনই সকালের তাড়া মিটবার পর আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করতেন,

—অ মাইয়া, কালা মাথা গিছে গিয়া? প্রথম দু-একদিন বুঝতে পারেনি সাগর। নিদন্ত মুখটি হাসিতে ভরে বুড়ি বুঝিয়েছিলেন, কালা চুল মাথায় যেইটা নি আপিস যায়— সে গিয়া?

তারপরে নির্দেশ দিতেন লাউমাচাটার কাছে লইয়া চল কিংবা সিমলতখানের কাছে যা দেখি—ভাঁজ হতে হতে লাঠি ভর করে করে কোনদিন দুটি লাউডগা, কোনদিন খানিকটা ডুমুর, কোনদিন বা দুটো কুমড়ো ফুল তোলাতেন ছোট গৃহিণীকে

দিয়ে।

—যা, ওইটুকু রাইন্ধা খা। কালামাথা দ্যাখলে আবার চিৎকার করব।

হিসেবি মানুষ ছিলেন অঘোরনাথ। ছ-সাতটি মানুষের সংসারে অভাব ছিল-না বটে, কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্যও ছিল না তেমন। ওই একটুখানি খুঁটিনাটির আদরে চোখে জল আসত সাগরের। মায়ের স্নেহ যেন অতটুকু দূর পর্যন্তই সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল তাঁর। আর তো সমস্তটাই ভয়। নতুন সংসারে আসা সে একরকম, তাঁর আরও ভয় ছিল যে অন্য একজন উঠে গেছে, এসে তার পিঁড়িতে বসা। পুরোন সংসারের মাঝখানে পুরোন লোকের মত হয়ে থাকবার জন্য আসা।

অঘোরনাথের বড়ছেলে সাগরময়ীর চেয়ে চার বছরের বড় ছিল, মেজ দু'বছরের। তারপর একটি মেয়ে, তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। সে সাগরময়ীর সমবয়সী ছিল তাকে সাগরময়ী দেখেছেন অনেক পরে। সবচেয়ে ছোট যে ছেলে, মাধব, তার বয়স ছয়। তারই মা হয়ে আসবার কথা শুনেছিলেন বিয়ের আগে। প্রথম কিছুদিন ছেলেরা আড়ষ্ট ছিল, মা বলে ডাকত না। খোকা তো ডাকতই না। সে ছোট ছিল, সে তো সংসারের আইনকানুন জানত না, সে তার মাকে চিনত। প্রায় মাসখানেক কি তারও বেশি সে ডাকত 'এই' 'অই' বলে। তার বাবা বারেবারে জেদ করতেন—'অই কি! মা কও।' সে বাবার সামনাসামনি আসত না। বড় দুই ছেলে পারতপক্ষে ঢুকত না ভিতরবাড়িতে। চুপ করে খেয়ে ওঠা ছাড়া তাদের সঙ্গে আর বড় সম্পর্ক ছিল না। একসময় ধীরে ধীরে সেইসব ভয় কিছু কেটে গেল কিছু সহজ হয়ে গেল।

একবছর পুরো হবারও আগে তাঁর কোল ভরে ছেলে এল। আর সেই বছরেরই শীতে সংসার খালি করে 'মা' চলে গেলেন। নিত্য তিরিশদিন শীতবর্ষা শেষ রাত্তিরে স্নান করা, তারপর ভিজে কাপড়ের খুঁট গায়ে জড়িয়ে উঠোন হয়ে দালানে আসা, তারপর কতক্ষণ যে ঠাকুর প্রণাম করে তবে কাপড় ছাড়া। একজায়গায় তো নয়, ঘরের সবকটি দেওয়াল ভরা ছিল গোপালের নানা রকমের ছবি—ননীচোরা থেকে বিশ্বরূপ পর্যন্ত, তার সঙ্গে একটি দুর্গা, একটি বামাক্ষ্যাপা। সবকটি ছবির সামনে প্রার্থনা শেষ করা চাই ভিজে কাপড়ে।

কাপড়খান ছাইড়া শুকনা কাপড় জড়ায়া লওনা ক্যান? বললে বলতেন আমার ঠাণ্ডা লাগবে না। আমার বুকে যে আগুন জ্বলে তারে কি জলে ঠাণ্ডা করে?

ঠাণ্ডাই বসেছিল শেষে। জ্বরে কাশিতে পড়ে রইলেন। ওষুধ খাওয়ার প্রশ্ন ওঠেনি, কিন্তু বাসকপাতা সেদ্ধটুকুও খাবেন না। জামাই-ও বলেছিলেন, এক জেদ ধরে রইলেন,—আর আমারে তোমরা কিছু কইও না। একটা কিছু লইয়া তো যামু। আর কতদিন বইয়া থাকুম।

দু'বছরের মাথায় বড় ছেলে বিষ্ণুপদর বিয়ে দিলেন। সৌরভী সংসারে এল। শাশুড়ি বৌ দুই সঙ্গিনী হয়েছিলেন। দুপুরবেলা বাপছেলেরা যে যার কাজে গেলে দু'জনে নিশ্চিন্তমনে খিড়কী বাগানের আমগাছে উঠেছেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাঁতার

কেটেছেন পুকুরে। তিনি তো পণ্ডিতের মেয়ে, সৌরভীর বাবা কাছারিতে কাজ করতেন—অনেক ভালো ভালো জিনিস রাঁধতে জানত সৌরভী। তার বাবা নিজের জামাইকেও কাজ ধরিয়েছিলেন সদর কাছারিতে। কিন্তু একটুও গুমোর ছিল না সৌরভীর। বড় হাসিখুশি মেয়ে ছিল। তবু একটা লজ্জার কথা খুব ভিতরে কোথায় যে আস্বস্ত ঠিক যখন প্রায় একই সঙ্গে গর্ভিণী হতেন দু'জনে। সৌরভী যে ছেলের বৌ। সেই ছেলের সামনে মাকেও যখন ভারী শরীর নিয়ে চলাফেরা করতে হয়, বড় লজ্জা হত। অথচ পুরুষমানুষরা কেন বোঝে না? তাদের লজ্জা হত না? তারাও তো বাবা আর ছেলে? কিন্তু এমন তো হতই। বিষ্ণু তো সাগরময়ীর পেটের ছেলে ছিল না, গর্ভজাত পুত্রের বৌ আর শাশুড়ি একই সময়ে আঁতুড়ঘরে থাকাই কি কম হত তখন! কিন্তু প্রতিবারই তো যে আসে সে একটি শিশু। আহা বুক জুড়িয়ে যেত। বিস্ময়ের যেন আর সীমা পরিসীমা থাকত না। আর কত না আনন্দ। তবু তো সবাই থাকত না তারা। অত কষ্ট অত যন্ত্রণা দিয়ে যদি দিতেন ঠাকুর তবে কেন ফিরিয়ে নিতেন আরও যন্ত্রণা দিয়ে? দ্বিতীয়বার গর্ভে যমজ ছেলে ছিল তাঁর। জন্মের পর চারদিন মাত্র বেঁচেছিল তারা। কত বয়স ছিল তখন সাগরের? আঠারো কি উনিশ। বুকে ভরাট দুধের যন্ত্রণায় আর খালি কোলের শোকে পাগল হয়ে গেছিলেন। জোরে কাঁদতে পারতেন না, দাওয়ার খুঁটিতে মাথা ঠুকে ঠুকে কপালে কালশিরা পড়ে গিয়েছিল। তাঁকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে 'ও মা—' বলে সৌরভীও কাঁদত।

তাই কি একবার? কানু গেল ছ'বছর বয়সে। কী যে হয়েছিল! জ্বর চলল একটানা, খাওয়া বন্ধ। কষ্ঠিপাথরের মত ছেলে পাঙাশপানা হয়ে গেল। কালো ঝিকঝিকে চোখ যেন মরা মাছের মত। থাকবে না বলেই বুঝি অতো রূপ নিয়ে এসেছিল। পাথরকাটা যেমন ঠাকুরটি। মিটিমিটি হাসি, মুখখানি ঘিরে থুপি থুপি চুল। সেই ছেলে চোখের সামনে কোলের ওপর একটু একটু করে শুকিয়ে গেল, কবিরাজের ওষুধে কোন কাজ হল না। যাবার দিন সকালে জ্বরের মধ্যে হঠাৎ চোখ মেলে সন্দেশ খেতে চেয়েছিল কানু, মা—আমারে একখান সন্দেশ দিবা?

কবিরাজ রাজি হননি, বলেছিলেন না-খাওয়া দুর্বল নাড়ি অতোটা পারবে না। দু-একদিন সবুর করতে। সবুর করার সময় ছিল না কানুর। সারাজীবনে আর সন্দেশ ছোঁননি সাগরময়ী। কিন্তু সে তো পরে। সেদিন? যখন হারিকেনের আলো নিয়ে সরঞ্জাম নিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছিল সবাই আর দরজার বাইরে থেকে অঘোরনাথ বলেছিলেন—সাগরবৌ, দিয়ে দাও। কারে ধরে আছ? সে ত নাই—ও তো মাটি। মাটির জিনিস মাটিরে ফিরায়া দাও।

যে শরীর রাখে আর শরীর ছিঁড়ে মাটিতে নামিয়ে দেয় তার বুক ছিঁড়ে যাবে না? মাটির কোথায়? মাটিকে তো আমি দিয়েছি। মাটি তো তৈরি করেনি ওকে, আমি করেছি। পুরুষে কি জানে!

সেই তো তখনই দীক্ষা নেওয়ালেন অঘোরনাথা। গোপাল মন্ত্র কানে দিয়ে গুরু

কষ্টিপাথরের এই বালগোপালকে দিয়ে গেলেন। বলেছিলেন—এই তোমার ছেলে, একে কোলে রাখো, এর সেবা করো। এর জন্ম নাই, মরণও নাই—এ এক-একবার লুকায় আবার ধরা দেয়, ওই তার লীলা।

সেই গোপালকে বুকে আঁকড়ে ধরা, নিজের সব দুঃখকষ্ট গোপালের ওই পা দুটিতে সঁপে দেওয়ার নিরন্তর চেষ্টা—কত বছর হল আজ? সত্তর বছর? নাঃ, ওই যে পাশের খাটে ঘুমোচ্ছে রাধু তারই তো সত্তর হয়ে গেল। রাধু তাঁর গর্ভজাত চতুর্থ সন্তান। তাহলে পঁচাত্তর কি আশি বছর? একশ বছর? নাকি সমস্ত জীবন ধরেই দিয়ে আসছেন। কতদিন ধরে বা চলছে এই জীবন? রাধু উঠলে, আজ একবার শুধোবেন কত বয়স হল তাঁর? লজ্জা হয় জিগ্যেস করতে। ছোটরা সব চলে যাচ্ছে একে একে। এই তো বুঝি গতবছর নাকি তার আগের বছর পুজোর সময় কলকাতা থেকে নাতি-নাতবৌ, তাদের ছেলেমেয়েরা এসেছিল, পাশের ঘরে গল্প করেছিল, সুন্দরদাদারও তো বয়স হচ্ছে, এবার উনি থাকতে থাকতে যদি সুন্দরদাদাও চলে যান—কী হবে!

শুনতে চাননি সাগরময়ী, তবু গোপাল শোনাও কেন? আমি যে এত ডাকি তবু যে আমারে নাও না, তাইলে আমি কি করি!

রাধু সংসার করল না। সেই কোনকালে বিয়ের তিন না চার বছর পরে সুন্দরবউ মরল, আর সংসার করল না রাধু। সাগরময়ীকে নিয়ে কত দেশ দেখাল, কত তীর্থ ঘোরাল, তারপর আবার সেই নিজের ভিটেয় ফেরা। উঠোনের পূর্ব-দক্ষিণ কোণ জুড়ে বিশাল স্বর্ণচাঁপার গাছ, এখনও কি আছে? কতদিন যেতে পারেন না উঠে। কতদিন দেখেন নি। ওই স্বর্ণচাঁপার গন্ধ অনেক বছর যেন সহ্য করতে পারতেন না। অন্ধকারে ফুল তুলতেন বলে কতোবার সাবধান করেছেন অঘোরনাথ আর সেই মানুষকে খোলা সকালবেলায় সাপে দংশন করল ওই স্বর্ণচাঁপার নিচে। আটটি ছেলে-মেয়ে পেটে ধরে বিয়ের চোদ্দ বছরের মাথায় সব শেষ।

কতকাল গেল তারপরে। সে যেন অন্য কোন জন্মের এক সাগর। সেই তখন থেকে বড়োখোকা সংসারের হাল ধরল। আর সৌরভী—সংসারের আঁচটুকুও লাগতে দেয়নি তাঁর গায়ে। যতটুকু পারেন আঁচ তিনি নিজে লাগিয়েছেন। মাথার সব চুল ফেলে দিলেন, একাদশী পূর্ণিমা অমাবস্যা বৈশাখে গাছকে জলের সেবা করা, কার্তিক মাসে ব্রত রেখে এক সিদ্ধ ভাত খাওয়া, মেঝেতে শোয়া—যে যা নিয়ম বলেছে সব ধরেছেন, পালন করেছেন। কোন ব্রতফল পাবার লোভে নয়। কেবল পালন করে যাবার জন্যই। শরীরকে কষ্ট দিয়েই কি শোক ভুলে থাকার চেষ্টা করে মানুষ? আনন্দেও তো থেকেছেন। অঘোরনাথ যাবার পর যখন মাথা তুলে বসতে পারলেন তখন থেকে একটি কাজ তো তাঁর জন্যই নির্ধারিত করেছিল সংসার—বাচ্চাদের নিয়ে থাকা। নিজের ছোট ছেলে মধুসূদনের তখন দু'বছরও পুরো হয়নি। তার ওপরে নিধু, তার ওপর সর্বজয়া। সৌরভীর পাঁচটি। ততদিনে মেজবৌও তিন ছেলের মা। সেই মানুষের ধরানো পাথরের গোপাল আর এই সব চঞ্চল বালগোপালদের

নিয়ে দিন কেটেছে। দিনে দিনে ছোটরা বড় হয়েছে, আবার নতুন নতুনরা এসেছে। শুধু কি নিজের ঘরের? পাড়ার আর পাঁচটা ঘরেরগুলি আসেনি? ঝুলনের দিনে আনন্দ করেন নি সব ললিতা বিশাখা সুবল সখা সাজিয়ে? প্রতি পূর্ণিমায় এলাচদানা এনে দিয়েছে বড়খোকা। কত আনন্দ ওই উঠোনেই আবার হয়েছে। দুঃখ কি আর জায়গায় থাকে? দুঃখ চলে যায়। সুখও কি জায়গায় থাকে? সুখও যায়। দুঃখ যেমন জায়গা ছেড়ে গিয়ে মনে বাসা নেয়, সুখ নেয় না কেন? কালাজ্বরে মধু গেল। তিনি কেন সৌরভীও কি পারল রাখতে? বুকের দুধ দিয়ে তো বড়ো করেছিল সৌরভী।

এই দোতলা উঠল। ওই উঠোনেই বৌছত্তরের আল্পনার ওপর দিয়ে এসে ছেলের বৌরা দুধ-আলতা ভরা থালায় দাঁড়াল একে একে। বিজয়া সর্বজয়া দুই মেয়ে গেল ওই উঠোন থেকে। উঠোনের কি দোষ? সৌরভীর চুল পাকল, মেজবৌ নয়নতারার চিকণ চেহারায় ভাঁজ পড়ল। তখন কত বয়েস হয়েছিল সাগরময়ীর যখন সৌরভী গেল? সৌরভী আগে গেল না সুন্দরবৌ? অনেকদিন আগেকার কথা তো বেশ মনে আছে, পরের কথাগুলি এমন ভুল হয়ে যায় কেন? তালগোল পাকিয়ে যায়। অথচ সবকিছুতে তো ভুল হত না কই। সৌরভীর বড়ছেলে অপূর্বর বৌ, সাগরময়ীর বড নাতবৌ, কতদিন বাঁকা করে বলত, কন দেখি যে ভুইলা যান, বাজার থিক্যা কি কি আনছিল—সেইখান কোন্‌দিন ভোলতে দ্যাখলাম না—

কি করে ভোলেন? মনে মনে হিসেব থাকে না কে কোন্‌টা ভালোবাসে, কার খুশিমুখ দেখার জন্য কোন্‌টা রাঁধবেন? গোপালের ফুলজল সকালের ভোগ দেবার পর সেই তো ছিল কাজ। সৌরভী নয়নবৌ মাছের হেঁসেল তুলত। বাচ্চাদের দুধজাল সিদ্ধচালের ভাত মুসুরির ডাল। তাছাড়া যা কিছু নিরামিষ ব্যঞ্জন সব তো রাঁধতেন সাগরময়ী। অপূর্ব ভালোবাসত দুধলাউ, নয়নবৌয়ের ছেলেরা একটু মিষ্টির ভক্ত ছিল। শেষ পাতে একটুখানি পায়েস কি নারকেল সন্দেশ পেলে খুশি। কে ভালোবাসত তিলবাটা দিয়ে চালতার টক? কে যেন? তাঁর নিজের ছেলেরা তো সকলেই ভালোবাসত মায়ের রান্না, যার যেটা বেশি পছন্দ। সারা গ্রীষ্মকালটা তাঁর হাতের কাসন্দ ছাড়া মুখে ভাত উঠত না কারুর। আর নাতিনাতনিগুলি? নিজের ভাত তো তিনগ্রাস, কিন্তু রাঁধতেন পিতলের বোগনোটার গলা পর্যন্ত। সবকটি নিজেদের মাছখাওয়া জামাকাপড় ছেড়ে দরজার গোড়ায় গোল হয়ে বসত হাত বাড়িয়ে। এক-একটি ব্যঞ্জনে ভাত মেখে নিজে এক গ্রাস মুখে দেওয়া আর বাকি সবটুকু ওই এক-একটি হাতে এক-একটি দলা। তাই কে আগে পাবে তার জন্য চাপা ঠেলাঠেলি নিজেদের মধ্যে।

কখন থেকে যে ধীরে ধীরে খালি হতে শুরু করল বাড়িঘর। অথচ সংসার বাড়লে যেন জায়গা অকুলান না হয় এই জন্যই না বড় জামাইয়ের পরামর্শে এত বড় দোতলা তুলেছিল বড়খোকা মেজকাকা। হঠাৎ কি একটা অস্বস্তি হল সাগরময়ীর, কি একটা ঠেলে উঠতে চাইল বুকের মধ্যে থেকে। হ্যাঁ মনে আছে টুকরো টুকরো

কতো কথা। একবার কবে দুই নাতনি এসেছিল নিজেদের ছেলেমেয়ে নিয়ে। তখনও বসে নিজে রান্না করতে পারতেন। কেবল তো নিজের আর রাধুর—কীই-বা রান্না। ওরা আসতে কতদিন পর অনেক সময় ধরে ছেঁচকি ঘণ্ট তিলনারকেল বাটা করেছিলেন। খেতে বসে বড় খুশিমনে ডেকেছিলেন পুতিনদের আর তারা এ মাগো, তোমার এঁটো ওই চটকানো ভাত খাবো? রাধু বকেছিল,

—কইছি না, দিনকাল বদলাইছে। বোঝ না সোঝ না, ঝামেলা পাকাও।

ঝামেলা তো পাকাতে চাননি। হ্যাঁ মনে কষ্ট তো হয়েই ছিল কিন্তু গোপাল জানে কারো ওপর রাগ হয়নি তাঁর। রাধু আগেও বকেছিল,

—এই যে শরীর পাত কইরা বাড়ি আমসত্ত্ব কাসন্দ করতে বারণ করি, কানে লও না, এইগুলি খাইবো ক্যাডা?

—ক্যান আলাদা আলাদা শিশিতে যে রাখছি, সক্কলরে পাঠায়া দিবি এট্টু এট্টু কইরা। কেমন ভালো খাইত সকলে—

—হ' পাঠায়া দিমু, কই পাঠামু? বিজয়া থাকে আমেরিকায়, তার পোলার কাছে। সর্ব দিল্লিতে—তার বৌ মেমসাহেব, বড়বৌমা বিছানায়, নিধুর পোলাপান এইসব খায় না আর নিধু হইছে অম্বলের রুগী। আমেদাবাদ, জম্মু, হায়দ্রাবাদ—এই সকল জায়গা কি কাছে যে পাঠামু?

নিধুর বড়ছেলে, মেজছেলের কবে বিয়ে হয়ে গেছে! মেয়ের ঘরের নাতিরাও বোধহয় এতদিনে বড় হল। কত বছর দেখেননি নিধুকে। মধু যাবার পর ওই সবার ছোট ছিল। মায়ের কোল ঘেঁষে ছাড়া শুতো না কত বড় বয়স পর্যন্ত। অনেককাল হল নিধুর সব সংসারসুদ্ধ কলকাতায়। ওর মুখটাও মনে পড়ে না স্পষ্ট। একবার সেখানে মাসখানেকের জন্য গোপালসুদ্ধ সাগরময়ীকে রেখে আসবার কথা হয়েছিল। সে অনেকদিন, তখনও নিধুর বড়ছেলে গৌতমের ঘরে নাতি-নাতনি হয়নি। নাকি হয়েছিল? ঠিক মনে পড়ে না। কিন্তু তখনও রাধুর কলেজে কাজ ছিল। সেই কাজের জন্যই বুঝি একমাস বিলেত যাবার কথা ছিল রাধুর। গৌতম কি নিধুর বড়ছেলে? নাকি নিধুর উপরে বিধু—তার? ভাবতে গেলে মাথা অস্থির করে, আরও বেশি মনে পড়ে না। কিন্তু সেবার থাকা হয়নি কলকাতায়। নিধুর বৌ প্রথমদিনই বলল, মা থাকলে তো খুবই ভালো হত, কিন্তু মায়ের আবার যে আচারবিচার! আমার তো একটাই রান্নাঘর—

বাক্সের মত কিরকম যেন ওদের উনোন। ঘুঁটে কয়লা কিছু লাগে না। সেগুলো টেবিলের ওপর বসিয়ে রান্না করে, দেখেছিলেন সাগরময়ী। ভাতের হাঁড়ি টেবিলে রেখে খায়, আবার সেই টেবিলেই রেখে কাগজ পড়ে। তপতী ঠিকই বলেছিল, তিনি পারবেন না। তাঁর গোপালকে রাখবার আলাদা ঘর চাই, তিনি নিজে হাতে শুদ্ধমত রান্না করে ভোগ দেন, নিজে খান। নিধুরা চারজন মানুষ, চারটে ঘর। বন্ধুবান্ধবরা আসে। তাছাড়া, মনে আছে নিধুর ছোটমেয়ে বলেছিল, ঘরের মধ্যে গোপালকে নিয়ে

থাকবে, ঘরের মধ্যে রান্না করবে বাসন ধোবে ঠাকুমা, সবাই দেখলে কি বলবে?

তাঁর সামনে বলেনি অবশ্য। কিন্তু তপতীর সাজানো ঘরদুয়োর, বুঝেছিলেন সাগরময়ী, সত্যিই তো তাঁর অনেক আচাববিচাব। কিন্তু সেই ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়েস থেকে তিনি যে এই আচারবিচারই জেনে এসেছেন কেবল। সেই আচারবিচার দিয়েই শোক ভোলা, তাই দিয়েই গোপালকে ধবে রাখা। তখন কি কেউ বলেছিল অন্য কিছু করার কথা? ববং যে যেখানে ছিল ওই আচার মেনে চলা, অতো কঠিন নিয়ম করার জন্যই তো ভালো বলেছে—

রাধু কি খাটে পাশ ফিরল? অন্ধকারের কি আর শেষ হবে না আজ? তুলসির গন্ধ আসে নাকি? নাঃ, এত ওপরে কোথায় তুলসির গন্ধ? বড় ইচ্ছা হয় উঠে স্নান করতে, উঠোনের অন্ধকারে কাপড় মেলে দিয়ে গাছগুলি হাতে করে ধরতে। কত দুপুব হলে তবে ওই বারান্দায় জলচৌকিতে বসিয়ে গরমজলে স্নান করাবে সেই মেয়েটা। সে কোথা থেকে যেন আসে, বিকেল হলে চলে যায়।

এত জলতেষ্টা কেন পাচ্ছে? যেন সমস্ত শরীরে জলতেষ্টা পায়। মা মাগো, হঠাৎ নিজেরই কিরকম অবাক লাগে সাগরময়ীর। গোপালের বদলে মায়ের নাম কেন মুখে এল? মনে আছে মায়ের মুখ? মনে আছে নাকি মাকে? যার নাম ছিল স্বর্ণময়ী? কিছু কি মনে পড়ে ঘোমটায় ঢাকা সেই মুখের, তের বছর বয়সের পর যে মুখ আর দেখেন নি? কবে নীলাচলে সমুদ্র দেখে এসে যে মা মেয়ের নাম রেখেছিল সাগর, তার কথা?

খাটটা হালকা দুলে ওঠে। মশারি তার আপন জায়গায় চার খুঁটে বাঁধা রয়ে যায়, তার নিচ থেকে ভেসে খোলা জানালা দিয়ে আস্তে আস্তে উড়ে যায় খাট। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে ঘন বেগুনিরঙের প্রজাপতিরা সাদা চাদর ওড়ানো বিছানা বয়ে নিয়ে চলে। বাতাবি ফুলের গন্ধ, কচি তুলসির গন্ধের সঙ্গে স্বর্ণচাঁপার গন্ধ এসে মিশতে থাকে।

ছকের বাইরে

ছোড়দিদি কী সুন্দর যে তোর এই ফুলগুলো!

তুই বাইরে গিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিস কেন? ঘরে আয়না আছে—

এগুলোকে দেখব বলে। সত্যিরে। দেখে দেখে আর আশ মেটে না।

তোকে দিতে পারতাম চারা তুলে। কিন্তু তোদের ওখানকাব গরমে—

দূর। যেখানে আছে সেখানেই ভালো। একি গল্পের মতো পেয়েছিস। বাঃ এই মেয়েটা কী ভালো গান গায় বলে রাজপুত্র তাকে বিয়ে করে ফেললেন। জেলের মেয়ের এত বুদ্ধি! রাজামশাই তাকে বিয়ে করে ফেললেন—যা যেখানে আছে সেখানেই ভাল।

দাঁড়াও দাঁড়াও কে কাকে বিয়ে করে ফেলছে—বলতে বলতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে ডাইনিং স্পেসে এসে দাঁড়ায় সমর। তার গেঞ্জিতে চুলের জল গড়িয়ে পড়েছে কোথাও কোথাও, যদিও হাতে তোয়ালে। সেটা দিয়ে মাথা ভালো করে ঘষতে ঘষতে সে বলে, কে বিয়ে করছে এ বাড়িতে আমি ছাড়া?

রুক্মিণী হাসে, তোমার ছাড়া আর কারও বিয়ে হতে নেই?

সমর খুব চিন্তিত মুখ করে।

—হ্যাঁ আছে। আছে তো বটেই কিন্তু কে আর? তোমার দিদির ভাগ্যে তো এই রাজপুত্রটি জুটেই গিয়েছে, আর তুমি? তুমি কি আর সত্যিই আমার বুকে শেল হেনে অন্য কারুর ঘর আলো করে গিয়ে উঠবে?

মৌসুমী রান্নাঘর থেকে বোনের জলখাবারের থালা হাতে করে বেরোতে বেরোতে তাড়া দেয়,

—যত রাজ্যের বাজে কথা। আমার বোন কি হ্যাজাক বাতি? তোমাদের ঘর আলো করা ছাড়া কাজ নেই তার? এখন এইসব হচ্ছে আর হঠাৎ বলবে দেরি হয়ে গেল। আমাকে আর তরকারি-টরকারি দিও না।

রুক্মিণী বলে, অত আহ্লাদ দিলে ছোড়দিদি, আমিও তাই বলতুম রে।

সমরের শার্ট পরা হয়নি। প্যান্টের ভেতরে গেঞ্জিটা গুঁজতে গুঁজতে এসে সে চেয়ার টেনে বসে পড়ে।

—কেন, তোমার রূপপুরের লোকজন কি তোমার ধমকের ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে?

—গিয়ে দেখ না একবার।

রুম্পা টুম্পির একটুও ইচ্ছে নেই স্কুল যাবার। মাসি এসেছে তিনবছর পর।

টুম্পি প্রথমে একটু আলগা হয়ে থাকছিল, তার সাত বছরের জীবনে মাসির স্মৃতি খুব স্পষ্ট নয়। কিন্তু দিদিকে মাসির সঙ্গে সেঁটে থাকতে দেখে তার আর উপায় থাকে না। দুজনেই স্নান করতে যেতে, স্কুল ব্যাগ গোছাতে দেরি করতে থাকে। মৌসুমী একটুও প্রশ্রয় দেয় না তাদের।

—মাসিমণি সারারাত বাসে এসেছে, একটু বিশ্রাম করবে। তারপর বিকেলে তোমাদের সঙ্গে গল্প করবে। আজ শুক্রবার, তারপর দু'দিন আছেই ছুটি—

রুক্মিণী বলে, থাক না ছোড়দিদি, আমি বাসে ঘুমিয়েই এসেছি বে।

—মোটেই না। এতদিন পর আমরা দু'বোন একটুও গল্প করব না বুঝি? তাও তো এক্ষুণি চলে যাবি।

—এক্ষুণি বুঝি? তিন দিন আছে হাতে।

—ছাই। একটু পরেই দেখবি রাত হয়ে গেল, রাত পোহালেই আবার সংসার—দিন শেষ, তারপরই তো তোর যাওয়া। আর দু'টো দিন থেকে যেতে পারবিনে রুকু?

—এবার পারব না রে—আবার তো আসব।

সমর অফিসে বেরোবার আগে রবিবারের দার্জিলিং মেলে বোনের রিজার্ভেশানেব কথা মনে করিয়ে দেয় মৌসুমী।

বাড়ি খালি হয়েছে। বিধ্বস্ত রণাঙ্গণের মতো সমস্ত জায়গাটার চেহারা। রুম্পা-টুম্পির ছাড়া জামা বসার ঘরের বেতের সোফায়, সমরের মাথা মোছা আধভেজা তোয়ালে খাটের ওপর, দু'পাটি হাওয়াই চটি দু'পাশে উলটে আছে। টেবিলে এঁটো প্লেট-বাটি, রান্নাঘরের ভেতরটাও আগোছালো। রুকু বাচ্চাদের পড়ার টেবিলটা গোছাবার চেষ্টা করছিল, মেঝেয় পড়ে থাকা সবুজ আধা-স্বচ্ছ রবারটা হাতে তুলতেই মৌসুমী তাকে ডাকে, একদম ওগুলোয় হাত দিবি না এখন। আগে এদিকে আয়।

টেবিলে মাঝারি একটা কাপ আর বড় এক মগ ভর্তি কফি। একটা প্লেটে রুটি তরকারি। এঁটো প্লেটগুলো রান্নাঘরে রেখে এসে বসতে বসতে মৌসুমী বলে,

—জেঠিমার দেওয়া এই একটা শিক্ষা আমি একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলি। তোর মনে আছে, সবাই বাড়ি থেকে চলে গেলে বাড়িটা কী হয়ে থাকতো! জেঠিমা কোনদিকে একটুও গ্রাহ্য না করে নিজের খাবারটি নিয়ে বসতেন। বলতেন, আর তো কেউ করবে না। তাই নিজের উপর নিজেই মায়া করি। নিজেরে কই, শ্যামাসুন্দরী আগে মন শান্ত কইরা নিজের প্যাটে কিছু দাও। প্যাটে কিছু গেলে মাথা ঠাণ্ডা হয়, নাইলে শরীরে বল পাইবা কই? আমিও তাই করি। না হলে এই যে একবার শুরু করবি, শেষ করে ঘরে যেতে যেতে বেলা দু'টো।

তরকারি মুড়ে এক টুকরো রুটি বোনের মুখে দিয়ে দেয় মৌসুমী। স্নানের জল গরম করে দেওয়ার কথা বলে। রুকু বাধা দেয়। খাবার টেবিলের জিনিসপত্র তুলে রান্নাঘরে গুছিয়ে রাখতে বলে,

—আর কিছু রান্না করিস না ছোড়দিদি, এগুলো গুছিয়ে নিয়ে চল বসি।

—রান্না কি ভাবছিস আমাদের দুপুরের জন্য করব? বিকেলের জলখাবার, রাতের তরকারি এখন না করে রাখলে তো তখন আবার বসতে হবে। দু'বেলা রাঁধতে আমার একটুও ভালো লাগে না রে। তাছাড়া রুম্পা সিঙ্গে উঠল তো, ওদের নিয়েও বসতে হয়।

—কাল তো ওদের ছুটি। রাত্রে খিচুড়ি করব। বিকেলের জন্য কি হবে বল?

—ফ্রিজটা খোল দেখি, তরকারিপাতি কী আছে।

তরকারি নেড়েচেড়ে দেখে—রুকু বলে,

—ছোড়দিদি, বিকেলে ওরা ফিরলে আমি চাউমিন করে দেব। তোর গাজর আছে, ক্যাপসিকামও আছে।

দুপুর বেলা খাটের ওপর পাশাপাশি শোয় দু'বোন। রুকু দিদির গা ঘেঁষে আসে।

কতদিন পর এরকম করে তোর কাছে শুয়ে আছি, না রে ছোড়দিদি?

মৌসুমী আস্তে আস্তে বোনের মাথার চুলে বিলি কেটে দেয়। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে রুকু জিজ্ঞেস করে,

—তুই অন্যদিন দুপুরে ঘুমোস?

—না। খানিকক্ষণ শুয়ে থাকি, কাগজটা একটু দেখি। কখনও এক-দু'টো চিঠি লিখি। আজকাল তো অবশ্যি চিঠি লেখার পাট উঠেই গেছে। মাকেও আর চিঠি লিখি না কতকাল! সপ্তাহে একবার হয়তো ফোনে একটু কথা বললাম, ব্যস। চিঠি লিখবার, চিঠি পাবার পাটই উঠে গেছে।

—ঠিক বলেছিস। অথচ চিঠি কতবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পড়া যায়, ফোনের কথা কি আর বার করে শোনা যাবে পরে?

—তুই এর মধ্যে শেষ কবে গেছিস শ্রীরামপুর?

—গত মাসে গিয়েছিলাম, ওই মাঝামাঝি সময়ে। কলকাতা থেকে ফিরবার পথে।

—কলকাতা কেন?

—স্কুলের কাজ ছিল।

—কেমন আছে রে মা-বাবা? মনে হয় আমি চিন্তা করি বলে ওরা ফোনে আমাকে সব সময় ঠিক কথা বলে না।

কথা বলতে বলতে মৌসুমী অনুভব করে শিথিল হয়ে আসছে রুকুর শরীর। বেচারি। যতই বলুক বাসে ঘুমিয়েছি ওরকম ঝাঁকুনিতে ওই বসে বসে কারও ঘুম হতে পারে। ভাত খেয়ে যেই শুয়েছে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার এই বোনটাকে নিয়ে মৌসুমীর বরাবর চিন্তা। ও অন্যদের মতো নয়। ছোটবেলা থেকে ও অন্যরকম। পাড়ার যতো কুকুর, পা ভেঙে যাওয়া শালিক, লেজে-ফুলঝুরি বেঁধে ছেড়ে দিয়েছিল

বাচ্চারা বেড়ালছানা, ঠোকর খাওয়া কাক—সব ছিল ওর পোষা। বাটি করে চুন হলুদ গরম করতে, হাঁড়ি করে মোটা চালের ভাত নয়তো মোটা রুটি বানাতে বানাতে মা এক-একসময় রেগে উঠত।

—আমি পারব না আর। বিয়ে হয়ে যখন যাবি, রোজ শাশুড়ি আমাকে গালাগালি করবে।

আর রুকু দু'হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে বলত,

—বিয়ে হয়ে যাব না মা।

—তা বইকি! সময় হলে ঠিক যাবে।

—ওমা, তবে মা তোমাকে নিয়ে যাব।

মা কখনও হেসে ফেলতেন, কখনও গম্ভীর হয়ে যেতেন। এও সত্যি খানিকটা প্রশ্রয় মায়েরই থাকত। নইলে তাদের অন্য বন্ধুদের মায়েরা যখন দুপুর দু'টোয় খেয়ে উঠে ঘরে গিয়ে পিঠ টান করতেন, তাদের মা কেন মাথার ভিজে চুল তালুতে গিঁট দিয়ে, উঠোনের সিঁড়িতে পা ছড়িয়ে বসে কাঠি দিয়ে চুন হলুদ গরম করে লাগাতেন কুকুরের মচকানো পায়ে আর মুখে বকতে থাকতেন?

—সাক্ষাৎ শাশুড়িঠাকরণ ফিরে এসেছেন আবার। তিনিও যেমন কোনওদিন দুপুরে দু'দণ্ড বসতে কি একটু গড়াতে দেননি, এই শয়তান মেয়েও ঠিক তাই। যত রাজ্যের কুটুম আমার এনে বাড়িতে জড়ো করছেন। বলতেন,

—কার কপালে যে নাচছেন এই গুণধরী, সে হতভাগ্য যে কোন গোকুলে বাড়ছে—

অথচ ওইসব বেড়াল কুকুর বেজি চন্দনা শালিক কোনওটাকেই কোনওদিন পোষার চেষ্টা করেনি রুকু। সুস্থ হয়ে গেলেই ছেড়ে দিত। কুকুরগুলো অবশ্য যেত না, রুকু বাড়ি থেকে বেরোলেই সারমেয় বাহিনী তাকে গার্ড অব অনার দিতে দিতে চলত রাস্তার মোড় পর্যন্ত। কিন্তু সেই গোকুলে বাড়তে থাকা ছেলেও জুটেছে দেখে স্বস্তি পেয়েছিলেন মা-বাবা।

ইন্টারকলেজ কম্পিটিশানে জয়ন্তর সঙ্গে আলাপ হয় রুকুর। কোন একটা কলেজের কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে সদ্য ঢুকেছে, গায়ে তখনও ইউনিভার্সিটির গন্ধ। হিন্দ্ মোটরসে চাকরি করতেন তার বাবা, রিটায়ার করে কলকাতায় বাগবাজারের বাড়িতে ফিরে গিয়েছেন। বছর দুই ওরা পরস্পরের সঙ্গে মিশেছে। আলাপের প্রথম পর্যায়েই স্বভাব মতো রুকু জয়ন্তকে টেনে এনেছিল নিজের বাড়িতে। মা বাবা ছোড়দিদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়নি এমন নাকি কোন বন্ধু নেই তার। তাদের বাড়িতে এসে জয়ন্তর ভালো লেগেছিল, অন্তত তাই তো বলেছিল সে। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার, হ্যাঁ মেয়ে দু'টি লেখাপড়ায় ভালো। পুরনো ধাঁচের বাড়ি, ছড়ানো উঠোন, কাঁঠাল গাছ, নারকেল গাছ, ইটের রেলিং দেওয়া ছাদ—সবই নাকি খুব সুন্দর আর স্নেহমাখা মনে হয়েছিল জয়ন্তর। সে বাবা-মায়ের এক ছেলে। হিন্দ

মোটরে কলোনি কোয়ার্টারে থেকেছে ছোটবেলায়। আট বছর বয়েস থেকে থেকেছে হোস্টেলে। কলেজ-ইউনিভার্সিটি বাগবাজারের বাড়ি থেকে। এমন খোলামেলা আবহাওয়া, বাবা মায়ের সঙ্গে মেয়েদের এমন সহজ সম্পর্ক দেখে প্রথম প্রথম যেন একটু অস্বস্তিই পেত। সহজ হয়ে যাওয়ার পর একদিন মৌসুমীকে ঠাট্টা করেছিল,

—খোঁড়া পোড়া অল্পবুদ্ধিদের প্রশ্রয় তো তোমাদের বাড়িতে বরাবরই আছে। কি বল?

মৌসুমীর বিয়ের তখন ক' বছর হয়েছে। সমর নর্থ বেঙ্গলের ছেলে, সরকারি চাকরি করে, মানানসই চেহারা। কোনও টাকা পয়সার চাহিদা ছিল না ওদের। কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে এমন সম্বন্ধ হাতে পেয়ে খুব খুশি হয়েছিলেন ওদের বাবা-মা। রুক্মিণীর বিয়ে তো ঠিক হয়েই আছে। জয়ন্তর মা-বাবা জানেন। রুকুকে নিজেদের বাড়িও দু-একবার নিয়ে গিয়েছে জয়ন্ত। প্রথম দিকে বিয়ের জন্য দু'জনের কারোরই তেমন তাড়া ছিল না। রুকুর বি এসসি শেষ না হলে এসব বিষয়ে কোনও কথা উঠতেই পারে না। পরীক্ষার রেজাল্টও যখন বেরিয়ে গেল রুক্মিণীর মা-ই ডেকে বললেন। তারপর প্রথম যখন ফর্মালি মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে জয়ন্তদের বাড়ি গেলেন রুক্মিণীর মা-বাবা, জয়ন্তর বাবা পঞ্চাশ হাজার টাকা চাইলেন আর ছেলের জন্য একখানা স্কুটার। বললেন—এটা পণ নয়। বৌভাতের তো একটা খরচা আছে। আমাদের আত্মীয়স্বজনও অনেক। সেই খাওয়া-দাওয়ার খরচা আপনার মেয়ে-জামাই নিজেদের টাকায় ইচ্ছে মতো করতে পারবে—সে জন্যই। পঞ্চাশ হাজারে ধরুন আজ একটা বড় ভোজের খরচ ওঠে না, তবে ওটা একটা শুরু করবার মতো কাজে লেগে যাবে।

স্কুটারের ব্যাপারেও তাঁর একই বক্তব্য। তিনি তো আর উঠবেন না স্কুটারে, চড়বে ওঁদেরই জামাই। তার কলেজ যাতায়াতের সুবিধা, বিকেলে নিজেরা ঘুরতে যাবে, তখন কিসে যাবে?

হতবুদ্ধি হয়ে ফিরে এসেছিলেন চন্দ্রনাথবাবু আর তাঁর স্ত্রী। জয়ন্ত বাড়িতে ছিল, সামনে আসেনি, আলোচনায় কোন ভাগও নেয়নি। পরদিন রুক্মিণীর সঙ্গে দেখা করে তাকে বোঝায়, আমি মেসোমশায়ের পক্ষ নিয়ে বললে বাবা প্রথমেই খুব চটে যেতেন। ফলে তোমার সম্পর্কে ওঁদের অ্যাটিচুডটা ভালো হত না।

—তুমি জানতে যে ওঁরা টাকার কথা বলবেন?

—আন্দাজ করেছিলাম। আসলে আমাদের বাড়ি তো জানো খুব পুরোনপন্থী। যেহেতু পরিবারের বাকি সব ছেলেদের বিয়ে ওই ভাবেই হয়েছে—

—আমি তোমার পরিবারের অন্য ছেলেদের ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড নই, বলে রুক্মিণী চলে এসেছিল তখনকার মতো।

বাড়িতে একেবারে শক্ত করে বলে দিয়েছিল ওখানে বিয়ে সে কোনওমতেই করবে না। তার বাবা-মা বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, এই ছেলের সঙ্গে তার মনের

মিল হয়েছে, ছেলেটি যখন এমনিতে ভালো, বাবা-মায়ের মুখের ওপর সবসময়ে তো কথা বলা যায় না—

—এটা তো সব সময় নয় বাবা। এরকম সময়েও একটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে কথা বলতে পারে না তার ওপরে কি করে ভরসা করব আমি? ওটা তো আমার নিজের বাড়ি নয়, ওদের বাড়িতে।

রুকুর মা বলেছিলেন, বিয়ে হয়ে গেলে ও বাড়িই তোর নিজের বাড়ি হবে রুকু, মেয়েদের শ্বশুরবাড়ি তাদের নিজেদের বাড়ি।

—না মা, তা কী করে হবে? যাদের সঙ্গে গোড়াতেই এতবড় অমিল, যাদের জানি না চিনি না তাদের বাড়ি কি আপনা থেকেই নিজের বাড়ি হয় কখনও? থাকতে থাকতে একটা জায়গায় মানুষের ভালোবাসা হলে তবে তো সেটা বাড়ি হবে? কিংবা ধরো বাড়ির মত হবে। টাকা দিয়ে যদি হোস্টেলে রাখ তো অনেকদিন থাকলে হোস্টেল কি বাড়ি হয়ে যায়? আর নাহলে একটা কাজ কর—তোমরা টাকা দিচ্ছ সেই দাম দিয়ে ছেলে কিনে এনে বাড়িতে রাখ। তাতে তো কারও কোনো অসুবিধে থাকবার কথা নয়।

বারে বারে কথাবার্তা ঘুরে ফিরে এরকম সব জায়গাতেই এসে পৌঁছচ্ছিল। আচমকা মা যেন একেবারে চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন। একবার জয়ন্ত বাড়িতেও এসেছিল। রুক্মিণী বিশেষ কথা বলেনি তার সঙ্গে। কোন নিরিবিলিতেও যেতে রাজি হয়নি। জয়ন্ত বলেছিল,

—তুমি ব্যাপারটাকে এত বড় করে নিচ্ছ কেন? আমি কি কিছুই নই? উত্তরে রুক্মিণী বলে,

—তুমি বড় করে নিচ্ছ না বলেই তো আমি তোমাকে আর চিনতে পারছি না।

—একটু বুঝবার চেষ্টা কর রুকু, পরে দেখবে এগুলো ঠিক হয়ে যাবে।

—যে বোঝাপড়াটা দু'বছরে হয়নি! অথচ আমি ভেবেছিলাম তুমি আমাকে বোঝ।

—তোমাকে না বুঝলে কি আজকে আমি আসতাম?

—তাহলে আমিই তোমাকে কিছু বুঝিনি। তোমার বাবা-মা পণ চাইতে পারেন এটা জেনেও তুমি আমাকে বলনি। কারণ তুমি জানতে যে এটা শুনলে আমি রেগে যাব। তাই ভেবেছিলে আমার বাবাকে রাজি করিয়ে নেবে? একে প্রেম বলে না জয়ন্ত। এরকম ঠাণ্ডামাথায় ফন্দি করতে পার তুমি একথা এতদিনের মধ্যে আমি তো কখনও বুঝতে পারিনি। জয়ন্ত এমনও বলেছিল,

—বেশ আমি যেমন করে হয় বাবাকে রাজি করব। কিছু দিতে হবে না কাউকে। দরকার হলে আমরা রেজিস্ট্রি বিয়ে করব।

রুক্মিণী রাজি হয়নি। যে একবার এরকম জায়গায় অসৎ হতে পারে, তাকে আর কখনও জেনে বুঝে বিশ্বাস করা যায় না, মনে হয়েছিল তার।

—তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করতাম জয়ন্ত, আর করি না। যাকে শ্রদ্ধা করব না, বিশ্বাস করতে পারব না, তাকে বিয়ে করতে যা< কেন, বল?

জয়ন্ত চলে যাবার সময়ে মৌসুমীর মা কেঁদে ফেলেছিলেন,

—রুকুর সম্পর্ক ধরেই তুমি এ-বাড়ি আসতে জয়ন্ত। কিন্তু আমি তো অত হিসেব রাখতে পারিনি। আমি তোমাকেও আমার ছেলের মতোই দেখতাম।

মৌসুমী এত কথা মায়ের কাছেই শুনেছিল।

ক'টা দিন মুখে এতটুকু হাসি ছিল না রুকুর। এক-একদিন সারারাত্রি কাঁদত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। পায়চারি করত বারান্দায়, ছাদে। অথচ বাবা যখন বলেছিলেন জয়ন্তর সঙ্গে নিজে যোগাযোগ করবেন, তখন কিছুতেই রাজি হয়নি।

তার কিছু পরে, সমর-মৌসুমী গেল শ্রীরামপুর। জোর করে বোনকে টেনে এনেছিল এখানে। সমর যদিও স্ত্রীকে বলেছিল এটা রুক্মিণীর অস্বাভাবিক জেদ, কিন্তু সামনে রুকুর প্রশংসাই করেছিল, ঠাট্টা করে বলত,

—আমি কিন্তু আরেকবারও রাজি আছি, বিনা পণেই।

বোনের পিঠে হাত রেখে শুয়ে থাকতে থাকতে মৌসুমীরও চোখ লেগে গিয়েছিল। ঘুম ভেঙেছে কাজের মেয়ের দরজা ঠেলার শব্দে। উঠে দরজা খুলতে না খুলতেই দুই মেয়ে এসে হাজির। পিঠ থেকে ব্যাগ না নামিয়েই দু'জনে মাসির ওপরে।

বিকেলে সামনের লনটুকুতে গিয়ে বসল তিনজনে। রুকু বলেছিল একটু বাজারে যাওয়ার কথা। রাত্রে আর রান্নার ঝঞ্ঝাট না করে কোথাও খেয়ে নিয়ে ফেরা হবে। মৌসুমী উড়িয়ে দিল, বাড়ি থেকে সেজেগুজে বেরিয়ে দোকানে বসে খাও, আবার হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফেরো। এখানে কি ট্যাক্সি আছে? সুতরাং সন্ধ্যাবেলা সমর আর রুক্মিণী বাজারে যাবে। রাত্রে তারাই রাঁধবে। মৌসুমী কেবল বসে গল্প করবে। বাচ্চাদের ছুটি।

বিকেলে তাই বাবা-মা আলাদা, এখন কেবল রুম্পা আর টুম্পি আর মাসি। দুই বোনে মাসির সঙ্গে নানারকম দরকারি কথা সেরে নেয় বাগানে বসে,

—মাসিমণি, তুমি ইস্কুলের মিস্ নাকি গো?

—তোমার ইস্কুলে কারা পড়তে আসে?

—ওরা পড়া না পারলে তুমি কি ওদের হাতে স্কেল দিয়ে মারো?

রাত্রের রান্না-খাওয়ার মধ্যে মধ্যেও প্রায় একই সব প্রশ্নোত্তর চলে। এবার কেবল প্রশ্নকর্তারা আলাদা। কতদিন হল রুকুর রূপপুরের স্কুলে, কত ছাত্রছাত্রী, জায়গাটা কীরকম....। গ্রাম জায়গা, আশেপাশে কিছু নেই, ফাঁকা—শুনে সমর বলে,

—তাহলে এবার গানটা প্র্যাকটিস করে নাও বরং।

—ওই ইস্কুলের জনগণমন শেখাবার মতো গান রুকু যথেষ্ট জানে।

—আরে জনগণ-র গান নয় রে বাবা, এ অন্যটা...

—কি অন্য? জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় রুক্মিণী। সমর হাসে,

—বুঝলে না? ফিলিমের হাফটাইমের বেশি পার হয়ে গেছে। ভুলবোঝাবুঝি মান অভিমান করে দূর গ্রামে বাচ্চাদের ইস্কুলে পড়াতে আসা পর্যন্ত—এবার শুধু ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে তুমি গান গেয়ে গেয়ে ছেলেপুলে পড়াবে, ব্যস্—হিরোর আগমন, ঘোর অনুতাপ তারপর ইয়ে আর কি। মৌসুমী তাড়া দিয়ে ওঠে,

—চুপ কর তো! যত রাজ্যের বাজে কথা।

—বাজে কথা নয় সখী, এটাই ফরমূলা, না হয়ে যাবে কোথায়? আমার একমাত্র শ্যালিকা, বিরহে শুকিয়ে যাচ্ছে—

রুকু এতক্ষণ কোনওকথা বলেনি। এবার হাসিমুখে বলে,

—এটাকে অন্তত শুকিয়ে যাওয়া বলে না সমরদা।

শেষপর্যন্ত রান্না দু'বোনে মিলেই করে। সমর সারাদিন রুকুর টিকিট করা ছাড়া আরও একটা কাজ করে এসেছে—অফিসের একটা গাড়ি ঠিক করেছে, তেলের খরচটুকু দিলে সবসুদ্ধ তিস্তার ব্রিজ পেরিয়ে জঙ্গলের রাস্তা ধরে খানিকদূর বেড়াতে নিয়ে যাবে।

পরের দিন শনিবার। তিস্তাকে এখানকার লোকেরা বলে তিস্তাবুড়ি। জায়গাটায় নদীর 'বেড' অনেকটা চওড়া। জলের পাশে বেশ খানিকটা বালি। কাছাকাছি অল্প জলের মধ্যে বিশাল বিশাল পাথর। একটুখানি দূরেই বাঁদিকের জঙ্গলের ভেতর থেকে একটা বেশ বড় মতো ঝরনা এসে ঝাঁপিয়ে নামছে তিস্তার জলে। সেখানে জলের আলোড়ন—নীল জলে ফ্রিল দেওয়া সাদা ফেনা, একটা নিচু পাথরের ওপর বসে রুকু একদৃষ্টে সেদিকে চেয়েছিল। ঘণ্টা দুই হয়েছে তারা এসেছে এখানে। রুম্পা-টুম্পির সঙ্গে এতক্ষণ ছুটোছুটি করে প্রচুর খেলা হয়েছে বালির ওপরে। তাতে মৌসুমীও যোগ দিয়েছে খানিকটা। সমর ছবি তুলেছে অনেক। এবারে যেন ক্লান্ত হয়েই সবাই একটু চুপচাপ বসেছে। বেলা প্রায় বারোটা। কিন্তু নদীর এত কাছ ঘেঁষে বসেছে বলেই বোধহয় বাতাস বেশ ঠাণ্ডা। ছুটোছুটির ঘামটুকু শুকিয়ে যাওয়ার পর আর একটুও গরম লাগছে না। বাড়ি থেকে লুচি মাংস তৈরি করে আনা হয়েছে। মুড়িও আনা হয়েছিল। পথ থেকে কেনা হয়েছিল মিষ্টি, চপ, ফ্লাস্কে চা। প্রথমে কথা হয়েছিল সকালে পাঁউরুটি ডিমসেদ্ধ, কলা খাওয়া হবে। মৌসুমী সব চেয়ে আগে খারিজ করে দিয়েছে সেটা।

—রোজ ব্রেকফাস্টে ওই টোস্ট আর টিফিনে ডিম আর কলা। পাউরুটি দেখলেই দম আটকে আসে আমার। কেন অন্য কিছু খাওয়া যায় না?

—কী নেওয়া যাবে বলো? যাতে পেট ভরা থাকে কিছুক্ষণ। বাচ্চাদের না হলে তো খিদে পেয়ে যাবে।

—খিদে পেলে আবার খাবে, তা বলে রোজকার ওই রুটি, ডিমসেদ্ধর মধ্যে

আমি নেই।

শেষপর্যন্ত জিলিপি চপ মুড়ি। বাড়ি থেকে অতি সুগৃহিণীর মত পেঁয়াজ, শশা, আলুসেদ্ধ, নারকেল পর্যন্ত কুচিয়ে নিয়ে এসেছিল মৌসুমী। হৈ হৈ করে একবার খাওয়াও হয়েছে সে সব। একটা বিপত্তি অবশ্য হয়েছিল। খবরের কাগজ পেতে মাথা মুড়ির বেশ খানিকটা অংশ নদীর বাতাসে ছড়িয়ে গেল সকলের খিলখিল হাসির সঙ্গে। এখনও আশপাশের বালিতে তার কতক অংশ ভিজে এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে। সমর জোরে ডাকে,

—রুকু, এখানে এস। কি করছ ওখানে একা বসে?

রুম্পা আর টুম্পি ততক্ষণে গুনগুন করে একটা দাবি জানাতে শুরু করেছে, তারা নদীতে স্নান করবে। মৌসুমী একটু ভয় পাচ্ছে, কিন্তু তার গলায় ঠিক রাগ বা সেরকম নিষেধ নেই। সমরেরও তাই। রুকু বরং নদীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে,

আন্ডার কারেন্ট নেই দিদি? দুই মেয়ে একসঙ্গে বলে ওঠে,

আমরা পাড়ের একদম কাছাকাছি থাকব। মৌসুমী তর্জন করে,

কাছাকাছি থাকবি আবার কী রে? সর্দার হয়েছ সব।

বাবা যদি রাজি হয়, বাবার হাত শক্ত করে ধরে থাকবি। পাথর দেখেছিস কীরকম? বাবার হাত যে ছাড়বে স্রোতে ভেসে গিয়ে তারই মাথা ঠুকে যাবে ওখানে বুঝবি মজা তখন—

এরপর আর অনুমতির কিছু বাকি থাকে না। একটা কথা শুরুতেই উঠেছিল স্নান করে পরবে কি? যা হাওয়া, তক্ষুণি পোষাক না পাল্টালে জ্বর অবধারিত। তখন এ প্রশ্নটাকে সমর গুরুত্ব দেয়নি—সে যা হোক একটা কিছু হবে, কথাটা হল যে জলে নামবে কি না। বলেছিল গম্ভীরভাবে। এখন তার পিঠের ছোট কিটব্যাগটা থেকে দু'বোনের এক সেট করে পোশাক বেরোয়। মৌসুমী ছদ্মকোপে চোখ বড় করে—

—ও, তুমি আগেই ঠিক করে রেখেছিলে। সমর একটু অপ্রস্তুতভাবে হাসে,

—না, মানে আমার মনে হচ্ছিল ওরা নদী দেখে নামতে চাইতেও পারে। শেষ যেবার এসেছিলাম আমরা সেটা ছিল বিকেল বেলায়, একটুক্ষণের জন্যে। মনে আছে? তখন ওরা আরও ছোট ছিল। এখন বড় হয়েছে। তাই নিলাম। আসলে ছোটবেলায় আমরা কিছু একটা করতে চাইলেই বাবা-মা এমন কড়া বারণ করতেন, এত বকতেন যে পরে আমরা আর কিছু চাইতামই না। যেগুলো করতে খুব ইচ্ছে হত, লুকিয়ে করতাম। আমার তাই মনে হয়, আমার মেয়েরা আমাদের সঙ্গে যেন সব শেয়ার করে।

—সত্যি, এমন সুন্দর জল, দেখলে নিজেদেরই স্নান করতে ইচ্ছে করে। বলে ফেলেই খুব লজ্জা পেয়ে যায় রুক্মিণী।

নদীতে স্নান করে রুম্পা-টুম্পি একেবারে খুশিতে অস্থির। কোনওদিন এর আগে ডুব দিয়ে স্নান করেনি ওরা। সমরও স্নান করে আসে। খেয়ে দেয়ে নিয়ে আবার

একটু এদিক ওদিক ঝরনাটা যেখানে নদীতে এসে পড়ছে সেখানে সমস্তটাই পাথুরে। সেখানে আর বালির চড়াও নেই, পাথরে পাথরে ধাক্কা খেয়ে জল ছুটে যাচ্ছে। তিস্তায় পৌঁছে যাবার পর যেখানটায় জল পাক খেয়ে খেয়ে ফেনা ভেঙে উঠছে। মৌসুমী বলে,

—বয়ে যাওয়া জল দেখতে আমার এত ভালো লাগে। লোকে যে কী সুখে দার্জিলিং যায়! আমাকে তো একটা কোনও নদী কি বোঝার পাশে বসিয়ে দিলে আমি সারাদিন বসে থাকব।

—আমারও খুব ভালো লাগে। আকাশের তারা দেখতেও খুব ভালো লাগে আমার। আমার স্কুলটা তো প্রায় একটা গ্রামের মতো জায়গা, সন্ধ্যের পর চারদিক খুব অন্ধকার। ন'টা বেজে গেলে মাঝরাত্তির। আমার কাছে মনু বলে একটা মেয়ে থাকে। আমি আর ও এক-একদিন ছাদে গিয়ে বসি। ওকে তারা চেনাই।

—ও বুঝতে পারে?

—সব সময়ে যে পারে এমন না। সপ্তর্ষিটা বোঝে। কিন্তু কালপুরুষ, বৃষরাশি, বৃশ্চিক, মিথুন, বৃহস্পতি, মঙ্গল—নাম তো শুনেছে। খুব আগ্রহ করে দেখে। নীহারিকা চেনে। ওরা বলে আকাশগঙ্গা।

—মেয়ে মানে কত বড় মেয়ে? সমর জিজ্ঞেস করে।

—এই আমার সমান। কি একটু ছোটই হবে আমার থেকে।

—ও তোর কাছে থাকে কেন? ঘর সংসার নেই?

—আছে ছোড়দি। তিনটে ছেলেমেয়ে আছে, মা আছে। ওর বর ওকে ছেড়ে অন্য মেয়ে বিয়ে করেছে।

সবাই খানিকটা চুপ করে যায়। একটু সময়ের জন্য অস্পষ্ট বেদনার মতো কোনও ছায়া তিনজনকে ঘিরে ফেলে। আবার উড়েও যায়। কাছেই কোথাও জমে থাকে। সমরের মনে হয় কথাটা না উঠলেই ভালো হত। রুকুকে এই দু'টো দিন এত ঝলমলে সুন্দর দেখাচ্ছে।

ফিরবার পথে গাড়ি ছাড়বার প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়ে। বড়রা তিন জনও কম বেশি ঝিমোয়। ড্রাইভারের পাশে বসে ঝিমোতে নেই জেনেও সমরের চোখ এক একবার ঢুলে আসতে থাকে।

ঘণ্টা দুই পর যখন বাড়ি পৌঁছন গেল, তখন আকাশ থেকে হালকা ঠাণ্ডা মাটির দিকে নামতে শুরু করেছে। কাল রবিবার ছুটি। তাই সকালের কোনও তাড়া নেই। আজ সমস্ত দিনটা কেটেছে চমৎকার একটা স্বপ্নের মতন। কাল রুক্মিণীর ফিরে যাওয়া। সন্ধ্যেবেলা তাড়াতাড়ি খেতে বসে ঘুমঘুম চোখে দুই মেয়ে বলতে থাকে,

—কাল যেও না ও মাসিমণি।

—আচ্ছা এখন ঘুমিয়ে পড়। কালকের কথা কাল হবে, বলে দু'জনকে শোয়াতে নিয়ে যায় মৌসুমী। বসার ঘরে খাটের ওপর বসে সমরও সেই কথাটাই আর একটু

গাঢ় গলায় বলে,

—কাল না হয় নাই গেলে, টিকিটের কোন প্রব্লেম হবে না।

রুক্মিণী দেওয়ালের কাছে বুক শেলফের সামনে দাঁড়িয়ে সারাদিনের বেঁধে রাখা বেণী খুলছিল। সে হাসে,

—আসব তো আবার। তুমিও কি ওদের মতো বাচ্চা হয়ে গেলে? বলে বইয়ের দিকে ফেরে রুকু। তার হঠাৎ করুণ হয়ে যাওয়া গলা শোনা যায়।

—যেতে কি আমার ভালো লাগছে সমরদা? কত কিছুই তো আমাদের জোর করে ভালো লাগাতে হয়!

তার পিঠের অর্ধেকটা হালকা ঢেউ খেলানো চুলে ঢাকা।

সমর হঠাৎ জড়িয়ে ধরায় সে ছটফট করে ওঠে। সমর ওর চোখের পাতায় চুমু খেতে চায়, রুক্মিণী খানিকটা জোর করে সরে যাওয়ার সমরের ঠোঁট ঘষে যায় তার ঠোঁটের সঙ্গে, অথচ সেটা ঠিক ঠোঁটে চুমু খাওয়াও নয়। রুক্মিণী খুব দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সমর খানিকটা থতমত খেয়ে বসে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে ওঠে। ওঘরে মৌসুমী টুম্পির গায়ের ওপর একটা হাত রেখে শুয়ে আছে। মা-মেয়ে দু'জনেরই চোখ বন্ধ। রুম্পা শুয়ে শুয়েই ছবির বই পড়ছে। মৌসুমী চোখ মেলে তাকায়, একটু অপ্রস্তুতের হাসি হাসে। তারপর রুম্পাকে একবার ঘুমিয়ে পড়তে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

বাথরুমে জল পড়ার শব্দ।

—রুকু কি ঠাণ্ডা জলে স্নান করছে নাকি? রুকু—বাথরুমে দরজার সামনে গিয়ে জোরে ডাক দেয় মৌসুমী।

কল বন্ধ হয়।

—স্নান করছিস নাকি তুই?

সমর বসার ঘরে ফিরে যায় আবার। রুকু কি মৌসুমীকে কিছু বলবে এক্ষুণি? সে আসলে নিজেকে ঠিকমতো বোঝাতে পারল না।

খুট করে বাথরুমের ছিটকিনি খোলার শব্দ হয় আর মৌসুমীর ব্যস্ততা থেকে বোঝা যায় স্নানই করে এল রুক্মিণী, ঠাণ্ডা জলে। খাবার টেবিলে বসে রুক্মিণী চোখের দিকে তাকিয়ে সমরের মনে হয় স্নান করেনি শুধু, বাথরুমে গিয়ে ও বোধহয় কাঁদছিল।

খেতে খেতে দু'চারটে হালকা কথা তোলবার চেষ্টা করে সে, কিন্তু বিশেষ জমে না। টেবিল ছেড়ে উঠে দু'বোনে হতে হাতে জিনিসপত্র রান্নাঘরে তোলে। টেবিল গোছায়। মৌসুমী রুকুর চুল শুকনো করে ঘষে মুছে দেয় আবার। সমর উঠে পড়ে। মৌসুমী চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে বোনের চুলগুলো আলাদা আলাদা করে ছাড়িয়ে দেয়। চুলের ভেতরটা ভেজা নয়। চুল হাতে করে জড়িয়ে খোঁপা বেঁধে মাথায় জল ঢেলেছে।

—তোর ওখানে জলের কী ব্যবস্থা?

—কুয়ো আছে।

—তুলে দেয় কে? তোর সেই মেয়েটা?

দার্জিলিং মেল ছাড়ছে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দিদিকে জড়িয়ে ধরে থেকে শেষে কামরায় ওঠে রুক্মিণী। সমর সুটকেস বার্থের নিচে ঢুকিয়ে হ্যান্ডব্যগ, জলের বোতল গুছিয়ে রাখতে রাখতে তার দিকে না চেয়েই বলে,

—রুকু, আমি কিন্তু তোমাকে কোনও কষ্ট দিতে চাইনি।

—আমি আস্তে আস্তে সে কথা বিশ্বাস করবার চেষ্টা করব সমরদা। তুমি নেমে যাও, টুম্পি ভয় পাচ্ছে—

—তুমি ভয় পেও না।

টুম্পি সত্যি ভয় পাচ্ছিল, পাছে বাবা নেমে আসবার আগে গাড়ি ছেড়ে দেয়। মৌসুমী তাকে উঁচু করে ধরে মাসির হাত ছোঁবে বলে। রুম্পা বলে,

মাসিমণি, তোমার বাগানে আমরা সামনের বছর ফরগেট-মি-নটের ডাল লাগিয়ে দিয়ে আসব।

মৌসুমী জানালার মধ্যে দিয়ে বোনের গলা জড়িয়ে ধরে,

—ভালো থাকবি। খুশি মনে থাকবি।

—খুশি মনেই থাকি দিদি, বিশ্বাস কর—খুব ভালো লাগছে বেঁচে থাকতে। কালকের দিনটার কথা অনেক দিন মনে থাকবে রে ছোড়দি।

গাড়ি নড়ে ওঠে।

বিনোদন বিচিত্রা

স্বজন বিজন

শেষপর্যন্ত সেটাই হল যেটা এড়িয়ে যাওয়া যাবে ভেবেছিলাম। অবশ্য খুব বাস্তবসম্মত ছিল না বোধহয় ভাবনাটা, প্রতিদিনই শহরে দু-চারজন করে অ্যারেস্ট হচ্ছিল। তাদের সবাই যে পার্টিকর্মী এমনও নয়, কেউ হয়তো সত্যিকারের সমর্থক আবার কারো বাড়িতে একদিন কেউ খেয়েছিল বা একরাত ঘুমিয়েছিল। তুলে নিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড মারধর করছে। রিকশাওয়ালা বা বিড়ি বাঁধা বস্তিগুলোতে এখনও ভেতরে ঢোকেনি পুলিস। সাহস করতে পারছে না হয়ত, এই বস্তিগুলোর আয়তন তো ছোট নয়, এক একটায় হাজারখানেক লোকের বাস। অজস্র সরু গলি, সুঁড়িপথ বাইরের লোক ঢুকলে তার পক্ষে নিজে নিজে চিনে বেরনো সহজ হবে না। আর একটা মস্ত সুবিধে আছে, যেমন জি এস এস বস্তির সব পুরুষরাই জি এস এস বিড়ি কারখানায় কাজ করে, চিটাডাঙা বস্তির কয়েকজন রিক্সা চালায় কিছু বাজারে মোট বয়—মানে মোটামুটি সবাই সবার সারাদিনের ঘামের, খাটুনির, খাটনি না পাওয়া হতাশার খবর আপাদমস্তক জানে। এসব বস্তির ভেতরে পুলিসকে পথ কিংবা ঘর বাতলে দেবার কেউ নেই। বস্তির ভেতরে ইনফরমার নেই। কিন্তু বস্তির বাইরে থেকে দু-চারজনকে তুলে নিয়ে গিয়েছে। চেষ্টা করলে জামিনও হয়ে গিয়েছে কারো কারো দু-চার দিনের মধ্যেই, কিন্তু জামিনে ছাড়া পেয়ে যারা এসেছে তাদের অবস্থা দেখে অন্যরা অনেকেই একটু ভয় পেয়েছে। আসলে এই ভয়টা পাওয়ানোর জন্যই ওদের ছাড়ছে বোঝা যাচ্ছে। বিধু, বিজয়দা, কালুদা, অতো ছোট ছেলে দিলীপ—এখনও পনের বছরও বয়েস হয়নি ওর—একেবারে ছেঁচে ফেলেছে যেন।

নানাজন নানাররকম খবর আনে। একবার শুনি সি আরি পি-র দুটো ব্যাটালিয়ান এসেছে, এখবর শুনি রাডনৈতিক কর্মীদের ধরপাকড় করার জন্য বিশেষ ট্রেনিং পাওয়া স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিসের একটা আলাদা দল এসেছে, তারা নাকি বেছে বেছে আমাদের কয়েকজনকেই খুঁজছে। একটা কথা ঠিক, বাইরের পুলিসে ভর্তি হয়ে গেছে শহর। যারা ধরা পড়েছিল জামিনে ছাড়া পেয়েছে তারা কজনই অন্যদের বলেছিল আমার ব্যাপারে খুব খুঁটিয়ে জিগ্যেস করেছে ওদের।

শহরে যারা অবশিষ্ট ছিল তাদের পক্ষে দরকারমত চলাফেলা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠছিল। সেই তুলনায় গ্রামে আমরা অনেকখানি খোলামেলা অবস্থায় ছিলাম। কাছাকাছির গ্রামগুলোয় কোনও বড় জোতদার নেই। ছোট কি মাঝারি জোতদাররা একসঙ্গে জোট পাকিয়ে শহরে বা বড় গঞ্জগুলোয় থাকছে। বাড়ির সামনে

পুলিসপাহারা। বন্দুকের সঙ্গে চেন বাঁধা পুলিস। ফলে গ্রাম মোটামুটি খালি।

গ্রামের পর গ্রাম সজাগ সতর্কতায় একেবারে পাঁচিলের মত হয়ে আমাদের ঘিরে রেখেছে, কিন্তু গঞ্জগুলোতেও মানুষকে উস্তন-খুস্তন করছে পুলিস। যেখানে সেখানে ঢুকে ঘরদোর ভেঙে দিচ্ছে, যাকে তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তবু একজনও ইচ্ছে করে, কোনও কিছুর লোভে আমাদের ধরিয়ে দেবার কথা চিন্তা করেনি। অত্যাচারের মুখে কেউ কিছু বলে ফেলেছে সেকথা আলাদা।

আসল অসুবিধেটা হচ্ছিল অন্য জায়গায় শহরে বা শহরের কাছাকাছি অঞ্চলের কমরেডরা খুব পরপর ধরা পড়ে যাওয়ায় পার্টি ইউনিটের যোগাযোগের সুতোটা ছিঁড়ে গেছিল। আমরা কোথাও কার কোনও খবর পাচ্ছিলাম না, খবর দিতেও পারছিলাম না এখানকার কৃষক কমরেডদের সঙ্গে থেকে অন্য কিছু কিছু গ্রামে প্রচার বাড়ানোর কাজ হচ্ছে ঠিকই কিন্তু অত্যাচারের গ্রেপ্তারের উড়ো গুজব ছাড়া শহরের আর কোনও খবর, জেলা কমিটির কোনও সমস্যা বা সিদ্ধান্ত কিছুই আমরা জানতে পারছিলাম না জেল ব্রেকের একটা প্ল্যান ছিল, শেষ মুহূর্তে সেটার কোনও খবর নেই। সুতরাম শহরে আসতেই হল ভেতরের সঙ্গে যোগাযোগের ক্যুরিয়ার যে ধরা পড়েছে সেটা জানতেও পারিনি অতো তাড়াতাড়ি আর শেল্টার চেক করার সময় ছিল না।

ঘরে তালা দেওয়া দেখে ভেবেছি চপলা খেতে গিয়েছে। ও মিউনিসিপ্যালিটিতে মেথরের কাজ করে। ওকে বাবুরা মানুষ বলে ধরেই না—এ নিয়ে আমরা আগেও নিশ্চিন্ত ছিলাম বরং বলা যায় নিশ্চিন্তটাকেই আরেকটা দরজা বলে ধরে নিতাম, না হলে একটামাত্র দরজাওয়ালা ঘরে থাকা তো কবেই ছেড়েছিলাম। জানা জায়গা থেকে চাবি নিয়ে ঘর খুলেছি। এসে পড়বে ভাবতে ভাবতে কি করে যে মেঝেতে শুয়ে ঘুমোলাম। আর সেও এমন মড়ার মতো ঘুম যে কোনও ইন্দ্রিয়ই যেন সজাগ ছিল না। জাগলাম একেবারে ঘিরে ফেলা বুটের শব্দে। তার মানে চপলাকে আটকে রেখে এই ঘরটাকে ওরা ফাঁদ হিসেবে সাজিয়ে রেখেছিল, আজ তালা খোলা দেখে ঘিরেছে। প্রথমেই প্রচণ্ড রাগ হল নিজের ওপর, বেআক্কেলে ঘুমিয়ে পড়ার জন্য। একা ছিলাম, কি করে পাহারা রাখার কথা অগ্রাহ্য করলাম। দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কা পড়েছে ততক্ষণে। ওরা দরজা ভাঙবার আগেই খুলে দিয়েছি। হুড়মুড় করে যখন ওরা ঢুকছে আমি দরজার ফাঁক দিয়ে একবার তাকিয়ে দেখলাম। তিনটে খাকি ততক্ষণে হঠাৎ কি মনে করে গলা বরাবর বেয়নেট তুলে চিৎকার শুরু করেছে।

নড়লেই গুলি করব, নড়লেই গুলি করব।

নড়ার জায়গাই বা কোথায়। খুপরিটা, চপলার রান্নার জায়টুকু তো গিজগিজ করছে বুটে। দরজার বাইরে তাকালাম। এই পাড়ার গলিগুলো আমি চোখ বন্ধ করেও দৌড়ে পার হতে পারি। মিটমিটে স্ট্রিট লাইটের আলোয় দেখা যাচ্ছে ঝকঝক করছে বেয়নেট অনেক। ওরা নিজেদের মতো যা পারছিল করছিল, আমার মাথার

ভেতর একটাই চিন্তা—এই ধরাপড়ার খবরটা অন্যদের জানাব কি করে!

ওরা বোধহয় রুটিন চেকআপ করতে এসেছিল, নাকি ভেবেছিল অন্যান্যবারের মতো এবারও কোন রকমে শেষ মুহূর্তে আমি ওদের হাতফসকে যাব। নাহলে এত সি আর পি এনেছে অথচ হাতকড়া আনেনি কেন! খানিকটা এলোমেলো মতন হয়ে আছে যেন নিজেরাই। প্রথমে চপলার কাপড় রাখার দড়িটা ছিড়ছিল, তারপর কোথা থেকে এক বান্ডিল মোটা সাদা দড়ি নিয়ে এসে হাত-কোমড় সব বাঁধল। চটি খোঁজবার কথা খেয়াল হয়নি। আজ মনে হচ্ছে কালকে আমি ভেবেছিলাম আমার মাথা খুব শান্ত আছে কিন্তু আসলে বোধহয় আমিও ভেতরে ভেতরে খুব উত্তেজিত হয়েছিলাম, নাহলে ছোট স্লিপ কাগজগুলো চিবিয়ে গিলতে অতো সময় লাগল কেন? মুখের ভিতরটা একদম শুকিয়ে গিয়েছিল। দু'হাত শক্ত করে বাঁধা থাকলে হাঁটার ব্যালান্স থাকে না। জিপটা দেখলাম গলির একেবারে বাইরে বড় রাস্তার মোড়ে টিউবওয়েলের কাছে রেখেছে। তারপর খেয়াল করলাম আরও দুটো ভ্যানও আছে। জিপে নেবে না ভ্যানে—খানিকটা টানা-হ্যাঁচড়া করে শেষপর্যন্ত জিপেই তুলল, সামনের সিটে। দুটো অফিসারের মাঝখানে।

একটু এগিয়ে জিপটা সিনেমা হলের মোড়ে পৌঁছতে দেখি জিতেনের চায়ের দোকানের সামনের বেঞ্চিতে তখনও দু-একজন বসে আছে। ডানদিকের রাস্তা দিয়ে কজন লোক কথা বলতে বলতে আসছে। তার মানে সিনেমার নাইট-শো ভাঙল। ভাল করে কিছু ভাববারও আগে, আপনা থেকে গলা নিয়ে স্লোগান বেরিয়ে এসেছে। আমি যে অতো জোরে চেঁচিয়ে উঠতে পারি সে কথা নিজেও জানাতাম না। তৃতীয়বার মুখ খোলার আগেই ডানপাশের অফিসারটা মুখের ওপর মারল। রক্তে মুখের মধ্যেটা ভরে গেল। অবশ্য আমি এমনিতেও চুপ করেই যেতাম কেননা ওদের শোনাতে পেরেছি, তাছাড়া সামনের রাস্তা ফাঁকা। তবে আমি যেটা চেয়েছিলাম খাকিরা নিজেরাই সেটা অনেক ভালভাবে করল। স্লোগান শুনে চায়ের দোকানের সামনে খাটিয়ায় বসা, গলি দিয়ে হেঁটে আসতে থাকা লোকেরা যেন হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছে। কে একজন চিৎকার করে উঠল, কাকে নিয়ে যাচ্ছে?

আর জিপের পেছনে বসা উর্দিগুলোর মধ্যে একটা গলা ভারি আনন্দ করে চেঁচিয়ে বলল—এই তোদের মীরাকে নিয়ে যাচ্ছি—কালকে লাশ নিতে আসিস।

এতক্ষণ একটা ব্যাপার পরিষ্কার হল! এত সি আর পি—এরা এখানকার নয়, পুলিশ অফিসারদের চেহারা, কথাবার্তার ধরন শুনে, মানে যে দু-একজন কথা বলল, মনে হচ্ছিল এরাও বাইরের। ভাবছিলাম আমাকে চেনাল কে! ওদের কাছে এমন কি যদি ছবিও থেকে থাকে সে তো খুব বেশি হলে কলেজের ছবি, যদিও জানি মা মোটামুটি আমার সব ছবি বাড়ি থেকে সরিয়ে ফেলেছে, তবু যদি কোথাও থেকে পেয়ে থাকে—তার সঙ্গে আমার এখনকার চেহারার তো কোনও মিল নেই। চপলার শাড়ি পরে আছি, প্রায় ওরই মতন রুক্ষ চুল জড়িয়ে বাঁধা, সিঁথি পালটে ফেলেছি,

এতদিন গ্রামে থাকা রোদেপোড়া চেহারা—তবে? চেনা কেউ না হলে ছবি দেখে বা বর্ণনা শুনে চট করে তো বুঝবে না। চিনেছে যে দেখা যাচ্ছে অথচ আমাকে একবারও কেউ নাম জিগ্যেস করেনি। তার মানে যারা সামনে যায়নি তাদেরই মধ্যে কেউ চিনিয়ে দিয়েছে। পেছন থেকে যারা বাংলায় কথা বলল তারাই কেউ? নাকি এমন কেউ যে চুপ করে আছে, যে পুলিশ নয়! চপলাকে জানল কি করে পুলিস! খুব অল্প কয়েকজন ছাড়া চপলার কথা তো আর কেউ জানে না। কে তবে? যাক্—অন্তত খবরটা চাপা যাবে না আর। কাল সকালের মধ্যে মোটামুটি জানাজানি হয়ে যাবে। কিন্তু ওরা এবার আরও গুছিয়ে বসল। বাঁদিকের লোকটা পিস্তলটা পাঁজরে লাগিয়ে রাখল, ডানদিকের লোকটা কোথা থেকে একটা কাপড় বের করে চোখ দুটো শক্ত করে জড়িয়ে বেঁধে দিল। বিশ্রী ভ্যাপসা গন্ধ কাপড়টা এত জোরে চেপে ধরেছে যে চোখের পাশের হাড়ে ব্যথা লাগছিল। বিচ্ছিরি গন্ধে বুঝতে পারছি এরা মদ খেয়েছে, কাপড়টা শক্ত করে বেঁধেছে কিন্তু ঠিকমত বাঁধতে পারেনি, নাকের পাশ দিয়ে আমি নিজের আর ওদের কোলের কাছের খানিকটা দেখতে পাচ্ছি। রাস্তাটা যত লম্বা আর জিপ যে রকম ঝাঁকুনি খাচ্ছিল তাতে মনে হচ্ছিল না যে থানায় যাচ্ছে। আজ খেয়াল হল যে কাল সেই সময়ে আমি ভয় পাইনি কেন? পাওয়াটাই কি স্বাভাবিক ছিল না? আসলে সত্যি সত্যি আমি খাকিদের হাতে ধরা পড়েছি এটা আমার যেন ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না, আর এরপর কি হবে সেই চিন্তা আর উত্তেজনায় বোধহয় ভয় পাবার কথা আমার খেয়াল হয়নি।

শেষপর্যন্ত কোনও একটা গেট দিয়ে ঢুকে গাড়িটা ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁড়াল, হাত বাঁধা বলে আমি ড্যাশবোর্ডের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম, পাশের লোকটা কাঁধের ওপর হাত দিল; চোখ বাঁধা থাকলেও ওদের মেজাজের তফাৎটা স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম। চপলার ওখানে, রাস্তার মোড়ে, জিপে তুলবে না ভ্যানে ঠিক করতে না পেরে একটা অফিসার গোছের কেউ কাঁধে হাত দিয়ে 'ওদিকে চলুন' বলেছিল। তাকে জোরে ধমকে উঠতে তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিয়েছিল। বাকিরাও খানিকটা থতমত খেয়ে 'ঠিক আছে ঠিক আছে' বলে সামলে নেয়।

কিন্তু নিজেদের এলাকায় ঢুকেছে বলেই হয়তো, আমি বুঝতে পারছিলাম, ওদের হাবভাব পাল্টে গেছে। বাঁ-পাশের লোকটা পিস্তল সরিয়ে নিয়ে হাত ধরে টেনে গাড়ি থেকে নামল—প্রায় উস্কানি দেবার মত করে। অনেকগুলো গলায় কি রকম জান্তব উল্লাসের চিৎকার শুনতে পেলাম। কয়েকটা গালাগালি। আশ্চর্য! এই লোকগুলোর কারুর সঙ্গে আমার কোনও শত্রুতা নেই, পরিচয়ই তো নেই। এরা বিদেশী পুলিস নয়, আমার ভাষাতেই কথা বলে। পরে দেখেছি কয়েকজনের বয়েসও বেশ কম, আমাদের কাছাকাছি কলেজ ইউনিভার্সিটিতেই পড়াশোনা করেছে হয়তো। অথচ নিজেদের দেশেরই একটা মেয়েকে মারতে পারবে বলে এতটা খুশি হয়ে উঠেছে! কেন? পুলিস-মিলিটারি হয়ে গেলে কি লোকের মধ্যে কোনও মেটাবলিক্যাল

পরিবর্তন হয়ে যায়?

অবশ্য এসব কোনও কথাই স্পষ্ট করে তখন মনে হয়নি। অবসরই ছিল না। চোখের বাঁধনটা খুলে দিতে প্রথমটা একেবারে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। তারপর দেখেছিলাম মাঝারি মাপের একটা জানলাবিহীন ঘর। ফাঁকা সাদা দেওয়ালে কেবল সেই অহিংসা প্রচারক নেতার একটা ছবি, একটা ন্যাড়া টেবিল, গোটা দু-তিন চেয়ার। এটা শহরের সদর থানা নয়।

চড়া শেড ছাড়া আলোয় খাকিদের চেহারাগুলো তখনও স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম না। তাদের মধ্যে থেকে একজন এগিয়ে এল। এই লোকটাকে চিনি। সাব-ইন্সপেক্টর। বাজারের কাছাকাছি বাড়ি। দুশ্চরিত্র আর মাতাল। নিজের বৌকে ধরে মারে এটা অনেকবার শুনেছি। ও আমাকে ছোটবেলা থেকে চেনে। আমার মা-বাবাকেও চেনে। এখনও যে প্রচুর নেশা করে আছে বোঝা যাচ্ছে। স্পষ্ট দেখলাম কপালের ওপর যাত্রার হিরোদের মতন চুল নামিয়ে টেরিকাটা। কোমরের খাপ থেকে রিভলবারটা হাতে নিয়ে নাচাতে নাচাতে বলল—এই এবার বল আমাদের কাছে তুই কি রকম ব্যবহার আশা করিস?

ব্যাপারটার উদ্ভটপনায় আমার সত্যি হাসি পেয়ে গেল। কি ভাবছে এই লোকটা নিজেকে? এক সপ্তাহ আগেও রাস্তায় দেখতে পেলে কোন রাস্তা দিয়ে পালাতো তার ঠিক নেই, আর আজকে দলের লোকদের সামনে যাত্রার সংলাপ বলছে। তাও আবার নিতান্ত নিচুগোছের যাত্রা। ও মুখটা এগিয়ে এনে আমার চোখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করছে কিন্তু কোনও দৃষ্টি নেই ওর চোখে। আবার সেই একই ঢঙে বলে উঠল—কি রে বল, আমাদের কাছে কি রকম ব্যবহার আশা করিস?

আর চুপ করে থাকা গেল না। বলেছি—জানোয়ারের মতো। এটা বোধহয় ওর ডায়লগে ছিল না।

তার মানে? কেন?

আপনারা জানোয়ার বলে।

এগুলোর কাল রাত্রের ব্যাপার ছিল। কালই তো নাকি পরশুর? এখন কতটা বেলা হতে পারে? সকাল না দুপুর? এই জায়গাটা বোধহয় কোনও লকআপ। দেওয়ালের উঁচুতে কাটা একটা ঘুলঘুলি দিয়ে ভেতরে যেটা এসে পড়ছে ওটা কি আলো? ঘোলাটে বিশ্রী ছায়া, অন্ধকারের চেয়েও খারাপ। আশপাশটা আবছা মতন বোঝা যায় কিন্তু কিছু দেখা যায় না। আলো না বলে ওটাকে বোধহয় অন্য কিছুই বলা উচিত। এখান থেকে ঘুলঘুলিটা দেখাও যাচ্ছে না। আসলে যে দেওয়ালটা ঘেঁষে আমি পড়ে আছি তারই একেবারে ওপরদিকে কাটা ওই ফোকরটা। যদি একবার কোনও রকমে গড়িয়ে ওপাশে যেতে পারতাম তাহলে কি দেখা যেত? কি হবে দেখতে পেলে? তবু মনে হচ্ছে ওটা যেন এক্ষুণি একটা ভারি দরকারি কাজ, এই কথাটা জানা যে ভেতরে আসা আলোটা এত ঘোলাটে কেন—কাচটা হলুদ নাকি

নোংরায় ওরকম হয়ে গেছে। কিন্তু পারছি না। এটা আমার শরীরই নয়, এত ভারী, কেবল যন্ত্রণার একটা বান্ডিল। মনে হচ্ছে এটাও সদর থানা নয়। সদর থানার ভিতরের লকআপটা থেকেও বাইরের রাস্তা একটু একটু দেখা যায়, এটার সামনে তো কেবলই একটা ঢাকা বারান্দা—তার ডানদিকে ভেজিয়ে রাখা একটা দরজা। বাঁদিকটা আমি দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু সেটা যে রাস্তা নয় সেকথা বুঝতে পারছি। মাথা ফিরিয়ে দেখবার চেষ্টা করলাম। মাথাটা মনে হচ্ছে লোহা দিয়ে তৈরি। তোলা গেল না। ধরে নিয়ে এসে ওরা এত খুশি হয়েছিল! ভাবতেই পারেনি বোধহয় যে পেয়ে যাবে। বার বার যেমন হয়েছে—যাবে, হই-হুজ্জোত করবে, শেষপর্যন্ত পাবে না—এ রকমই ভেবে গিয়েছিল মনে হয়। তাই হাতকড়া পর্যন্ত নিয়ে যায়নি। সারা রাস্তা এমন হৈ-চৈ করতে করতে এল যেন একটা যুদ্ধ জয় করেছে। তবু যদি না দু-গাড়ি সি আর পি নিয়ে যেতিস! কিন্তু চপলার ঘর চেনালো কে? সে আর কি কি চেনে? কে হতে পারে? চপলার কি হল? তাকে কোথায় রেখেছে?

কাল ওরা কোনও প্রশ্ন শুধোয়নি, কিন্তু জানবার চেষ্টা করেনি, কেবল একবার সার্চ করে দেখেছিল বোমা-পিস্তল কিছু আছে কি না। আমার কাছে কোনও দিন ওসব কিছু থাকে না এ কথাটা স্পষ্টই বিশ্বাস করল না। বলল—আজ হয়তো আনিসনি, তোর কাছে দুটো পিস্তল থাকে আমরা জানি।

কি বলব! ওদের বুদ্ধি বলে মানুষ খুন করার যন্ত্রপাতি সঙ্গে থাকাই আমাদের ভয় না পাবার কারণ। অথচ সুবোধকে যখন ধরেছিল তখনও তো দেখেছিল ওর কাছে ছিল কেবল গুলি ফুরিয়ে যাওয়া যাচ্ছেতাই ধরনের একটা পাইপগান। এটাও দেখেছিল দু'দিন প্রায় কিছুই না খাওয়া একচল্লিশ বেয়াল্লিশ কেজি ওজনের ছেলেটার সাহস কতখানি। আসলে গ্রামে শেষ দু'দিনে প্রায় কিছুই খায়নি ওরা, সজনেপাতা সেদ্ধ ছাড়া, তার ওপর মাঠে অতো কাদা—ওর পা আটকে যাচ্ছিল—এসব মিলেই হয়তো ধরা পড়েছিল সুবোধ। জি এস এস বস্তির কালুদার বৌ ওর জন্য রুটি করে নিয়ে নাকি বসেছিল সন্ধ্যে পর্যন্ত। তারপর শুনেছে। আমাদের সত্যিকারের সাহস আর ভরসা যে কোথায় এটা তারা কি করে বুঝবে যারা চাকরি হিসেবে বিনা কারণে অপরিচিত ছেলেমেয়েদের, লোকেদের ওপর অত্যাচার করে? তাই আমার কাছে কোনও অস্ত্র নেই দেখে মনে হয় ওরা একটু হতাশ হয়েছিল। জিপ থেকে নামিয়ে বোধহয় আর দশ মিনিটও দেরি করেনি, আমার হাত সেই ভারি দড়িটা সুদ্ধই পেছনে বাঁধা ছিল—ওরা কোমর থেকে বেল্ট খুলছিল। দু-একজনের হাতে বোধহয় বেটন ছিল। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম ওদের দাঁত বেরিয়ে এসেছে, চোখ রাক্ষসদের মতো, ওদের হাত উঠছে নামছে ঠেলাঠেলি করে। বেল্টগুলো যে আমারই গায়ে পড়ছে একটু পর থেকে যেন আর বুঝতে পারছিলাম না। এই কথাটা আগে কতবার শুনেছি, কাল দেখলাম, গায়ে ব্যথা পাওয়ার একটা চরম জায়গা আছে, সেটা পেরিয়ে গেলে আর ব্যথা পাওয়া যায় না। তাছাড়া যখন তোমার হাতও বাঁধা, কোনও দিকে

কোনও ব্যালান্স নেই, আর ওরকম দিগ্বিদিকশূন্য হয়ে আছড়ে পড়ছে আক্রমণ—তখন বোধহয় ভেতর থেকেই এক রকম মার খেয়ে যাওয়ার মন তৈরি হয়ে যায়। যখন মাটিতে পড়ে গেছি, ওরা বুট দিয়ে লাথি মেরে সারা ঘরে আমাকে ছিটিয়ে ফেলছে, যখন কে যেন আবার চুল ধরে টেনে দাঁড় করাল, আমি ঝাপসা ঝাপসা দেখতে পাচ্ছিলাম একটা বেল্ট দেওয়ালে ছিটকে লাগল, দেওয়ালে লাল ছাপ পড়ে গেল। আমার চোখের সামনে মাথার ভেতর ঘোলাটে লাল পর্দা পড়ে যাচ্ছিল। কখন সে সব থেমেছিল, কে আমাকে এখানে আনল, কখন আনল—কিছুই জানি না। স্পষ্ট করে অন্য কিছুই মনে করতে পারছি না অথচ ঘরটায় ঢুকিয়ে আমাকে যখন প্রথম টেবিলের কাছে দাঁড় করিয়েছিল তখন টেবিলে একটা কাগজ পড়েছিল সেটা যে দৈনিক বসুমতী সেটা পরিষ্কার মনে আছে। যন্ত্রণা হচ্ছে বলে এখন রাগ হচ্ছে নিজের ওপর। খাকিরা তো এসব করবেই, আরও কত কি করবে কে জানে! কিন্তু তাতে আমার শরীর এরকম অনড় হয়ে যাবে কেন? এ যেন ওদের কাছে হার মানা, লজ্জার। একজন বিপ্লবীর শরীর, সেকি তার দলে না খাকিদের দলে? কেন তুমি মাথা সোজা করে তাকাতে পারছ না? তোমাকে দেখে ওরা বুঝতে পারছে যে অত্যাচার করে তোমাকে ওরা কাহিল করতে পেরেছে। ছি!

এই লকআপে কিন্তু আমি একা নই, সেটা এতক্ষণে বুঝতে পারলাম। এখন অনেকটা সয়ে গেছে। এতক্ষণ মনেই আসেনি যে এখানে আর কেউ থাকতে পারে, এখন আবছা আবছা মনে হচ্ছে আমার পায়ের দিকে খাকি দুরে ওইপাশে কে যেন কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। একবার কোনও শব্দ করতেও শুনিনি। ও কি চপলা? বেঁচে আছে তো? নড়ছেও না। চপলাকে ওরা খুন করে ফেলেনি তো? ও কি অন্য কোনও সাথী? একটু যদি উঠতে পারতাম—

কে এত জোরে জোরে শব্দ করছে? কি বলছে? খাবার নিতে বলছে? আমি তো খাবো না। আমার খিদে পায়নি। জল খাব। বলছি তো জল খাবো, শুনতে পাচ্ছে না? হ্যাঁ পেয়েছে। গরাদের ফাঁক দিয়ে একটা টিনের গ্লাস এগিয়ে দিল। দাঁড়িয়ে আছে গ্লাসটা নিয়ে যাবে বলে। দাঁত বের করে হেসে বলল—খেয়ে নাও, তোমার এখনও অনেক বাকি।

এখানে সবাই হাসলে কি রকম বড় বড় দাঁত দেখা যায়।

আজকের দিনটা কতক্ষণ ধরে চলছে। ঘুমও আসছে না, স্পষ্ট করে কিছু ভাবতেও পারছি না। আমার ধরা পড়ার খবরটা পৌঁছবার পর কাজগুলো কিভাবে ভাগ করবে? এটাও নিশ্চয়ই জানাজানি হয়ে গেছে যে চপলার ঘরটা ফাঁদ হয়ে গেছে। কে করল সেটা কি বার করা যাবে? আমার গ্রামে খবরটা পৌঁছলে গ্রামের সাথীরা মন খারাপ করবে কিন্তু গ্রাম কমিটি নিশ্চয়ই সামলে নেবে প্রচারের আর যোগাযোগ রাখবার কাজ। পরিষ্কার করে কিছু ভাবতে পারছি না, মাথাটা খুব ভারী।

তবু এখন বসেছি দেওয়ালে হেলান দিয়ে। লকআপের মধ্যেই ওপাশে বাথরুম,

এখন বিশ্রী গন্ধও পাচ্ছি। যে ওপাশে শুয়ে ছিল সে চপলা নয়। উঠে আস্তে আস্তে হেঁটে বাথরুমে গিয়েছিল, আমার দিকে তাকিয়েছিল কিন্তু কথা বলেনি। তার সমস্ত মুখ খুব ফোলা। মেঝেতে পা ফেলেছিল খুব কষ্ট করে। কিন্তু একা নয়, ওখানে ওরা দুজনে শুয়ে আছে জড়াজড়ি করে কাপড় ঢাকা দিয়ে। এই যে যাকে আমি দেখলাম, সে যখন উঠে গেল, তখনও একজন শুয়েছিল। একে দেখে আমার মনে হল ও গ্রামের মেয়ে। কিন্তু কথা বলল না। আমিও ওর চোখের দিকে তাকিয়ে চোখ দিয়ে কথা বলার চেষ্টা করলাম।

পা মেলে বসে আছি আর কি রকম অদ্ভুত দেখাচ্ছে। এখানে এই ছিঁড়ে যাওয়া জামাকাপড়, আঁকিবুঁকি রক্তের দাগের মধ্যে পায়ের পাতায় মেহেদির নকশা। একটা আঙুলে রুপোর চুটকি। এগুলো শহরে ঢুকবার আগে মেহজবিনের মা পরিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, দিন বেলাবেলি চলে যাও। রিকশার সামনে পর্দা ফেলা থাকলে আর তলা দিয়ে মেহন্দি দেখা গেলে ভিড়ের রাস্তায় কেউ নজর করবে না।

ঠিকই বলেছিল। অভয় আমাকে নামিয়ে দিয়ে গলির মোড় থেকে চলে গেল, আমি গলিটা ঘুরে পেছনদিক দিয়ে সন্ধ্যের মুখে ঢুকেছিলাম। এরকম তো আগেও এসেছি। এবারে গোলমাল একটাই হয়েছিল, আমি যে এসেছি সেকথা বস্তির কেউ জানেনি। জানলে ওরা যে কোনওভাবে আমাকে খবর দিত। চপলা যে আসবে না আমি জানব কি করে! আসলে খুব বেশি আত্মবিশ্বাসের জন্যই অসাবধান হয়েছিলাম। অন্যায় তো নিশ্চয়ই করেছি। আমার খবর অবশ্য খাকিরা নিজেরাই দিয়ে এসেছে। কি বলছিল ওরা, 'কালকে লাশ নিয়ে আসিস!' এখনও তো বেঁচেই আছি। ওটা কি ঠিক করে রেখেছে নাকি? রাত্রে—? আমি কি ভয় পাচ্ছি? না, পাচ্ছি না, অনেকবার ভেবে দেখেছি কাল ঘুম ভেঙে যাবার মুহূর্ত থেকে। মরায় ভয়ের কিছু নেই। বরং আজ এখানে আমাকে মারলে কাল এই শহরে খাকিদের রাস্তায় বেরোন মুশকিল হবে। অন্যদেরও সাহস বাড়বে। হ্যাঁ, অত্যাচার করে যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে মারে ওরা, জানি। ভিয়েতনামে মেরেছে, কঙ্গোয় লুমুম্বাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খুন করেছিল। তার আগে ফ্যাসিস্তরা। ওরা অত্যাচার করবার বৈজ্ঞানিক ট্রেনিং নেয়। মানুষ হয়ে! আচ্ছা এ সবের পরে ওরা বাড়ি গিয়ে পোশাক পাল্টে স্নান করে বসে বাড়ির লোকেদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করে? বাচ্চাদের কোলে নেয়? যে অফিসার দিলীপকে ওরকমভাবে মেরেছিল সে সেদিনও নিজের ছেলের সঙ্গে হেসে কথা বলেছিল? কি করে কেউ বলবে এটাকে ভালো কিংবা স্বাভাবিক? মায়ের কাছে শুনেছি স্বাধীনতার আগে ইংরেজের পুলিশ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ওপর বীভৎস অত্যাচার করত। সেইসব পুরনো নিয়মেই কি পুলিশেরা এখনও চলে? তাহলে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অতো লড়াই করে কি ফল হল? আমরা এসব পাল্টে ফেলতে চাই। মানুষ মানুষের মত থাকবে, জন্তু-জানোয়ারের মত হবে কেন?

যদি অত্যাচার করে যন্ত্রণা দিয়েই মারে—তাই হবে। নিজেকে বাঁচানোর জন্য

আমার তো আর কিছু করার নেই! আমি কমিউনিস্ট পার্টি করা পরিবারের মেয়ে, দেশের জন্য প্রাণ দেবার কথা শুনতে শুনতে বড় হয়েছি, মরতে ভয় পাই না। কেবল আমার অনেক কথা বুঝে নেবার ছিল। বাইরের কাউকে জিগ্যেস করা যায় না, ভেতরের লোকদের জিগ্যেস করলে ঠিক জবাব পাই না, ভেবেছিলাম নিজেই আস্তে আস্তে বুঝে নেব—একা বুঝতে না পারি আশপাশের সমবয়সী সাথীদের সঙ্গে কথা বলব। বড়রা যে সব কথা বলেন সে সব তাঁরা নিজেরা মেনে চলেন না কেন? জিগ্যেস করলে রেগে যান। আমার বাবা সারাজীবন পার্টি করেছেন, জেল খেটেছেন, কোনও দিন নিজের ঘরদোর সংসারের দিকে ফিরে তাকান নি। সবাই আমার বাবাকে খুব শ্রদ্ধা করে, মানে। কিন্তু তাহলে আমরা ছ-ভাইবোন হলাম কেন? একটু বড় হয়ে, ব্যাপারগুলোর মানে বুঝতে শেখার পর একদিন মাকে জিগ্যেস করেছিলাম। মায়ের মুখ প্রথমে লাল হয়ে গেল তারপর আমাকে এক চড় মেরেছিল মা। কিন্তু তাতে কথাটার জবাব ছিল না। অথচ আমার মনে বেশ গর্ব ছিল, এখনও আছে, যে অনেকেরই বাবা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয় কিন্তু আমার মাও পার্টি সদস্য। আমি রাজনীতি করা জেল খেটে আসা মায়ের মেয়ে। তবু প্রশ্ন তো থেকেই গিয়েছে।

মা-বাবা সব সময়ে বলত রুশ দেশে, চীন দেশে ছেলেমেয়ের সমান অধিকার, সমান সম্মান, বলত একজন পার্টি কর্মীর ক্ষেত্রে ছেলে কি মেয়ে, এ প্রশ্ন অবান্তর, অথচ আমি বস্তির শেল্টারে ছেলেদের সঙ্গে একঘরে ঘুমিয়েছি শুনে বাবা এত খারাপ কথা বলেছিল যে আমি বিশ্বাস করতে পারিনি এই বাবাকে আমি ছোটবেলা থেকে চিনি বলে। সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন মনে আসে আমার দিদির জন্য। দিদিকে আমি ভীষণ ভালবাসি। দিদির জন্যই আমার বড়দের ওপর সবচেয়ে বেশি রাগ হয়। সেই ব্যাপারগুলোই আমি বুঝতে পারি না আর আমার মনে হয় বড়রা মুখে যা বলেছে কাজে তা পালন করেনি। দিদি যখন মায়ের পেটে তিন মাসের, তখন মা জেলে যায়। পার্টি তখন বেআইনি ছিল। মা কিন্তু সকলের সঙ্গে সমানে কাজ করেছে, ডায়মন্ডহারবারের দিকে গ্রামে গিয়ে থেকেছে। আমি ভেবে পাই না মা আন্ডারগ্রাউন্ড থেকেই কাজ করবেন—এত বড় সাহসী সিদ্ধান্তটা নেওয়ার পরও দিদি মায়ের পেটে এলো কেন? এটা কি মায়ের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক ছিল না? যখন এসেই পড়ল তখন মাকে একটু সাবধানে রাখবার কথা কেউ ভাবল না কেন? যে মিছিলে লাঠি বা গুলি চলতে পারে, যেখান থেকে অ্যারেস্ট হতে পারে সেখানে মাকে নিয়ে যাওয়া হল কেন? কাকদ্বীপের অহল্যার কথা বলা হয়, অহল্যা কৃষকের বৌ ছিল, তাদের ওখানে সরাসরি যুদ্ধ চলছিল। তাছাড়া সেও কিন্তু ভারী শরীর নিয়ে নিজের গ্রাম কি খেত ছেড়ে অন্য কোথাও যায়নি। আমি নিজে দেখেছি গ্রামের মানুষ, খুব গরিব মানুষ প্রথমবার গর্ভবতীকে যথাসাধ্য সাবধানে যত্নে রাখে, কেননা বাচ্চাটি জন্মাবে আর যে জন্ম দেবে—দুজনকেই মূল্যবান মনে করা হয়। আমার মাকে আমার দিদিকে কেন তা মনে করা হল না? ওই শরীর নিয়ে অন্যদের সঙ্গে

মাও বারো দিন ধরে জেলে অনশন করল। আমার দিদি যে অপুষ্ট ব্রেন নিয়ে জড়বুদ্ধি হয়ে জন্মালো সেটা তাহলে কার দোষে? দিদির? কেউ জেনে বুঝে কষ্টকে বরণ করে নেয় সে কথা আলাদা। কিন্তু জন্মানোর আগে থেকেই যে নিজের লোকেদের অবিচারের শিকার হয়েছে? যারা পৃথিবীর সমস্ত নিপীড়িত মানুষকে ভালবাসার কথা বলে তারা নিজেদের স্ত্রীকে, বাচ্চাকে, কমরেডদের বাচ্চাকে ভালবাসবার তাদের যত্ন নেবার কথা চিন্তা করেনি! আর এই ঘটনাটাকে, অন্যায়কে, একজন পার্টি সদস্যের উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে দেখায়। মা-বাবা তো এখনও পার্টি করে কিন্তু দাদারা, ছোড়দা ছাড়া দুজনেই তো, ভাল চাকরি করে। মেজদির বিয়েও তো সাধারণ আর পাঁচজনের মতই হল। চাকরি করা ছেলে দেখে। শাঁখা-সিঁদুর পরে ঘোমটা দিয়ে সংসার করে মেজদি, এক বছর পর একবার আমাদের বাড়িতে আসে দু-তিনদিন থাকবার জন্য। শুধু দিদি—দিদিই বাড়িতে এখানে-ওখানে বসে থাকে, পরিষ্কার করে কথা বলতে পারে না, গুছিয়ে জামাকাপড় পরতে পারে না, লেখাপড়া শিখতে পারেনি—ও জড়বুদ্ধি। আমি আর ছোড়দা ছাড়া কেউ দিদিকে ভালবাসে না। বাবাও না। বাবা বিরক্ত হয়। বাড়িতে লোকজন এলে আগে ওকে সরিয়ে রাখা হত। ও যেতে চাইত না, মুখে গোঁ গোঁ করে আওয়াজ করত। আমরা যখন ছোট ছিলাম, বাইরের ঘরে লোকজনের সামনে আমাকে বাবা আবৃত্তি করতে বলত। আমি তখনই সুকান্তর, বিমল ঘোষের লম্বা লম্বা কবিতা মুখস্থ বলতে পারতাম। তখন দু-একবার দিদিকে ঘরে বন্ধ করে রাখতে দেখেছি। একটু বড় হবার পর দুটোই বন্ধ করে দিলাম—কবিতা শোনানো আর দিদিকে বন্ধ করে রাখা। মা ভালবাসে দিদিকে—অনেক সময় দিদির চুল বেঁধে দিতে, খাইয়ে দিতে বসে মাকে চোখের জল মুছতেও দেখেছি। কিন্তু বাবার বা অন্য কারও সামনে কোনও দিন দিদির মাথায়ও হাত দেয় না। অনেক সময় একা একা বলে—আমি মরলে এই শত্তুরের কি হবে?

অথচ কেন ছোটবেলায় চিকিৎসা করায়নি! আমাদের তো ভাল ভাল স্কুলে পড়িয়েছে। আমরা এসব কথা, আরও অন্য অন্য কথা মুখের ওপর বলি বলে বাবা ইদানীং আমাকে ছোড়দাকে আর সহ্য করতে পারত না। বিশ্রী তর্কাতর্কি হত। আমার বাড়ি ছাড়ার অশান্তিটা মাকেই সহ্য করতে হয়েছিল। বাবা মাকে একগাদা বাজে কথা বলল, মায়ের শিক্ষাতেই নাকি আমি এরকম উচ্ছৃঙ্খল হয়েছি। অথচ বাবাদের আদর্শে নাকি ছেলে আর মেয়েতে তফাৎ নেই। অথচ ছোট থেকে বাবার প্রশ্রয়ই আমি পেয়েছি বেশি।

মায়ের কথা বেশি বেশি মনে হচ্ছে এখন। গ্রামে কি বস্তিতে ওদের বৌরা যখন ডালের জলের মধ্যে আটার দলা সেদ্ধ করে খেতে দিত, তারপর গালাগালি খেত, মারও খেত কেউ কেউ, তখনও কি জানি কেন হঠাৎ মায়ের কথা মনে হত। আবার ওসব জায়গার মায়েরাও প্রায়ই বলত—কোন মায়ের কোল খালি করে আসছে? তোমাদের মায়েদের মন জানি কত কানতেছে।

মাকে কি এতক্ষণে খবর দিয়েছে কেউ? ব্যথা লাগলেই 'মাগো' বলে ওঠে কেন লোকে?

কেউ কোথাও নেই দেখে ওই শুয়ে থাকাদের মধ্যে একজন আস্তে আস্তে উঠে এল। যাকে দেখেছি এ সে নয়। এসে আমার মাথায় হাত রাখল। ফিসফিস করে কথা বলল। খড়্গপুরের কাছের গ্রাম থেকে এসেছে ওরা মা-মেয়ে। ওর নাম খাঁদি। ও কিছু জানে না। দু'বছরের মেয়েকে নিয়ে মায়ের বাড়ি এসেছিল সেদিনই সকালে। ওর মা হয়তো মিহির রাণার শেল্টার জানে। ওর মায়ের পায়ের তলায় খাকিরা আলপিন ঢুকিয়ে দিয়েছিল। বলেছে, আজ কথা না বললে আজ রাতে দুজনকেই কেটে ফেলবে। যাতে এক কোলে একসঙ্গেই মরে তার জন্য মা আর মেয়ে জড়াজড়ি করে এক জায়গায় গলা দিয়ে শুয়ে আছে। আমার একবার আশ্চর্য লাগল যে ওরা এককোপে গলা কেটে ফেলবার কথা বিশ্বাস করে আছে অথচ একবারও কথাটা বলে দিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করছে না!

কমরেটরা ভগবান, তাদের সঙ্গে কি বিশ্বাসঘাত করতে হয়?

বলল ও। বছর কুড়ি হয়তো বয়েস। টিয়া রং শাড়ি পরা। চোখ গর্তে ঢুকে গেছে, ঠোঁট শুকনো। ওর স্বামী হয়তো আবার বিয়ে করবে। অনেক কিছু সাধ ছিল, হল না। আমাকে জিগ্যেস করল, তুমি কি কমরেট? তারপর নিজেই বলল, তুমাদের জিত হবেই। এত পাপ মা বসুমতী আর সইতে লারছেন। হামদের গাঁয়ে সবজনা তুমাদের দলে। নিশ্চয় জিত হবে।

ওকে দেখে এক ঝলকে সেই মেয়েটার কথা মনে হল যার কথা সুনীল এসে বলেছিল যাকে আমি দেখিনি। সুনীল যে গাঁয়ে গেছিস সে গাঁয়ের বড় জোতদারের বাড়িতে গোয়াল কাড়ত—দাস ছিল মেয়েটা। চোদ্দ-পনের বছরের সেই মেয়ের বাবা জোতদারের ধার শোধ করতে পারেনি বলে মেয়েটাকে ওদের ঘরে দিয়ে আসতে হয়েছিল। সেই মেয়েটাকে লোকটার সমস্ত রকম অত্যাচার থেকে বাঁচাবার জন্য ওদের বাড়ির বাগান মানে গরুর রাখাল বলেছিল সুনীলকে। কিছু করবার আগেই কে জানে কি সন্দেহ করে মেয়েটাকে মেরে তারা গলায় দড়ি বেঁধে গোয়ালের আড়ায় টাঙিয়ে দিয়েছিল। ক'দিন খুব মন খারাপ হয়েছিল আমাদের সবার। 'পাপের' আর আমরা কতটুকু জানি! খাঁদি অনেক বেশি জানে।

রাত্রেও খাবার দিতে এসেছিল।

নরকেরও নিয়মকানুন থাকে, ঘড়ি থাকে।

শুনতে পাচ্ছি গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ হচ্ছে। ওগুলো কি এখানে এসে থামছে? আরও কাউকে ধরে আনল? এক-দুজন সেন্ট্রি আর ওই খাবার দেবার লোক ছাড়া কাউকেই আর দেখিনি সারা দিনে! এই জায়গাটা কোথায়? কি করে সাথীরা জানবে আমরা কোথায় আছি? কোথায় একটা পেটা ঘণ্টা বাজল ঢং ঢং করে। কটা বাজল বুঝতে পারলাম না।

আরও অনেক পরে লকআপের দরজা খুলল। আমাকে নিতে এসেছে। ওপাশে খাঁদি বাউরি আর ওর মা জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে। আর হয়তো ওদের দেখব না। কেউ জানতে পারবে না আমার কথা যে আমি ভয় পাইনি। কিংবা অনেক দিন পর জানবে—যখন এই সব জায়গা ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন।

আজকে হ্যান্ডকাফ পরাল। পুলিসটা হ্যান্ডকাফের অন্য মাথাটা ধরে সামনে সামনে যাচ্ছে। অন্য একটা খাকি জামা পাশ দিয়ে চলে গেল। প্রায় নিঃশব্দ স্বর—ওখানে জল খাবেন না, ঘুমের ওষুধ আছে।

কোন জল? কেন ঘুমের ওষুধ? সে সব ভাবছি না।

তার মানে, এখানেও আছে।

কেউ কেউ আছে যারা আমাদের সকলকে দেখছে। চোখে চোখে রাখছে। আমাদের কথা মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে।

আমার আর একটুও ভয় করছে না।

নরকের ভিতর দরজার দিকে যাচ্ছি কিন্তু একা যাচ্ছি না।

যুদ্ধপর্ব

পুরনো বাসন

ঠং করে একটা ঘা দিয়ে পুরনো বাসনের ধাতু যাচাই করে লোকটা। পেতলের সুঠাম ভারী জগটা ফেটে যায়। শব্দটা তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা হয়ে দোতলার গ্রিল ঘেরা বারান্দা পর্যন্ত উড়ে এসে গেঁথে যায় সরোজনলিনীর বুকে। দম আটকে আসে যেন ব্যথার তীব্রতায়। লোকটা হেলাভরে সদ্যকেনা পুরনো বাসনপত্র বস্তায় পুরে নিয়ে গেট পেরিয়ে চলে যায়।

গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা ন'বছরের নাতনি তিন্নি শুধোয়,

—এত এত বাসন নিয়ে ওরা কি করে দিদুন?

—দোকানে বিক্রি করে দেয়।

—দোকানদার কি করবে ওগুলো দিয়ে? ওগুলো তো পুরনো বাসন, ও তো আর কেউ কিনবে না! মা বলছিল এখন নাকি আর কেউ ওই বাসনে খায় না। স্টিলের আর কাচের সুন্দর সুন্দর বাসন পাওয়া যায়। তবে আর কি করবে দোকানদার, বলো না দিদুন?

—কারখানায় দিয়ে দেবে। তারা ওগুলো গলিয়ে নতুন জিনিস বানাবে—খেলনা ফুলদানি এইসব।

—তোমার জগটাকেও গলিয়ে ফেলবে? এমা—তুমি কাঁদছ দিদুন? কেন কাঁদছ? তোমার কষ্ট হচ্ছে?

—হ্যাঁ দিদি, ওই জগটা আমাকে তোমার দাদু কিনে দিয়েছিল তো! তাই একটু কষ্ট হচ্ছে।

—আমারও কষ্ট হচ্ছে দিদুন, ওকে গলিয়ে ফেলবে বলে। তাহলে ওই জগটা আর এক্কেবারে থাকবে না তো! —তিন্নি দু'হাতে দিয়ে ঠাকুমার গলা জড়িয়ে ধরে। একটুক্ষণ কী চিন্তা করে, তারপর বলে ওঠে,

—জানো দিদুন, ওদিকের রাস্তায় যে খুশিদিদিরা থাকে না গো, ওই যাদের বাড়িতে আতাগাছ আছে, ওরাও সেদিন কত পিতলের থালা বাটি বাসনঅলাকে বিক্রি করে দিল, বলল পুরনো হয়ে গেছে। —আর জানো, খুশিদিদি বলছিল কি ভাঙা পিতলের বাটিতে জল রেখে নাকি জলতরঙ্গ বাজায়!

এবারে সরোজনলিনী হেসে ফেলেন।

—দূর! ও তোমাকে খ্যাপাচ্ছিল—

—হ্যাঁ তো। শুনতে পেয়ে কাকিমা এক বকা দিয়েছে তখন বলছে খ্যাপাচ্ছিলাম।

ওর মামা না রেডিওতে জলতরঙ্গ বাজায়!

কাল সকালের সেই কথা নিয়ে বিকেলে চা দিতে এসে সুমনার মুখ গম্ভীর।

—মা, ওই পুরনো পিতলের জগটা আপনাব খুব প্রিয় ছিল বলেননি'তো কখনও!

সরোজ বুঝতে পারেন নি। সহজভাবেই বলেছিলেন,

—কোনদিন তো কথা ওঠেনি! আর, সংসারে কোন্ জিনিসটা আর প্রিয় নয় মা? সবই তো যত্ন করে করা, যত্ন করে রাখা—

—না, তিন্নি ঘরে গিয়ে কান্নাকাটি করছিল, আপনি নাকি কাঁদছিলেন ওটার জন্য। আমি তো জানিনা, আমি দেখলাম পড়ে আছে, কীরকম কালোমতো হয়ে গেছে, ব্যবহারও হয়না—

—থাক, যা গিয়েছে, গিয়েছে। মানুষই থাকে না—তার আর জিনিস!

—না তা নয়। আমাকে যদি বলতেন আমি সাজিয়ে আপনার ঘরে রেখে দিতাম।

সরোজ বলতে পারতেন তোমাদের কারও কি কখনও সময় হয় আমার কাছে এসে দু'দণ্ড বসবার যে আমি কিছু বলব? আমি কি তোমাদের ডেকে বলতে যাব? বললেন না। আজ এই দু'বছর হল এতদিনের সঙ্গী মানুষটাও ছেড়ে গিয়েছেন, এখন আর কাকে কি বলবেন? কষ্ট কি জিনিসের জন্য? কতটুকু জিনিস আর তাঁর নিজের এখন দরকার হয়? কষ্ট তো স্মৃতির! এসব কিছুই বললেন না। যে কথায় যে কাজে কোথাও কোন আঁচ বেড়ে ওঠে সেসবে কীরকম ভয় হয় তাঁর। কোন কথার মানে ব্যাখ্যা করে বলা যেন কৈফিয়ৎ দেবার মতো। দূরত্বের এপার-ওপারে যখন পরস্পরকে বুঝতে পারে না লোক তখনই তো কথা বলে বোঝানোর প্রশ্ন এসে পড়ে। তখন কীরকম অসহায় লাগে।

আজ এই সকালে বারান্দায় বসে সামনের বিলটার দিকে তাকিয়ে বসে আছেন সরোজ। সন্তু বোধহয় নিজের ঘরে। সুমনা রোজকার মতো একবার জিজ্ঞেস করে গিয়েছে—কী রান্না হবে মা? তিনিও রোজকার মতোই বলেছেন—দ্যাখো কি আছে, সেই মতোই কর।

এখন সামনের ওই কচুরিপানা ঢাকা বিলটার দিকে তাকিয়ে নানান কথা মনে পড়ে সারাদিন। আজ ছাপান্ন বছরের সংসার। কতরকম ওঠাপড়া, কত দুঃখ, কত আনন্দ যে পার করলেন জীবনে! আনন্দের তুলনায় দুঃখই যেন অনেক অনেক বেশি। জীবনটাকেও মনে হয় একটা বড় পুকুরের মতো। কেবল দুঃখের জলেই ভরা আনন্দ কেবল যেন কখনও-সখনও একটা মাছের ঘাই মেরে ওঠা। একই রকম সমস্তটা জীবন, সংসারের চাকায় ঘুরতে থাকা। মাঝে মাঝে মনে হয় এমন মূল্যবান মানুষজন্ম পেয়ে কীই-বা লাভ হল! আর এখন তো এই পুকুর জল মাছ সবই চাপা পড়েছে কচুরিপানায়। জল যে আছে নিচে তাই বোঝা যায় না! তাঁর নিজের জীবনও

কি তাই নয়? সুখ দুঃখ কোনওকিছুরই কোনও মানে নেই আর। কোনওরকমে কেবল দিন পার করে চলা। এ সংসারে তাঁর যা কাজ ছিল, সে তো মিটেছে। কাজ কি মেটে সত্যি? কিন্তু পরের কালের মানুষদের হাতে ছেড়ে দিতে হয়।

সুমনা এসেছে সংসারে, তাঁর ছেলের বৌ। ভালোমেয়ে—নানারকম কাজ জানে, লেখাপড়া জানে, বেশ গান গায়। সে বড় হয়েছে অন্যরকম পরিবেশে। নিজের সুবিধেমতো করেই কাজকর্ম গুছিয়ে নেবে। নতুন নতুন নিয়মকানুন তৈরি হয়ে উঠেছে সংসারে, দেখা দিচ্ছে নতুন নতুন রুচি পছন্দ। তাঁর নিজের বহুদিনের অভ্যস্ত পছন্দগুলো জায়গা ছেড়ে দাঁড়াচ্ছে একে একে।

অবশ্য একা সুমনার কেন, চারপাশের সমাজেরই তো রুচি বদলাচ্ছে। ধীরে সুস্থে, চিকণ সুন্দর করে কাজ করার অভ্যাস চলে যাচ্ছে মানুষের। সস্তু বলে সময় নেই। সুমনাও বলে তাই,

—ধরে ধরে একটি একটি তরকারির জন্য আলাদা রকম করে আলু-পটল কাটবে এত সময় কোথায় মা? আর কেই-বা দেখতে আসছে আলাদা করে কাটা? সবই তো দশমিনিটে চিবিয়ে ঢুকে যাবে পেটে।

তা হবে! চিরকাল জেনে এসেছেন প্রত্যেকটি তরকারি কাটার আলাদা নিয়ম আছে। বিয়ে হয়ে এসে তিনবছর দিদিশাশুড়িকে পেয়েছিলেন। তিনি হাতে ধরে ধরে শেখাতেন,

এই হল আলু-পটলের ডালনার জন্য কোটা আর ওইটে হল মাছের ঝোলের। এইটে চচ্চড়িতে দেবার বেগুন, এটা ভাজার। তরকারি কোটা হবে এমন যেন দেখেই রাঁধুনি বুঝতে পারে কি রান্না হবে।

আবার মাঝে মাঝে ঠেস দিতেও ছাড়তেন না।

—এক মেয়েকে বিবি করে রেখেছে মা, রীত-নিয়ম কিছু শেখায়নি। পাতের ডান দিকে জলের গেলাস দিতে হয় গো সায়েবের বেটি।

খারাপ লাগত। মা বলতেন, ওতে কিছু মনে করতে নেই। মাথার ওপর মান্যিগিন্নি মানুষটা আছেন সেটা কপাল, বুঝলে? যা শেখান মন দিয়ে শেখো। সরোজ নিজেও পরে বুঝেছেন, ওটা দিদু কিছু ভেবে বলতেন না, ওরকমই ওঁর কথা বলার ধরন। তারমধ্যে একরকম স্নেহও থাকে। তারপর শেখা জিনিস ধীরে ধীরে কখন অভ্যাস হল। তরকারি কোটা, ফোড়ন দেওয়া, কোন্ ব্যঞ্জন কেমন বাসনে রাখলে শোভন হয়—আস্তে আস্তে নিজেই অভ্যস্ত হয়ে গেলেন। এমনকি তরকারি যে কেটে রাখে না, 'কুটে' রাখে, তরকারি কাটা নয়, বলতে হয় 'কোটা', বর্ষাকালে নুনের মধ্যে চারটি চাল ছোট পুঁটলি বেঁধে ফেলে রাখলে নুন গলে যায় না, কচি ছেলের সর্দিকাশিতে মধু তুলসিপাতার রস চাটিয়ে দিতে হয়, কালো জিরে আর নিমপাতা দিয়ে রাখলে পোকা ধরেনা গরম কাপড়ের সিন্দুকে—এরকম হাজার গণ্ডা খুঁটিনাটি শিখেছেন। আজ ভাবতে গেলে অবাক লাগে যে সব ছোট ছোট জিনিস প্রত্যেকটা

পরিবারের নিজস্ব হত, যাকে 'বাড়ির নিয়ম' কি 'বংশের ধারা' বলে লোকে সেগুলো তৈরি করত, বজায় রাখত, আসলে সে সব বংশের বাইরে থেকে আসা বৌরা। শাশুড়ি থেকে বৌ, তা থেকে আবার তার বৌ, এমনি করেই না এক-একটা পরিবারের রীতিনিয়ম চলে আসে। পুরুষমানুষরা আর তার কতটুকু জানে! মেয়েদের কত ভালবাসাই না জড়িয়ে থাকে এক একটা পুরনো সংসারের আনাচে কানাচে খাঁজে খোপে—তার হিসেব রাখা সহজ নয়। নাড়ির মধ্যে মধ্যে জড়িয়ে যায় সে সব।

তারপর হঠাৎ একদিন নতুন হাওয়া এসে পড়ে। রোজকার মতো বয়ে যাওয়া বাতাস নয়, ঝাপটা লাগা জোর বাতাস। চারপাশ পাল্টে গেল কীরকম তাড়াহুড়ো করে। এই পাড়ায় বসে বসেই তো দেখলেন—স্বাধীনতা এল। তার আগে সেই সর্বনেশে দাঙ্গা। দিনেরাতে কাঁটা হয়ে আছে মানুষ। সরোজের ঘরের মানুষটি চাকরি করত ধানবাদে। কোলিয়ারি অফিসে। কি উদ্বেগ! বাড়ির খবর ঠিকমতো না পেয়ে যদি হঠাৎ এসে পড়ে কোন দিন! কোন্ পথ দিয়ে কি করে আসবে এই দক্ষিণ শহরতলী পর্যন্ত। এদিকে ঠিক ততটা গোলমাল হয়নি হয়তো, কিন্তু কোথায় যে কখন ভয়ানক কিছু লেগে যাবে কেউই ঠিকমতো জানেনা। বালিগঞ্জ স্টেশন অবধি ট্রাম, তারপর রিক্সা, নয়তো টালিগঞ্জ না কোথা দিয়ে যেন ঘুরেঘুরে বাস আসত। সে বাস-ট্রামও যে কখনও চলছে, কখনও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে! চললেও নাকি বিকেলের দিক থেকে বাসে লোকজন কমে যায়—এসব কথা শুনতেন ঘরে বসে।

শ্বশুর তখনও শক্ত সমর্থ। তিনি সকলকে বলেন,

—অত দুশ্চিন্তা করার কি আছে? খোকা কি কচিছেলে? তার বুদ্ধি নেই? জানেনা কি করে আসবে?

শ্বশুর তখন সদ্য রিটায়ার করেছেন, বাড়িতে বসতে পারেন না। রোজ সকাল থেকে বেলা এগারোটার মধ্যে অন্তত তিনবার বাজারে যাবেন, নানারকম খবর শুনে আসবেন। তারপর এককাপ চা খেয়ে বৈঠকখানা ঘরের পিঠসোজা কাঠের চেয়ারে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবরের কাগজখানা পড়বেন আর মাঝে মাঝে ডাক দেবেন,

—এই দ্যাখো, এবার দাঙ্গা থেমে যাবে—গান্ধীজি অনশন শুরু করলেন। এই তো এই কলকাতাতেই, বেলেঘাটার বস্তির মধ্যে।

—এই তো বিহারে মিলিটারি নেমেছে—একেবারে সরাসরি মিলিটারি, বুঝলে গো, প্রসূনের জন্য আর কোনও ভাবনা নেই। এবারে সব খনি-টনি রেলওয়ে সব পাহারা দেবে মিলিটারিরা।

বলতেন এইসব, আর সন্ধ্যের মুখ থেকে রাত্রি সাড়ে ন'টা-দশটা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতেন ছাদে গিয়ে। বলতেন বটে বাতাসে পায়চারি করছি, কিন্তু সরোজের শাশুড়ি ফিস্‌ফিস্ করে সরোজকে বলতেন,

—বাস রাস্তা দেখেন, যদি হঠাৎ এসে পড়ে খোকা। মুখে অত বড় বড় কথা, আমাকে ভরসা দেওয়া—নিজের দুশ্চিন্তা যাবে কোথায়? সারাদিন ওইসব কথা

আলোচনা করে তো নিজের মনে জোর করেন।

তখন এবাড়ির ছাদ থেকে ওই বাস রাস্তা দেখা যেত পরিষ্কার। কটা বা বাস চলত ! বাস দাঁড়ালে লোক নামলে ঠাহর করা যেত, এই রাস্তা যে বাঁক নিয়ে দীঘির পাশ দিয়ে চলে আসতে তার প্রায় পুরোটাই দেখা যেত। এখন কেউ কি আর বিশ্বাস করবে সে কথা! এখন তো বাসরাস্তা আর এ বাড়ির মাঝখানে পুরো একটা পাড়া। বাজার। সেই ডুবির বিলের চিহ্নমাত্রও নেই ওই তিনতলা চারতলা বাড়িগুলোর কোথাও।

সেই দাঙ্গার সময়ে সন্তু পেটে। চোদ্দই আগস্ট রাত্রে দেশ স্বাধীন হল। রাস্তায় রাস্তায় সারারাত লোকের হৈ-হল্লা। একদিনেই নাকি ভোজবাজিতে উড়ে গেল দাঙ্গা। কত বাজনা কতগান আলো। আর সেই রাত থেকেই ব্যথা উঠল সরোজের। পনেরোই আগস্ট সকালে কাজের লোক বেলার মা এসেছিল অনেক দেরি করে—এখনও মনে আছে সে কথা। সরোজকে কোনও কাজে হাত দিতে দেননি শাশুড়ি। দিদু তখন আর হাঁটাচলা করতে পারেন না, বিছানায় শুয়ে শুয়েই বারবার বলে পাঠাচ্ছেন,

—নাতবৌকে বল চুল বাঁধা খুলে দিতে, সায়ার দড়ি আলগা করে দিক।

সরোজ নিচে নামতে পারছে না, দিদু শোয়া, বেলার মা আসেনি। শাশুড়ি একা হাতে রাজ্যের এঁটো বাসন বার করবেন, রান্নাঘর মুক্ত করবেন, না বৈঠকখানায় শ্বশুরের বন্ধুদের চায়ের জন্য তোলা উনুন ধরাবেন! কে দাইকে খবর দেবে! স্বামী কি এত বড় একটা দিনেও বাড়ি আসবেন না? একা মনে মনে সেই উৎকণ্ঠা—এইসব নিয়েই সরোজনলিনীর স্মৃতিতে সেই স্বাধীনতার সকাল।

বেলার মা এসেছিল বেলা করে, তার খানিক পর দুপুরের আগে প্রসূন। দু'জনে একই কথা বলেছিল—কি ভিড় রাস্তায়! আজ আর বোধহয় কেউ কোথাও কোনও কাজে যাচ্ছে না, লোকে পাগল হয়ে রাস্তায় নেমেছে। প্রসূন বলেছিলেন,

—এতদিনের দাঙ্গার পর আজ লোকে সহজভাবে পথে বেরোতে পারছে তো তাই রাস্তায় বেরিয়ে সবাই সবাইকে জড়িয়ে ধরছে। স্বাধীন হয়েছি মানে যে ঠিক কি কি হবে জানিনা, আমাদের কোলফিল্ডে নানাজন নানারকম বলছে, কিন্তু আজকের দিনটার কথা আলাদা—

হ্যাঁ। কেবল সেই দিনটাই আলাদা ছিল।

সেদিন সমস্ত রাত্রি সরোজকে যন্ত্রণায় ফালাফালা করে ফেলে ষোলই আগস্টের ভোররাত্রে স্বাধীনের জন্ম। আর স্বাধীন আতুঁড় ছাড়তে না ছাড়তেই আবার শুরু হয়ে গিয়েছিল দাঙ্গা, ভয়।

ছ'দিনের দিন দাদা এলেন দেখতে। মা পাঠিয়ে দিয়েছেন জিনিসপত্র কাঁথাকাপড় মিষ্টি দিয়ে।

পুরনো আচার-বিচারের মানুষ হয়েও কতগুলো জিনিসে খুব খোলামন ছিলেন

শাশুড়ি। চিরকাল নিজের শাশুড়ি মাথার ওপর থাকায় এমনিতেই শান্ত মানুষটি কখনও জাঁদরেল গিন্নি হয়ে ওঠেন নি। একতলার কোণের দিকের একটা পুবদিক খোলা ঘরেই আঁতুড় করে দিয়েছিলেন। বললেন,

—খোকাও এই ঘরেই হয়েছিল। তখনও তো দোতলা ওঠেনি, তবু মা আমাকে এখানেই রেখেছিলেন। দেশে-গাঁয়ে শুনেছি উঠোনে বেড়ার ঘরে নামিয়ে দিত—এ-বাড়িতে ওসব নিয়ম নেই। ছেলে নিয়ে সুস্থ মতো থাক, আরামে থাক—

দাদা সেই ঘরের চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে দেখল সেই ছয়দিনের ছেলেকে, বোনকে। শাশুড়ি বারে বারে বলছিলেন, কোলে নাও, ছেলের গলা শুকোচ্ছে।

সামনে দাঁড়ানো বেলার মাও বলেছিল সেই কথা, কিন্তু সরোজের ভারী লজ্জা হচ্ছিল। দাদারও সেরকমই কোনও অস্বস্তি হয়েছিল বোধহয়,

—না-না তুই শুয়ে থাক। আমি বলব মাকে—খুব সুন্দর হয়েছে, বলে তাড়াতাড়ি সরে গিয়েছিল দরজা থেকে। প্রসূনের অবস্থাও প্রথমবার খানিকটা সে-রকমই। ষোল তারিখে সন্ধ্যেবেলা প্রায় চুপিচুপি একবার এসে দাঁড়িয়েছিল। খানিকটা যেন অবাক,

—এত ছোট হয়েছে? কিন্তু ছেলেকে দেখার উৎসাহের চেয়ে সেদিন তার বেশি উৎকণ্ঠা ছিল সরোজকে নিয়েই, তুমি কেমন আছ? দাই বসে সন্তুকে সেঁক করছিল। প্রসূনের কথা শুনে সে একগাল হেসে বলেছিল,

—ও গিন্নিমা, তোমার ছেলের কথা শোন গো—বলে এত ছোট কেন তার খোকা! তুমি ফিরে হপ্তা এসে দেখো গ' দাদা, ছেলে তোমার সঙ্গে মটোরগাড়ি করে বেড়াতে যাবে।

লজ্জা পেয়ে চলে গিয়েছিল প্রসূন।

আজ প্রায় চল্লিশ বছর পরও এত খুঁটিনাটি মনে আছে দেখে এক একসময় নিজেও অবাক হন সরোজ। আবার মনে হয়, কেবল মনে করা ছাড়া আর তো কিছু করবার নেই এখন! মাঝখানে কত বছর কোন কথাই বসে মনে করবার সময় ছিল না। দিদু মারা গেলেন কতদিন ভুগে। শ্বশুরের শরীর হঠাৎ ভেঙে গেল। মা ব্যস্ত থাকতেন তাঁর সেবা-যত্ন নিয়ে। সংসারের প্রায় সব দায়িত্ব এসে পড়েছিল সরোজের ওপর। তার মধ্যে তাঁর নিজের শরীরও বেশ বড় একটা চোট খেল।

সন্তুর দু'বছর বয়সে আবার একজন এসেছিল তাঁর পেটে। থাকেনি, কিন্তু যাবার সময়ে টান দিয়েছিল একেবারে গাছের শিকড়সুদ্ধ। হাসপাতালে ভর্তিই শুধু নয়, পৌঁছতে হয়েছিল একেবারে অপারেশনের টেবিল পর্যন্ত। আর মা হবার সম্ভাবনা ঘুচে গিয়েছিল। তার আগের ন'টি মাস ধরে বিবশ শরীর নিয়ে একদিকে ওই দস্যি ছেলে সামলেছেন, অন্যদিকে সংসার।

এখনকার ছেলেমেয়েরা কত খোলামেলা। কত সহজেই সুমনা সন্তুকে তার সব শারীরিক অসুবিধার কথা বলতে পারে। তিন্নির আসবার খবরও তিনি শুনেছিলেন

প্রথমে সন্তুর মুখ থেকে। তারপর সুমনার মা-বাবা এসেছিলেন। সন্তু তাঁকে বলে দিয়েছিল—মা, সুমির নানারকম প্রবলেম আছে। ডাক্তার বলেছেন ওকে একেবারে বিছানায় শুয়ে থাকতে।

তাঁরা ভাবতেও পারতেন না—স্বামী কেন শাশুড়িকে কিংবা কাউকেই বলা যায় যে শরীর অস্থির লাগছে, কোনও খাবার গলা দিয়ে নামছে না। সকালে উঠতে পা টলছে কিংবা কন্‌কনে ব্যথায় হিম হয়ে আসছে তলপেট। সরোজের না হয় স্বামী দূরে থাকত, কিন্তু পাড়ার কিংবা আত্মীয়-পরিবারের মধ্যেই আরও যে দু-চারজন সমবয়সী বৌ ছিল, তাদের সকলেরই ছিল একই অবস্থা। সরোজের শাশুড়ি ভালমানুষ ছিলেন, তবু তাঁকে বলতে পারতেন না সংকোচে। অন্য বৌদের তো প্রশ্নই ছিল না—তক্ষুণি এমন এমন কথা শুনতে হবে।

সেটা ভাল ছিল না। কিন্তু এটাই কি ভাল? সব ভালমন্দ কথাবার্তা সিদ্ধান্ত সব কেবল নিজেদের দুজনের মধ্যেই রাখা? এতে বাড়ির যে বাকি একটা দুটো লোক থাকে, যারা সংসারটাকে গেঁথে গেঁথে এই জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে, তাদের মনে হয় না যে তারা একেবারে অপ্রয়োজনীয় একটা বালতি বা লেপের জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে? কবে এমন হবে যে সবার সঙ্গে সবাই দিব্যি হাসিখুশি মনে মিলেমিশে থাকবে মানুষ? কোনওদিন কি হবে? কে জানে। হয়তো হবে কোনওদিন, তিনি থাকবেন না তখন। কী যে হবে কেউ কি জানে আগে থেকে! অথচ কত হিসেব কষে। দিদু যখন বাড়িতে সকালে দু'জনের পর তিনজন লোক এলে বিরক্ত হয়ে উঠতেন, 'কত যে লোক গিস্‌গিস করছে পাড়াময়' বলে, তাঁরা কি কেউ জানতেন সত্যি কাকে বলে পাড়াময় লোক! 'স্বাধীনতা' 'স্বাধীনতা রব মিটতে তো আবার দাঙ্গা। কাগজ ভর্তি বীভৎস সব খবর আর গুজব! গুজবে কান পাতা দায়। লোকে বাড়ি বয়ে এসে শুনিয়ে যেত। আগস্ট মাসের ভয়ের চেয়েও যেন বেশি হল তার পরে কার আতঙ্ক। তারপর শুরু হল পূর্ববাংলা থেকে উজাড় হয়ে দলে দলে মানুষ আসা। সে যে কত তার আর যেন কোনও ইয়ত্তা নেই। মাথায় বোঝা, কাঁকালে বোঝা, কোলে হাড়সার বাচ্চা, কারও কারও পেটেও ভার—এসে তারা এই সমস্ত অঞ্চলটা ধরে বসতি তৈরি করল। আজও ভেবে অবাক হয়ে যান সরোজ, কি অসীম ধৈর্য আর ক্ষমতা মানুষের! সর্বস্ব-হারিয়ে এসেছে ওপারে, কেবল কি ঘর গৃহস্থালি! কত জন চোখের সামনে খুন হতে দেখেছে আপন লোকদের—তবু কাঁদতে কাঁদতেও আবার ঘর গড়েছে, শিকড় মেলবার চেষ্টা করেছে নতুন মাটিতে। তাদের দেখতে দেখতে তাদের কথা শুনে শুনে এক-একদিন যেন নিজেরেই বুকের মধ্যে থেকে কান্না ঠেলে উঠত। আশেপাশে যতটুকু খোলা জায়গা ছিল ভরে গেল সেইসব অভাগা দুঃখী লোকদের ভিড়ে। না তাদের কথা বোঝা যায়, না তাদের ধরন-ধারণ চেনা লাগে, অথচ শোনেন তারাও বাঙালি। মনে আছে, একদিকে যেমন ছোটছোট

ঢেউ টিনের চালঅলা বেড়ার ঘরে ঘিঞ্জি হয়ে গেল সব দিক, তেমনি বাজারে জিনিসপত্রের দাম হয়ে উঠল আগুন। শ্বশুর প্রায় প্রতিদিনই বাজার থেকে ফিরে এসে হতাশ গলায় বলতেন,

—মাছ তরকারি আর কেনা যাবে না, বুঝলে গো! দাম কি, হাত ছোঁয়া যায় না।

এখন আর সে-পাড়াও অবশিষ্ট নেই কোথাও। আপাদ-মস্তক পাল্টে গেছে। বিশাল বিশাল পাকাবাড়ি রিক্সা-ট্যাক্সির হর্নে কান ঝালাপালা। কত বড় বড় পুকুর ছিল পুরো এলাকাটা জুড়ে—কিছু নেই তার। এই তাঁর বাড়ির সামনের পুকুরটাই বোধহয় এখন একমাত্র। তারও তো অর্ধেকটা বুজে এসেছে জঞ্জালে। সব জায়গায় বাড়ি বাড়ি বাড়ি। বড় ঘিঞ্জি লাগে, প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। আবার ভাবেন আহা থাক। মানুষ লক্ষ্মী। মানুষ না থাকলে তো সংসার শ্মশান। যে যেখানে বসত করেছে সুখে-শান্তিতে থাকুক। তিনিই বা আর কদিন! যাঁদের ছায়ায় সংসার শুরু করেছিলেন তাঁরা কেউ নেই আর। শ্বশুরশাশুড়ি গিয়েছিলেন এক বছরের মধ্যেই। সেই ধাক্কা সামলে উঠতে কতদিন লেগেছিল ! ওইটুকু ছেলে দিয়ে তাঁকে কি করে একা রেখে যাবেন প্রসূন! আবার বাড়ি বন্ধ করেই বা যাবেন কি করে! দিদিশাশুড়ির লক্ষ্মীনারায়ণ আছেন, উঠোনে তুলসি গাছ আছে। শুধু তাই নয়, সে সময়ে ওরকম বাড়ি বন্ধ করে গেলে বাড়ি দখল হয়ে যাওয়ারও ভয় ছিল। যে মানুষরা নিজেদের সবকিছু হারিয়েছে অমন নিষ্ঠুরভাবে, তাদের আর কোনও কিছুতে সংকোচ কিংবা ভয় ছিল না। শেষ পর্যন্ত ধানবাদের চাকরি ছেড়ে চলে এসেছিলেন প্রসূন। কোনমতে চাকরি জোগাড় হয়েছিল এখানে। সরোজের দাদার চেষ্টাতেই হয়েছিল বলতে গেলে।

তখন মনে হত কী করে একা থাকবেন। অথচ এখন তো বলতে গেলে একাই কাটে দিন। পাঁচরকম গল্প করতে, গল্প শুনতে ভালবাসতেন। সে ভালবাসা আছে হয়তো আজও, নিজে বেশি কথা বলতে ইচ্ছে করেনা আর, কিন্তু মনে হয় আপনজনেরা থাকুক কাছে—সুমনা তার কাজকর্ম সেলাই-ফোঁড়াইয়ের অবসরে একটু কাছে এসে বসুক, সন্তু আসুক অফিস থেকে ফিরে। প্রসূন যতদিন ছিলেন বিকেলে কেমন একসঙ্গে বসে চা খাওয়া হত সব। এখন আর তেমন নেই। ওরা বাইরে যায়, কত কি দেখে, কত কি শোনে, ইচ্ছে হয় সে সব কথা তিনিও শুনবেন ওদের কাছে। তিন্নি গায়ে ঘেঁসে এসে গল্প শুনবে নিজেদের এই সংসারের। টিভি কিনে দিয়েছে সন্তু, কিন্তু তাঁর ভালো লাগে না দেখতে। মানুষের সঙ্গে কথা বলে যে সুখ তা কি আর ওই বানানো সাজা সিনেমা থিয়েটারে আসে! কেবল নাচ আর দৌড়। কিন্তু সেই একসঙ্গে বসা আর হয় কই! বেশিরভাগ দিন সন্ধ্যাবেলায় ওরা বেরিয়ে যায়। যেদিন বাড়িতে থাকে তিন্নিকে পড়ায়। কবে ওদের কি দরকার কেমন সহজে গিয়ে কিনে আনে। আর তাঁদের সময়! তিন্নি ভালবাসে বাবার ছোটবেলার গল্প শুনতে। সেদিন জিজ্ঞেস করছিল ওই পিতলের জগটার কথা। ও তো ছোট, ও আর কি বুঝবে! এখন যারা বড়—ওর বাপ-মাই কি বুঝবে নাকি? তাদের তো

দরকারে হোক কি শখেই হোক—একটা জিনিস কিনতে হলে কেবল সময় পাবার সমস্যা। সময়মতো একদিন বেরিয়ে গিয়ে কিনে আনলেই হল। সুমনার কাছে কি আর পুরনো একটা জিনিস মূল্যবান মনে হবে তাঁর মতো? ওরা নিজেদের আজকের কেনা জিনিসও একবছর পর ফেলে দেয়।

অত সহজে নিয়ে আসতে পারে বলেই বোধহয় ওদের আর কোনও কিছুরই ওপর তেমন মায়া থাকে না। ওই জগটা তো তাঁর কাছে নিতান্ত একটা ব্যবহারের বাসন ছিল না—তাঁদের কাছে সামান্য যে দু-একটা জিনিস থাকত নিজের বলে সেগুলো ঘিরে এত শখ সাধ কল্পনা, এত স্মৃতি থাকত যে একটা ফুলকাটা বালিশঢাকা, কি একটা সাবানের বাক্সও অসামান্য হয়ে উঠত। সন্তু হবার পর প্রসূন নিউমার্কেট থেকে সাদার ওপর আকাশী নীল ফুলের ছাপ নরম তোয়ালে এনে দিয়েছিল 'সন্তুর জন্য আনলাম' বলে। রাত্রে চুপি চুপি সে তোয়ালে সরোজের হাতে দেওয়া। তাই কি কোনওদিন চান করতে পেরেছেন তা দিয়ে? বাক্সেই খুলে মেলে একটু হাতে করে দেখে, একবার গায়ে জড়িয়ে কি মাথায় দিয়ে আবার সেই বাক্সে তুলে রাখা।

ছ'মাসে নাতির মুখে ভাত দেবেন ঠিক করার পর থেকে শাশুড়ি মাঝেমাঝেই বলতেন—

—একবার কালিঘাটে মায়ের মন্দিরে নিয়ে যাস তো আমাকে আর বৌমাকে।

—কেন হঠাৎ কালিঘাটে কেন? শুধোলে বকতেন,

—ও আবার কি কথার ছিরি! মন্দিরে যাব—তার আবার কেন কি? শেষে একদিন বলে ফেললেন,

—প্রথম পোয়াতি মায়ের কাছে পাঠালাম না—মনে মনে মা কালীকে বলে রেখেছিলাম, ভালোয় ভালোয় দুই প্রাণী দুই ঠাঁই করে দাও—বৌমাকে নিয়ে পুজো দিয়ে যাব। মা মুখ রেখেছেন। আর কবে যাব!

প্রায় একবছর পরে সেই রাস্তায় বেরোন।

কোন অন্ধকার থাকতে উঠে স্নানটান করে তৈরি হওয়া। ছেলেকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে তার পিসির জিম্মায় রেখে যাওয়া।

মন্দিরের বাইরে পাথর বাঁধন রাস্তার ধারে কত সব দোকান—জবাফুলের মালা, ফুল বেলপাতা ভরা সাজি, পদ্মপাতায় সাজানো সন্দেশ বিক্রি হচ্ছে। কনকনে শীতের মধ্যেও গঙ্গায় ডুব দিয়ে ভিজে সপ্‌সপে কাপড়ে উঠে আসছিল লোকে। মন্ত্র উচ্চারণ করছিল কেউ কেউ। প্রসূনও ধুতি পরেছিলেন। মন্দিরের সামনে থেকে রাস্তা জলে ছপ্‌ছপ করছিল। ভিতরে ধূপের ধোঁয়া, পুরোহিতদের বকাবকি, কারা সব যেন থেকে থেকে 'মা—মা' বলে চিৎকার করে উঠছিল, তাঁর কিরকম ভয় ভয় লাগছিল। চাপাচাপি ভিড়ের মধ্যে কে যে হাত ধরে টেনে দেবীর পায়ে তাঁর হাত ঠেকিয়ে দিয়েছিল। সেই সময়টুকুর জন্য যেন বাড়ির বাইরে আসার সব আনন্দ উড়ে গিয়ে বাড়ি ফেরার জন্যই মন অস্থির হয়ে উঠেছিল সরোজের। বেরিয়ে এসে স্বস্তি পাওয়া

মাত্র মনে মনে মা কালীর কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন। মন্দিরের বাইরে গলির মধ্যে কত যে জিনিস! বঁটি, টোপ টোপ দেওয়া লোহার থালা, পিতলের কত রকম থালা। সাজি, শোলার ফুল, স্তূপ করা কী সব জিনিস এক একটা দোকানে! আবার কেমন ছোট ছোট খেলার হাঁড়িকুড়ি থালা, পিতলের পাত দিয়ে করা এককুচি উনুন, তাতে আবার ভিতরে শিক দেওয়া—। যেন কালকেই দেখেছেন এমন ছবির মতো স্পষ্ট করে মনে আছে সব খুঁটনাটি। সুমনা যে কখনও হেসে বলে,

—মায়ের সকালবেলার কথা মনে থাকে না—এ-দিকে পঞ্চাশ বছর আগেকার কত খুঁটিনাটি মনে আছে—

ঠিকই বলে। কখন যে কি কুড়িয়ে রাখে মানুষের মন!

তো সেইসব দোকানের সুন্দর সুন্দর বাসনপত্রের মধ্যেই ওই জগটা ছিল। কি সুন্দর যে দেখতে! একটুও কোণা তোলা কি খাঁজখোঁজ কাটা নয়। না হালকা না অতিরিক্ত ভারী আর এমন সাজন্ত সুন্দর গড়নটি! মা ওপাশে পাথরের বেলুনচাকি দেখছিলেন ভোগের লুচি বেলার জন্য—সরোজ তাড়াতাড়ি করে প্রসূনকে প্রায় ঠেলে নিয়ে আসেন জগ দেখাতে।

হ্যাঁ দেখেছি তো! কি হয়েছে জগে? কি মুশকিল এই লোক নিয়ে! টেনে এনে দেখাচ্ছেন, তবু বোঝে না—

কি সুন্দর দেখতে! আমাকে কিনে দেবে?

জগ কিনে দেব! কি করবে জগ নিয়ে !

অভিমানে চোখে জল এসে গিয়েছিল সরোজের। এত সুন্দর দেখতে একটা জিনিস—করবে আবার কি! সুন্দর জিনিস আর কি করে লোকে! সামনে কাছে কাছে রাখে, দু-চারবার হাত দিয়ে দেখে, খুব জোর না হয়ে এক-দুদিন জল খায়! কতটুকু বা সময় যে এসব কথা বুঝিয়ে বলবেন! ছেলেকে পাশে দেখতে না পেয়ে শাশুড়ি ব্যস্ত হয়ে ডেকে উঠেছেন। বুকের ভিতরে গলার নিচে কান্না ঠেলে উঠছিল সতের বছরের বৌটির। বাড়ি ফিরবার সময়ে ট্রামের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেও ইচ্ছে হচ্ছিল না। শাড়ি নয়, গয়না নয়, সামান্য একটা জল খাবার জগ—তাই-ই যে শখ করে কিনতে পারে না তার আর বাইরের জগতের দিকে তাকিয়ে কি লাভ! আবার একথাও স্পষ্ট মনে ছিল যে রাগ দুঃখ পরেও থাকবে, কিন্তু কালীঘাটে আসা রোজ রোজ হবে না। কাজেই পথের দিকে না তাকালে ওই অত বড় বড় সব বাড়ি, এই জমজমাট গড়িয়াহাট বাজার, তারপর রাস্তার মাঝখান দিয়ে রেললাইন, রেললাইনের মাঝখান দিয়ে রাস্তা, আরও কত যে কী আশ্চর্য জিনিস, এসব কিছুই দেখা হবে না নিজের কোলের দিকে মাথা নিচু করে থাকলে।

বাড়িতে এসেও কয়েকবার মনে পড়েছিল জগটার কথা, কিন্তু বলবেন কাকে! অন্য জন কিছু শুধোলে তবে না! তার মাথায় তো দেখা যাচ্ছে বৌয়ের কথাটা একটা দাগও কাটেনি কোথাও!

আর রাত পোহানোরও আগে ফার্স্ট বাস ধরেই প্রসূনের হাওড়া চলে যাওয়া, সেখান থেকে ধানবাদ। তখন তো ওই শনিবার সন্ধ্যে থেকে রবিবার রাত্রিটুকু। তাও প্রতি সপ্তাহ নয়, পনের দিনে একবার আসা। তার মধ্যেই যতটুকু যা কথা হাসি গল্প, ছোট ছোট রাগ অভিমান। তখন আবার স্বাধীন এতটুকু। সে প্রতিদিন বড় হচ্ছে, পনেরদিন আগে তাকে যেমন দেখে যায় প্রসূন, পনেরদিনে সে পাল্টে যায়। তার দুরন্তপনা, তার কীর্তিকাহিনী শুনতে শুনতেই অর্ধেক রাত কাবার হয়ে যায়। তারপর আবার তেরোদিনের অপেক্ষা।

তো সেবার এমন হল, পরের শনিবারই সন্ধ্যেবেলা প্রসূন হঠাৎ এসে উপস্থিত। বাবা-মা খুশি হবারও আগে উদ্বিগ্ন—কি হল, চলে এলি!

সরোজ আজ অনেক সময়ে ভাবেন বসে, বিয়ের পরই পাঁচদিন, সাতদিনের জন্য নতুন বরকনে চলে যায় ঘর-পরিবার ছেড়ে বাইরে কোথাও বেড়াতে। আর তাঁদের সময়ে কি না ফুলশয্যার পর একদিনের ওপরে দ্বিতীয়দিন ছেলেকে বাড়িতে দেখলে লোকে 'ছি-ছি' করত। বৌয়ের বদনাম হয়ে যেত বেহায়া বলে। কে জানে কোন্‌টা ভালো! সেকালে লজ্জায় বিধিনিষেধে এমন একটা আড়াল তৈরি হত পরস্পরের মধ্যে যে সহজ খোলামেলা সম্পর্ক তৈরি হয়ে উঠতেই পারত না। অথচ শরীর তো তার কাজ করেই যেত। শরীরের আড়াল ঘুচলেই কি মনের আড়াল ঘোচে? আর সেখানেই তো তাঁর চিন্তা ঘুরতে থাকে, এই যে এখন বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে কি দু-চারদিন একমাসের মধ্যে চলে যাওয়া শুধু দুজনে মিলে—এতেও কি আসল গোলমালটা রয়েই যায় না? কেউ বলে একটা সুন্দর জায়গায় পরস্পরের প্রথম পরিচয় সুন্দর করে গড়ে ওঠে, আর কেউ বলে প্রথম ক'দিন একসঙ্গে থাকলে পরস্পরকে ভালভাবে চিনে নিতে পারে। কিন্তু কী করে যে তা হবে! সত্যিই কি এরকম কিছু হয়? ভাবেন সরোজনলিনী। কে জানে হয়তো হয়! তিনি তো নিজের পুরনো চিন্তা দিয়েই ভাবেন—যারা আগে কখনও একসঙ্গে বসবাস করেনি, পরস্পরকে হয়তো দেখেছে নিতান্ত বাইরে থেকেই, তারা ঘরসংসারের বাইরে ক'দিন একসঙ্গে থাকলে দু'জনে দু'জনকে কতটুকু চিনবে? শরীরে সুখ পাবার নেশায় যখন কোনও বাঁধ থাকবে না, তখন কি কোন নতুন দম্পতি আর কোনও কিছু স্পষ্ট করে অনুভব করতে পারে? জায়গার সুন্দরতা, পরস্পরের চিন্তা ভাবনা, ধরন-ধারণ—কিছু? কোন্‌টা যে একেবারে ঠিকঠাক ভালো কেই বা জানে ! এখনকার এই দুই-দুই, তিন-তিন জনের পরিবারের ভালমন্দ দেখে দেখে সরোজনলিনীর মাঝে মাঝে নিজেদের কালের জন্য কষ্ট হয়, আর মাঝে মাঝে সুমনাদের কি তার চেয়েও ছোটদের কালের জন্য চিন্তা হয়।

ছেলে যখন বাবা-মাকে নিশ্চিন্ত করে বলল সোমবার একটা কিসের ছুটি পড়ে যাওয়ার শনিবার চলে এসেছে, সরোজ রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে অপ্রত্যাশিত খুশি সামলাচ্ছিল, কারণ এক্ষুণি ছেলের জলখাবারের ব্যবস্থা করতে মা ঘরে ঢুকবেন।

—হাত পা ধুয়ে আয়, বৌমা এক্ষুণি চট করে দুটো লুচি দেবে।

—না না আগে একটু চা দিতে বল—তিনকাপ চা থালায় বসিয়ে নিয়ে সরোজ যখন বসার ঘরে এল ছেলে ততক্ষণ খড়ের মোড়ক খুলে একটা পিতলের ঘটি আর একটা জগ বার করে টেবিলের ওপর রাখছে,

—মা, এই তোমার ঠাকুরের আম্রপল্লবের ঘট আব এই আমার জল খাবার জগ, কবারই ভেবেছি নিয়ে আসব, ওখানে সবাই বেশ জগে জল খায়, আমারও অভ্যেস হয়ে গেছে—ঘটিটা তোমার পছন্দ হয়েছে মা? আরেকটু হলেই হাত থেকে চায়ের থালা পড়ে যেত সরোজের।

সেইকথা রাত্রে ঘরে এসে বলেছিল,

বিহারের জগ!

বারে! তবে কি মাকে বলব মাগো তোমার ছেলে তার আদরিণীর শখ মেটাতে ভোরবেলা সুটকেস হাতে কালিঘাটে নেমে পড়ে জগ কিনে নিয়ে ধানবাদ গিয়েছিল? আর সেদিনের কাঁদোকাঁদো মুখখানা হাসিহাসি দেখার লোভে এই শনিবার আবার চলে এসেছে?

সেইজন্য? তবে যে বললে সোমবার ছুটি!

সে তো আমার ছুটি। আমি নিয়েছি তাই—অফিসে কেন ছুটি হবে? অফিসের বৌ কি কলকাতায় থাকে?

ক'ঘণ্টা পর সে রাত্রে নিজেদের ঘরের আড়ালে ততো-নতুন-নয় বৌও লজ্জায় আনন্দে খুশিতে টলমল করে উঠেছিল। এত কাণ্ড করেছে প্রসুন আর সেদিন দোকানে এমন মুখ করেছিল যে সে কিনা ভাবছিল যে মানুষটা কিছু খেয়ালই করেনি!

নিত্যি তিরিশ দিন নিজে হাতে মেজে ঝকঝকে করে রাখত সরোজ। অবশ্যি বাসন ঝকঝকে রাখার ব্যাপারে বেলার মাও পাকা ছিল। সে ছিল ও-বাড়ির পুরনো লোক। দিদুর আমল থেকে বাসন মাজছে। আর দিদুর কথাই ছিল,

—বাসন যেন হাসে। যে সংসারে বাসন হাসে না সে সংসার ছেড়ে লক্ষ্মী চলে যান।

এই লক্ষ্মী ছেড়ে যাবার ভয়ে আর লক্ষ্মী বসানোর আকাঙ্ক্ষায় কত কাজ যে নিয়ম মেনে করতেন তাঁরা। বাসি কাপড় ছাড়া তো বটেই, রাঁধতে বাড়তে বাসন ঝন্‌ঝন করবে না, সিঁড়িতে কোথাও ধুলো থাকবে না, সদর দরজার সামনের জায়গাটুকুও ঝাঁট দিয়ে সকাল বিকেল জল-ছড়া দিতে হবে। সন্ধ্যাবেলা ঘরে ঘরে ধূপধুনো আর তুলসিতলায় প্রদীপ দেওয়া তো আছেই। আরও কত যে উনকুট্টি চৌষট্টি রকম নিয়ম ছিল ঘর-গৃহস্থালি জুড়ে! উঠোনের কোণে তুলসির সেই বাঁধানো মঞ্চটি এখনও আছে। দীর্ঘ অভ্যাসে তার গোড়ায় সকাল বিকেল জল দেন এখনও। তাঁর পর হয়তো আর থাকবে না ওই মঞ্চ। উঠোনের কোণের দিকে এক সময়ে যে কাঠটগরের গাছ ছিল সেই কি আছে! মানুষরাই চলে যায় তো তাদের ছোঁয়া-নাড়া

জিনিসপত্র আর কি করে থাকবে! সেই লক্ষ্মীর পা পড়বার আশায় কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে আলপনায় আর জ্যোৎস্নায় যেন সুগন্ধ হয়ে থাকত উঠোনখানা। আলপনা এখনও পড়ে, সুন্দর আলপনা দেয় সুমনা। কিন্তু জ্যোৎস্না পড়ে না আর তেমন করে। উঁচু উঁচু বাড়ি হয়ে গেছে ওদিকটা জুড়ে। এখনও সেদিন অনেকে আসেন, পুজোর সব আয়োজন করে দেয় স্বাধীন। কিন্তু সব সত্ত্বেও মাঝে মাঝে সরোজের বড় ইচ্ছে হয় কিছু না করে দিয়ে বরং দু'দণ্ড একটু কাছে এসে বসুক ছেলে।

এখন বেলা শেষ হয়ে এল। উঠে একটু হাঁটচলা করে দেখবেন। সুমনা বোধহয় রান্নাঘরে। প্রেসার কুকারের সিটির শব্দ কি একতলায় তাঁর রান্নাঘর থেকে উঠছে? হয়তো বিকেলের জন্য কিছু খাবার তৈরি করছে। মাঝে মাঝে বেশ নানারকম করে ও। সবগুলো তিনি খান না, কিন্তু সেসব দিনে স্বাধীন ফিরলে তিন্নি টিউটরের বাড়ি থেকে এলে দিব্যি বেশ সকলে মিলে একসঙ্গে চায়ের টেবিলে বসা হয়। ভারী মন ভাল লাগে। আর খানিকপরে স্বাধীন ফিরবে। এ সময়ে সরোজ একবার ঘরের সামনেকার খোলা ছাদে যান। দু-চারটে টবে মৌসুমী ফুল কি পাতাবাহার বসানো আছে। ফুল দিক আর না দিক গাছগুলি যে আছে সেই বেশ।

সুমনা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে আসে।

—মা, দুপুরে একটু শোননি আজ?

—না। এখানে বসে বসে শেষে দেখি সময় পেরিয়ে গেছে।

—সারা দুপুর এখানে বসেছিলেন? কেন, কি হয়েছে?

—কিছু হয়নি মা। ওই পুকুরটার দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছিলাম কালে কালে কতদিন চলে গেল। কত পাল্টে গেছে সবকিছু।

—পিঠে ব্যথা হবে শেষে।

—সে তো বুড়ো বয়সের ধর্ম। তুমি রান্নাঘরে ছিলে নাকি?

—হ্যাঁ।

—প্রেসার কুকারের শব্দ শুনলাম।

—রাত্রের জন্য তরকারি দিয়ে একটা ডাল করে রাখলাম। ও এলে একটু বেরোব সন্ধ্যেবেলা। কতগুলো কেনাকাটা বাকি পড়ে আছে।

সুমনা নেমে যায়।

চা টুকু খেয়ে সরোজনলিনী আস্তে আস্তে ওঠেন। নিজের ঘরে যান। দেওয়ালে প্রসূনের ছবি। বয়স্ক, গম্ভীর। মনে আছে, তিন্নির অন্নপ্রাশনের পর সস্তর ইচ্ছেমতো তোলানো হয়েছিল এ-ছবি। তাঁর নিজেরও ছবি আছে সেদিনে তোলা। আলমারিতে খামের মধ্যে রাখা আছে। তাঁর টেবিলের ওপর সুন্দর ফ্রেমে বাঁধানো তিন্নির ছবি। তার পাশে হালকা নীল রঙ পলিথিনের জগ। উপুড় করে রাখা কাঁচের গ্লাস।

এক-দুপা করে প্রসূনের ছবির সামনে গিয়ে দাঁড়ান সরোজ। আঁচল দিয়ে কাচটা মুছে নেন। হঠাৎ চোখে জল আসে তাঁর। অভিমানে গলা বন্ধ হয়ে আসে।

—বড় একা লাগে যে আমার, তুমি বুঝতে পারো না?

বিনোদন বিচিত্রা শাবদীয়া

শেল্টার

সরস্বতী

তখনই খুব অবাক হয়েছিলাম, সেই লক্ষ্মীপুজোর দিনই। সাধারণ বাঙালি ঘরের মেয়ের সহ্যশক্তি থাকে জানি, কিন্তু তা বলে এরকম! লুচি ভাজতে গিয়ে ফুটন্ত গিয়ে আঙুলটা ডুবে গিয়েছিল, এতবড় একটা ফোস্কা উঠেছে, তাই নিয়েই অতোলোকের সমস্ত লুচি বেলে ভেজে তুলল, একটা টু শব্দ করেনি। যাই কি না বাবাই দেখেছিল আঙুলটা মাঝেমাঝে মাখা ময়দার তালের মধ্যে চেপে চেপে ধরছে, তাই তখন দেখি পিসিমণি তোমার কি হয়েছে বলে টেনে বার করে। দেখে আমার তো চোখে জল এসে গিয়েছে। এরকম যন্ত্রণা কেউ মুখ বুজে সইতে পারে। বলতে আবার হাসছে,

—ভারি অন্যায় হয়েছে চুপ করে থাকা, বলুন? আপনার লক্ষ্মীপুজোর ওই লক্ষ্মীমাতা কালীমাতাদের সামনে গিয়ে বাবাগো মলাম গো—করলে ঠিক হত, তাই না? আচ্ছা, পরের বারে তাই করব—

পরের বারে যেন থাকবে আবার! কোথা থেকে ক'দিনের জন্য এসে আমার মায়া বাড়াচ্ছে। এই একটা দিনই তো একটু যা পাঁচটা মেয়ে-বৌয়ের সঙ্গে দেখা হয়, এই লক্ষ্মীপুজোর দিনটা। হাজার অসুবিধে সত্ত্বেও আমি তাই এই পুজোটা ছাড়িনি। প্রথম প্রথম বাবাইয়ের বাবা কতো রাগারাগি করেছে, গুচ্ছের পয়সা নষ্ট বলে। বলত কোলিয়ারিতে তোমাদের ওসব শহুরে পুজো চলবে না, কোলিয়ারিতে চলে দুটো পুজো—কালী আর বিশ্বকর্মা। কথাটা ভুল নয় অবশ্যি, কালীপুজো আর বিশ্বকর্মাপুজোয় এখানে দুর্গাপুজোর চেয়েও বেশি ধুম। কিন্তু সে অন্য ব্যাপার, ওসব জায়গায় মেয়েরা যায় না। বাচ্চারা যায় সকালবেলা, সাজানো দেখতে। কিন্তু আমাদের এই কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো—এ আমাদের নিজেদের। প্রথম প্রথম কেবল এই কোলিয়ারিরই অফিসারদের বৌরা আসত, অবশ্য ডাক্তারের গিন্নিও। এখন কিন্তু আমাদের হাজারীবাবু মানে ওদের অফিসের ক্লার্ক, তার বৌও আসে, আশপাশের একটু দূর থেকেও আসে দু-চারজন। আসে মানে কি, নেমন্তন্ন করে আসি গিয়ে কিংবা দুর্গাপুজোর সময়ে মণ্ডপেও বলে দিই। সারাবছরে আর তো দেখাশোনার পাট নেই। অন্যরা যদি বা একটু বেরোয়, এর ওর বাড়ি যায় কখনো, আমার সে সব বালাই নেই। চারটে বাচ্চা সামলে কোথায় যাব! তারপর আমার ছেলেমেয়েরা দুষ্টু, ওদের কোথাও নিয়ে যাওয়া যায় না, রেখে যাব কী করে। কী বিপত্তি বাধিয়ে রাখবে! তাছাড়া ওদের বাবা বেশি পছন্দ করেন না কারো বাড়িটাড়ি যাওয়া, বলেন, মেয়েদের

আর কাজ কী, কেবল এর ওর নিন্দে আর শাড়ি গয়না রান্নাঘর এই সব বাজে কথা।

ওসব আড্ডায় যাওয়ার কোন দরকার নেই।

শোন কথা!

আমরা নাকি কেবল পরের কুচ্ছো করি আর হাঁড়ি-হেঁসেলের গল্প করি। আর যদি করিই বা, হাঁড়ি-হেঁসেল ছাড়া আর কি কিছু আছে এখানে? হাঁড়ি-হেঁসেল যদি বাজে কথা হয় তো আমরাও তাহলে বাজে লোক। সে অবশ্যি উঠতে বসতে শুনি—ছোটবুদ্ধি নির্বুদ্ধি। কিন্তু এই নির্বুদ্ধিগুলোই তো তোমাদের সংসারের উনকুটি সামলায়। সংসারের ঝামেলা সামলাতে যে কত বুদ্ধি কত ফন্দি লাগে সে জানে কেবল যাকে সংসার করতে হয়। আর সংসার ছাড়া করবই বা কি! ত্রিসীমানার মধ্যে একটা বাড়ি নেই যে দুটো কথা বলব, কি একটা মানুষের মুখ দেখতে পাব। থাকার মধ্যে ঘরের দুয়োর দিয়ে রাস্তার বদলে আছে একটা রেল লাইন, সেই সকালে একটা ট্রেন চলে যায় ভজুডি গোমিয়ার দিকে, আর সন্ধ্যেবেলা ফেরে। ট্রেন না ছাই, কেবল কুলিদের নিয়ে যায় আর ফেরে। চার কামরার গাড়ি, তার ধোঁয়ায় আর চিৎকারে মাথা খারাপ। পাশুববর্জিত এরকম একটা জায়গায় এত রাগী একটা লোকের সঙ্গে যদি বিয়ে দেবে তবে কি করতে আর পড়াশোনা শিখিয়েছিল বাবা? আবার নাম দিয়েছিল সরস্বতী। সারা বছরে একটা বই চোখেও দেখি না কখনো। ছেলের চাকরি ভালো, স্বাস্থ্য ভালো—ব্যস। মেয়ের বিয়ে দিতে এর বেশি আর কিছু লাগে না। বিয়ের পর এই এগারো বছরে দুটো নষ্ট হয়ে চারটে ছেলে মেয়ে, এখন তো তারাও বড় হতে চলল,। সুমিতই তো ছয়, তারপর রানী। রানী এই সামনের মাসে পাঁচে পড়বে। ও হবার সময়ে একেবারে মরতে বসেছিলাম, তাইতে ডাক্তার জোর করেই অপারেশান করে দিল। ওই মরতে বসেছিলাম বলেই বাঁচলাম, না হলে, মনে হত, সারাজীবন ধরে প্রতিবছর আমাকে সেই ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করে যেতে হবে। লোকে কথায় বলে প্রসবযন্ত্রণা আর তার আগে অতগুলো মাস, শরীর খারাপে মনে হত মরে যাব। কিন্তু মুখে এক গ্লাস জল ধরার কেউ নেই।....সে যে কী কষ্ট—। মা বলত ছেলের মুখ দেখলে নাকি সব কষ্ট ভুলে যাব, কে জানে, আমার কিন্তু বেশ মনে আছে বাপু। হ্যাঁ, বাচ্চাকে কোলে পেলে কোন মায়ের না বুক জুড়িয়ে যাবে, কিন্তু তাবলে সেই মরণাধিক কষ্টের কথা কেউ ভুলতে পারে। তাই তো ভাবি নন্দিতাকে দেখে দেখে। বুঝতেই পারি এও সেই একই কাজ করেছে। আমাকে না হয় বাবা-মা দেখে বিয়ে দিয়েছিল আর এ বাড়ির অমতে বিয়ে করে পালিয়ে এসেছে। বোস সাহেব বললেন বটে ভাই ভাইয়ের বৌ। কিন্তু এটুকু কি আর বুঝব না! কাছাকাছির মধ্যে ওই একটাই কোয়াটার, বাড়ি থেকে পঁচিশ-ত্রিশ পা হাঁটলে বোস সাহেবের বাড়ি, তা তিনি তো আবার অ-সংসারী মানুষ। এক নিজে আর এক ওই ঝরি—চাকর বলতেও সে, ঠাকুর বলতেও। আসলে ওতো কোলিয়ারির মালকাটা, সাহেবের বাড়িতে কাজকর্ম করে, অফিস থেকেই হাজরি পায়। সব সাহেবদের বাড়িতেই থাকে

দু-তিন জন, বাগান করে, বাসন কাপড় ঘরদোর পরিষ্কার করে। কোন কোন বাড়িতে রান্নাও। আমার সংসারে অবশ্যি বাইরের লোকের রান্না করার জো নেই, উনি সে খাবার মুখে তুলতেই পারবেন না। এক যখন সেই আঁতুড়ে থাকতাম তখনই যা ওই মালির বৌ এসে রান্না করে দিয়ে যেত। এঁর দুই বোন নিজের নিজের সংসারের গিন্নি, তারা পাঁচ বছরে একবার কখনো বেড়াতে আসে। এসেও অস্থির হয়,

—বাবাঃ কি তোমাদের জংলি জায়গা, একটা মানুষের মুখ দেখা যায় না, একটা বাজার দোকান নেই। একটা সিনেমা হল বলতে সেই গোমিয়া। বৌদি যে কী করে এখানে থাকো!

না থেকে যেন আমার উপায় আছে কোন! আমার বাপের বাড়ির কেউ এখানে আসে না। ইনি পছন্দ করেন না, তারাও সবাই এঁকে ভয় পায়। একটা ম্যানেজার মানুষ, তার ওপর অতো গম্ভীর। বাবাই হবার আগে মায়ের কাছে নিয়ে যাবার জন্য বাবা এসেছিলেন সেই একবার আর তিনমাসের ছেলে কোলে দাদা পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। সেও তো এ বাড়ি নয়, চুঁচড়োতে শ্বশুরবাড়ির সংসারে। এখানে কেউ একবার উঁকি দিয়েও দেখতে আসেনি যে কোথায় পড়ে আছি। কেই-বা আসবে! মা না থাকলে কারো কি আর তেমন প্রাণ টানে! এত বছরে আর ক-বার গিয়েছি বাপের বাড়ি! এই মেয়েটা এমনিতে কিন্তু ভালো। এই নন্দিতা। ভারি হাসি-খুশি। কীই-বা বয়েস হবে? তেইশ-চব্বিশ হয়তো। বোসদার মাকে দেখেছিলাম একবার। এছাড়া আর কখনো অন্য কোনো আত্মীয়স্বজনকে প্রায় দেখিনি। নন্দিতাকে যেদিন প্রথম দেখলাম আমি তো প্রথমে ভেবেছি বোসসাহেব বুঝি বিয়ে করে ফেলেছেন, শেষে গিয়ে তো শুনি ভাই বৌ। ভাই নাকি চাকরি করে ধানবাদে, সপ্তাহে এক-দুদিন আসতে পারবে। মেয়েটি নাকি অসুস্থ। কিছুদিন বিশ্রামের জন্য এখানে এসেছে। অবশ্য এটাও সত্যি যে ওর চেহারাটা কেমন যেন ফ্যাকাশে মতন, হতেও পারে অসুস্থ। কিন্তু অন্য কি একটা গোলমাল আছে মনে হয় আমার। একবার ওর স্বামী এসেছিল, সেও বেশ ছেলেমানুষ, বোসসাহেবের সঙ্গে কোন মিলই নেই চেহারায়। আমার কিন্তু মনে হয় ওরা বিয়ে করে পালিয়ে এসে এখানে লুকিয়ে আছে। হয়তো বাড়িতে মেনে নেয়নি কিংবা খুব রাগারাগি চলছে। একটু শান্ত হলে তখন আবার ফিরে যাবে। বাড়ি ছেড়ে কারো কথা না শুনে ওভাবে চলে আসা—ভয় করে না? নাকি হয়ত যাকে ভালোবাসে তার ভরসায় আসে। জানে না তো মেয়েজন্ম কত যে কঠিন। প্রেম করেই হোক সম্বন্ধ করেই হোক, বিয়ে হয়ে একবার এসে ঢুকলে আর বাকি সব রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। দু-দিন আগেই হোক আর পরেই হোক। নিজের অতীতের আর কোন পরিচয়ই থাকবে না কোথাও। কখনো যে গান গাইতাম, পড়াশুনো করতে ভালোবাসতাম, লোকজন হাসিখুশি—সমস্ত ভুলে গেছি। এই দামাল বাচ্চাদের সামলে সামলে বড়ো করতে থাকা, রান্না সেলাই ঘর পরিষ্কার আর যেদিন ওঁর মনে হল, কাছে যাওয়া। যখন নাইট ডিউটি চলে তখন তো কতোদিন

সকালবেলাও—ভয়ে লজ্জায় মরি, যদি ছেলেরা জেগে ওঠে। কিন্তু বলবার সাহস হয় না।

আর এখন তো বাবাইকে নিয়েও ভয়। স্কুলে যায়না ঠিকমত। ক্লাস সেভেন হল, এই তো গত বছর থেকে গোমিয়ার হাইস্কুলে যাচ্ছে। ইংরিজি স্কুল, তাদের চালচলনও যেন কেমন আলাদা। কথা শোনে না। প্রাইভেট পড়তে যায় তিনশ টাকা করে মাইনে হাতে দিয়ে দিই মাসের প্রথমে, এখন শুনেছি গতমাস থেকে পড়তেও যায়নি, মাইনেও দেয়নি। স্কুলবাসের অন্য একছেলে আমায় বলল। শাসন করতে গেলে, বাবাকে বলে দেব বললে ছেলে আমাকে ভয় দেখাচ্ছে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবে বলে। আবার যে পড়তে যাওয়া শুরু করবে গতমাসের তিনশ টাকা কি করে ভরব আমি? সেটা না দিতে পারলে তো সামনের মাসেও যেতে পারবে না। তারপর যদি কোন রকমে ওঁর কানে ওঠে। তাহলে যে কী হবে সে আমি ভাবতেও পারি না। এত পাগল-পাগল লাগছে এই দুশ্চিন্তায় যে এক-একবার ভাবছি নন্দিতাকেই বলব। মুস্কিল হচ্ছে ওদের কথা তো আমি এঁকে বলিনি। কে জানে কি আবার বলবেন, সবচেয়ে বড়ো কথা আমাকে রাগ করবেন। তুমি ওখানে যাচ্ছিলে কেন, বোসসাহেব একা লোক, ঘরসংসার নেই—ওঁর বাড়িতে তোমার কি? খেয়ালও করেন না বোধহয় যে বোসসাহেব আজ একমাস ধরে বাড়িতে থাকেনই না। টানা নাইট ডিউটি করছেন কোলিয়ারিতে, সেখানেই অফিসার্স মেসে খাচ্ছেন ঘুমোচ্ছেন।

এই মেয়েটার ভারি সাহস। কোন কিছুতে ওর মুখ গম্ভীর হয় না। ভাবছি ওকেই বলি শেষ অবধি। ও ঠিক বুঝতে পারবে। কী মায়াবী মেয়ে! যখন ইনি বাড়িতে থাকেন না, ও হাঁটতে হাঁটতে ঠিক চলে আসে। মুখখানা ভারি ফ্যাকাশে, চোখের কোলে একটু কালি। দেখলে মনেই হয় যেন ওর শরীরটা সুস্থ নয়। তবু আমার সঙ্গে হাতে হাতে কতো যে কাজ করে দেয়। টেবিল গোছায়, আলনা গোছায়, হাত থেকে বঁটি কেড়ে নিয়ে তরকারি কাটতে বসে। আর সবসময়ে আমাকে বলে,

—অতো ভয় পান কেন আপনি? কি হবে ভয় না পেলে?

কী করে জানব কি হবে ভয় না পেলে? কোনো দিন তো কাউকে শুধোইনি। ছোট থেকে মাকে দেখেছি বাবাকে ভয় পেতে। জ্যাঠাকে জেঠতুতো দাদাদের ভয় পেতে। বড় হতে হতে কেবল শুনেছি মেয়েমানুষকে নরমসরম হতে হয়। কথা মেনে চলতে হয়, মুখে মুখে জবাব করতে নেই। বিয়ে হয়ে এসেও ভয়ে ভয়ে থাকতাম। এক আমার শাশুড়ি বলতেন অবশ্য মাঝে মাঝে, ভয়ে মরতে থাকিস কেন সর্বক্ষণ? নিজের বুদ্ধিতে কাজ করতে পারিস না? কিন্তু সে আর ক'দিন? বাবাই তিন বছরের আর মন্দিরা দশ মাসের—সেই তখন এখানে এলাম। পাঁচবছরও পুরো থাকিনি শাশুড়ির কাছে। আসবার আগেও বলেছিলেন,

—শোন বাপু, আমার ছেলেদের বড্ড মেজাজ। এদের বংশের ধারা। ভয়ে থাকতে গিয়ে সারাটা জীবন আমি হাড় ভাজাভাজা হয়েছি। এই তোকে আমি ভালো

কথা বলে দিলাম অকারণে ভয় করবি না। সংসার চালাতে হয় মেয়েমানুষকে, তার তেজ না থাকলে কেউ তাকে মানবে না। ভালোমন্দের বুদ্ধি তো তোকেই শেখাতে হবে—ছেলেমেয়ে যদি তোকে মান্যি না করে তাহলে কি তোর কথা শুনবে?

আজ ভাবি বলেছিলেন তো সত্যিকথাই, কিন্তু আমি কাজে লাগাতে পারলাম কই? মা যদি থাকতেন মাথার ওপর তাহলেও হয়ত একটু সাহস বাড়ত। তাও কি হল? নন্দিতাকে দেখে তাই অবাক লাগে আমার। কেমন করে বাড়ি ছেড়ে এসেছে এতদূরে? এই ঝোপ-জঙ্গলে ঘেরা অতোবড়ো বাড়ি, থাকবার মধ্যে ওই তো এক ঝরি, দু'বেলা দুটো কী রেঁধে দিয়ে যায়। সেও তো মাতালের মরণ।

গোমিয়ার গাড়ি চলে গেল। এবারে ওদের স্কুলবাস এসে পড়বে। কে জানে আজও স্কুলে গিয়েছিল কি না বাবাই? জিজ্ঞেস করতেও ভয় করে, খুব রেগে ওঠে যদি!

নন্দিতা

কাল ভোরে আমার এখান থেকে যাওয়া। একমাসেরও বেশি থাকা হল। পেপটিক আলসার অপারেশনের পরও ঠিক স্থির হয়ে কোথাও থাকা যাচ্ছিল না। পুলিসের ঝঞ্ঝাট তো ছিলই, যে সব শেল্টারে থাকার ব্যবস্থা হচ্ছিল সেগুলোও যেন কেমন। রাজনীতির ব্যাপারটা তাদের মাথায় ঠিকভাবে নেই, মানে হয়ত বোঝানো হয়নি, বরং খানিকটা ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ইত্যাদির কারণে তারা জায়গা দিতে রাজি হচ্ছিল। ওরকমভাবে কি স্থির হয়ে থাকা যায়। এই যে শেষ যেখানে ছিলাম, খোকন আর বীরুদার সঙ্গে—ওটা কি একটা পলিটিক্যাল শেল্টার? শোভনবাবু বীরুদার অনেক উপকার করেছেন একসময়ে আর শংকর, ডিস্ট্রিক্ট কমিটি সেক্রেটারি শোভনবাবুর পুরোন প্রতিবেশী। শোভনবাবুর চরিত্র সম্পর্কে তাঁর নাকি খুব শ্রদ্ধা আছে। মুস্কিল হয়ে দাঁড়াল খোকন আর বীরুদা দুজনেই খুব ভালো, খোকন একটা বাচ্চা ছেলে, আমাকে প্রায় দিদির মত যত্ন করতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু একটা পুরো খাদান শ্রমিক এলাকার মধ্যে ওরা দুজনই মাত্র বাবু। কোলিয়ারি অফিসে চাকরি করে। সেখানে রাজনৈতিকভাবে আমার আশ্রয় হওয়ার কথা ওই শ্রমিকদের কাছে, আমার থাকা উচিত ওদের ওপর নির্ভর করে। অথচ ওপরতলার কমরেডরা নির্দেশ দিলেন শ্রমিকরা যেন কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে কোন পার্টি কর্মী এখানে আছে। এমনকি বীরুবাবুদের বাড়িতে যে নতুন এসেছে সে যে মেয়ে একথাও যেন কেউ জানতে না পারে। শুনে হাসব না কাঁদতে বসব ভেবে পাই না। এটা কি থিয়েটার? একটা চব্বিশ বছরের মেয়ে পাজামা পাঞ্জাবী পরে থাকলে, তাকে সামনাসামনি দেখতে না পেলে শ্রমিকরা, তাদের বাড়ির লোকেরা বাচ্চারা তাকে ছেলে ভাববে? যে পাঁচদিন ছিলাম রোজ রাত্রে এসব নিয়ে তর্কাতর্কি চলতে চলতে বিশ্রাম নেওয়া

মাথায় উঠল। খোকন তবু ব্যাপারটার ভুল দিকটা দেখতে পাচ্ছিল, কিন্তু তার কিছু করবার সাহস নেই। ওরা দু'জন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারল না যে শ্রমিকরা সত্যিই আশ্রয় দেবেন, জেনে বুঝে দেবেন। বিশ্বাস করল না যে মধ্যবিত্তদের থেকে শ্রমিকদের রাজনীতি বুঝবার ক্ষমতা অনেক বেশি। কিন্তু অন্য অঞ্চলে এসে তাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সত্যিসত্যি কোন কাজ তো আমি করতে পারিনা, পার্টির ডিসিপ্লিন না মানলে তো বিপদের মধ্যে পার্টির কোন অস্তিত্বই থাকবে না। আমার নিজের অঞ্চলে এই অপারেশানের খবর কিছুতেই লুকোন সম্ভব ছিলনা বলেই তো এত হাঙ্গামা করে এতদূবে নিয়ে আসতে হল। এইসব ঝামেলা, নানা জায়গায় নানা অবস্থায় থেকে বারোদিনের মাথায় অপারেশানের সেলাইয়ে যখন সেপটিক হয়ে গেল আর গাঁয়ের হাটের মধ্যে এক হাতুড়ে ডাক্তার বেআইনি অ্যাবরশনেব ছল করে কোনমতে সেটাকে সামলালেন, তারপর রাতারাতি জানিনা কি সিদ্ধান্ত নিযে সাগর মন্নুদাদা আব বিজু গাড়ি করে এনে আমাকে এখানে নামিয়ে দিয়ে গিযেছিল। প্রবাল বসুর নাম আমি কয়েকবারই শুনেছি, জানতাম একেবারে নিতান্ত দরকাবে এই শেল্টারটা ব্যবহার করা যায়। প্রথম প্রথম আমার বিচ্ছিরি লাগছিল। এ তো একরকম অজ্ঞাতবাস, মাটির তলায় লুকিয়ে পড়ার মত আন্ডারগ্রাউন্ড। ঝরির রান্না ঝরঝবে ভাত ডাল আলুপোস্ত খাও আর ধব্‌ধবে বিছানাপাতা খাটে শুয়ে থাকো, যখন কিনা খাকি কুকুররা তোমার সঙ্গীদের রক্তের গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জানি, আমি অসুস্থ অচল হয়ে থাকলে ওদের আরো একটা বোঝা বাড়ে—আমার থাকার ব্যবস্থা, আমাকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। প্রায় একটা ঢ্যাবা পোঁটলার মত হয়ে গিয়েছি। সেখানে ওদের বোঝা খানিক হাল্কা করে এখানে শুয়ে থেকে আমি যদি সুস্থ হয়ে উঠি সেটাই আমার দরকারি কাজ। তবু, ভাবনা বলেও তো একটা জিনিস থাকে—

বোসদার কথা শুনে শুনে ওঁকে আমি যেরকম ভেবেছিলাম সেরকম কিছুই নন। বেশ ভারী চেহারার মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক। স্নেহপ্রবণ। আমাকে অনেক বোঝাচ্ছিলেন কেন আমার এখানে নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে থাকা উচিত। ঝরিকে শক্ত করে বলে গেলেন দিদিকে কিছু কাজ করতে না দেওয়ার কথা। সব কিছুর মধ্যেও আমার একটু মজা লাগল যখন দেখলাম উনি আমার সঙ্গে একবাড়িতে রাত্রিবাস করবেন না, টানা নাইট ডিউটি নিয়ে কোলিয়ারির কাছাকাছি অফিসার্স মেসে থাকবেন। এরকম থাকাটা নাকি ওঁর পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু একদিন অন্তর অন্তর এসে আমার খোঁজ নিয়ে গিয়েছেন রীতিমত। রান্নাঘরে টিন কৌটো খুলে দেখেছেন কিছু লাগবে কি না। উনি একেবারে নিকষ্য নিরামিষাশী। ব্রহ্মচর্যে বিশ্বাসী। বাড়িতে নানা দেওয়ালে বিবেকানন্দর ছবি টাঙানো। কিন্তু একটা ব্যাপার আছে, বোসদার ভয় নেই। এটা বেশ আশ্চর্য। আমরা এসে পৌঁছেছিলাম শেষ বিকেলে। সাগর রয়েছে তখনও, উনি আমাকে বললেন, আমাদের স্নানের ঘরটা তো ব্যবহার হয় না, ওখানে

খাবার জলের জালা থাকে। তুমি আজ ওই একপাশে স্নান করে নাও, কালকে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আমি টলমলে পায়ে ঢুকতে গিয়ে দেখি জালার পাশে আধভেজা বালির ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে ফণা তুলে বসা এক গোখরো। হলদেটে ফণার ওপর স্পষ্ট দাগ আঁকা।

বোসদা, ওখানে সাপ বসে আছে এসে আস্তেআস্তেই বললাম। সাপের ভয় পাইনা বলে একটু প্রচ্ছন্ন গর্ব আছে আমার মনে। বোসদা কিন্তু সাগরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে একই রকম নিরুত্তাপ সুরে বললেন, হ্যাঁ, গরমে ও মাঝে মাঝে আসে। একটু পরে চলে যাবে।

পরদিন থেকে সেই ঝোপঝাড়ে ঘেরা জঙ্গলকেল্লায় একা কুম্ভ আমি আর কিছুক্ষণের জন্য ঝরি। যখন ঝরি থাকে না আমি উঠে আস্তে আস্তে রান্নাঘরে গিয়ে তাকে রাখা ধোঁয়ায় কালো কৌটোগুলো খুলে দেখি। কোনটায় বাতাসা, কোনটায় মুগডাল, একটা কালো চট্‌চটে শিশিতে ভালো ঘি। আর এই টিন কৌটো থেকেই সেণ্টু বৌদির বাচ্চাগুলোর সঙ্গে আমার আলাপ হল। দু-চারদিন পর মানে শুয়ে থেকে থেকে খানিকটা সজুত হবার পর থেকে দেখি সকালের দিকে কোনো কোনো দিন দুটো ফুটফুটে বাচ্চা এসে ঝরিকে এটা ওটা জিজ্ঞেস করে আর ঝরি তাদের তাড়া দিয়ে একেবারে বাগানের গেট খুলে বার করে দেয়। একদিন ঝরিকে বারণ করে আমি তাদেব ঘরে ডাকলাম। ঝরি গজ্‌গজ করে বদমাশ-টদমাশ কী সব বলতে লাগল। ছোট্ট একটা মেয়ে। দুজনেরই চোখ বুদ্ধিতে ঝক্‌ঝকে। শুনলাম তারা পাশের বাংলোটায় থাকে। ঝোপের ওপারে ঐযে বাংলোটার বাইরে শাড়ি মেলা আছে, সেখানে। ওটা মায়ের শাড়ি। মায়ের নাম সেণ্টুদি। দু-চারটে কথা বলবার পরই আমার চোখে অন্ধকার হয়ে যায়, হাত-পা ঝিম্‌ঝিম করে। আমি চোখ বন্ধ করে চুপ করে শুয়ে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়ি, ওরা কখন বিছানা থেকে নেমে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে যায়। এটা তারপর চলতে লাগল।

একদিন ওরা ফিরে যাবার বোধহয় অল্প খানিক পরই ওদের সঙ্গে করে নিয়ে ওদের মা এলেন। ঘরে ঢুকে মেঝের দিকে তাকিয়ে কেমন হতবাক হয়ে রইলেন। আমি মাথা তুলে দেখি দরজা পর্যন্ত, দরজা ছাড়িয়ে সিমেন্টের বারান্দারও মেঝেতে কেমন একটা চওড়া সাদা দাগ। ইঞ্চি তিনেক চওড়া। এটা কী? এটা আসছে কোথা থেকে? ঝুঁকে দেখি সেটা শুরু হয়েছে আমার খাটের তলাকার কোন অন্তরাল থেকে? কী এটা? চিনি। চিনি! হ্যাঁ চিনি। বমাল গ্রেফতার দেবশিশু দুটির হাতের মুঠোয় পায়ের পাতায় মুখে জামার পেটে বুকে ঝুরো কিংবা চট্‌চটে চিনি লেগে আছে। সন্ধানে বোঝা গেল আমার শুয়ে থাকার চৌকির নিচে একটি বড় সাইজের বিস্কুটের টিন ভর্তি চিনি স্টক করে রাখা আছে। সেই মজুতদারির বিরুদ্ধেই দুই খুদে যোদ্ধার অভিযান।

ছি ছি ছি—কী হবে বলুন দেখি! কী মনে করবেন বোস সাহেব? সেই আমার সেণ্টু বৌদির সঙ্গে আলাপ। আমি কে, কী করে এখানে এলাম এসব কথায় এক কাল্পনিক শ্বশুরবাড়ি, বরের চাকরির অনিশ্চয়তা, অসম্ভব দয়ালু ভাসুর (হ্যাঁ সত্যি, বোসসাহেব তো ঋষির মত মানুষ। এতো বড় চাকরি করেন এতো বড় বাড়ি—নিরামিষ খান একলা থাকেন) অসুখ করেছে বলে দুঃস্থ ভাইয়ের বৌকে বিশ্রামের জন্য এনে রেখেছেন। পুরোটা বিশ্বাস করলেন কিনা বোঝা গেল না অবশ্য। আমিও প্রথম দু-তিন দিন একটু অস্বস্তিতে রইলাম। রাত্রে কোথাও কুকুর ডাকলে উঠে বসে থাকি। পেছনের দরজা দিয়ে বেরুলে বিশাল ছাইগাদা, তার পর বুনোকুল আর পুটুস গাছের কাঁটা ঝোপ, মাথা ছাড়িয়ে বেশ উঁচু। কতদূর যেতে পারব জানিনা, কিন্তু অন্তত এই বাড়িটার ভেতরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে খাকিদের হাতে পড়ব না।

সাগর একবার দেখা করে, সব খবরাখবর দিয়ে চলে যাবার পর থেকে মনে হয় হয়ত আর কোনদিন ওকে দেখব না। হয়ত এ্যারেস্ট হয়ে যাবে, গুলি খেয়ে পড়ে থাকবে কোথাও—আমি জানতেও পারব না। সাগরকে বিনাযুদ্ধে ধরা যে সম্ভব নয় সে আমরা সবাই জানি। আসলে কাজকর্ম থেকে মানুষজন থেকে অনেকদূরে হাতগুটিয়ে বসে থাকার জন্যই যে মনের মধ্যে এইসব আজেবাজে চিন্তা আসে, তাও বুঝি।

একটু একটু করে সুস্থ হচ্ছি। বাড়ির ভেতরে হাঁটা চলা করতে পারি। বীভৎস একটা তেঁতুলবিছের মত দেখতে স্টীচ্‌টাকে। দেখলে নিজেরই গা কেমন করে। সেণ্টুবৌদি কিন্তু প্রায় প্রতিদিনই আসেন। নানারকম গল্প করেন একটুখানি সময়, আবার দৌড়ে চলে যান,

—না ভাই, আমার সব কাজ পড়ে আছে।

ছোটখাটো মানুষটি, ফর্সা কপালে এতবড় টিপ ঘিরে হালকা কোঁকড়ানো চুল। চলাফেরা করেন প্রায় দৌড়ে। সবসময়েই কেমন একটু সন্ত্রস্ত হয়ে থাকেন। একদিন সেণ্টুবৌদি থাকতে থাকতেই বোসদা এসেছেন। বললেন,

—ও আপনার সঙ্গে এর ভাব হয়ে গিয়েছে? তবে তো ভালোই। ডাক্তার বলেছে শুয়ে থাকতে, খাওয়া দাওয়া করতে—গায়ে রক্ত নেই।

আমি দেখছি বোসদা ঠিক বৌদির দিকে তাকিয়ে নয়, যেন একটা অনির্দিষ্ট শূন্যের দিকে তাকিয়ে কথা বলে যাচ্ছেন আর বৌদি মেঝে থেকে চোখ না তুলে দেওয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে। স্থাণুবৎ।

কিন্তু যখন আমি একা থাকি, বৌদি অনেক কথা বলেন। নিজের ছোটবেলার কথা, ভাইবোনদের কথা। শুনে আশ্চর্য, বৌদির নাম নাকি সরস্বতী। এইটে তো ডাক নাম। এখানে আর কে-বা ডাকবে সরস্বতী বলে। কয়েকদিনেই আমি বুঝতে পেরেছি বৌদির আমার কাছে ছুটে ছুটে আসবার কারণ—একটা কথা বলবার লোক পাওয়া। সেই লোকটা আবার এই কোলিয়ারির বাইরে যে পৃথিবী সেখান থেকে এসেছে।

জুলিয়াস ফুচিকের লেখা পড়ছি। বইটা রাখি মাথার নিচে বিছানার তলায়। পরিষ্কার নীল আকাশের গায়ে হালকা সাদাসাদা মেঘ। কতোদিন ধরে কতো মানুষ নির্ভয়ে নিজেদের প্রাণ দিয়েছে যেন এই সুন্দর পৃথিবীতে সমস্ত খাটিয়ে মানুষ সুখে থাকতে পারে, সে জন্য। বীর কারা সে কথা লিখতে গিয়ে ফুচিক লিখছেন, আমাদের মনে বীরে'র ধারণা তৈরি করে দিয়েছে এমন এক শ্রেণী যাদের নিজেদের কোন বীরত্ব নেই। তাই তাদের 'বীর'রা শৌর্য দেখাবার জন্য চিৎকার করে, লাফায়, বিচিত্র মুখভঙ্গী করে। সত্যিকারের বীর এরকম নাটুকেপনা করে না। সে খুব ধীরস্থিরভাবে জরুরি সিদ্ধান্ত নিতে পারে, নির্ভয়ে তা পালন করতে পারে, সেইকাজে নিজের প্রাণ দিতে হলেও সে একবার দ্বিধা করে না।' ভাবলে মনটা কতো যে বড়ো হয়ে যায় যে এঁদেরই দেখানো পথ দিয়ে আমি চলবার চেষ্টা করছি, এঁরা আমার সহযাত্রী, সাথী। সমস্ত মানুষকে ভালোবেসে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে। কতো কষ্টে জীবন কাটায় মানুষ অথচ সেই কষ্টের অবসান করতে, প্রতিবাদ করতে ভয় পায়।

সেণ্টুবৌদির বাড়িতে গেলাম একদিন। ক'দিন ধরেই বারবার বলছিল কোজাগরী পুজোর দিন বাইরের লোকজন খাবে, কী করে সামলাবে। আমাকে বলছিল,

—তুমি তো ভাই কি সুন্দর কথা বলো, তুমি একটু যারা আসবে সবার সঙ্গে কথাবার্তা বোল, আমি ততক্ষণে সকলের লুচিগুলো ভেজে নেব।

আমি যে কেন অন্য কারো সামনে যাবো না সে তো আর ওকে বলতে পারিনা, কাজেই ভরসা দিতে হল যে লুচি আমিই ভেজে দেব, কিন্তু ওই মহিলাদের জটলায় যাবো না। বললাম,

—নানা জন নানারকম কথা জিজ্ঞেস করে বৌদি, আমার ভালো লাগে না।

মনে হল বৌদি অখুশি হয়নি। এই ক'দিনে বারবারই বলেছে,

—জানো, সারাবছরে ওই একটা দিনই আমি একটু সকলকে আমার বাড়িতে ডাকি। বাবাইয়ের বাবা অবশ্যি পছন্দ করেনা, কিন্তু ঐ দিনটায় কিছু বলে না। বাজারও করিয়ে দেয়।

বৌদির বাচ্চাগুলো কিন্তু বিটকেল ধরনের দুষ্টু। দুষ্টু না বলে ওদের 'পাজি'ই বলা যায় বরং। আমার সবচেয়ে খারাপ লাগে যখন দেখি বৌদিকে ভয় দেখানোটাই যেন ওদের খেলার প্রধান মজা। ভদ্রলোক যেদিন নাইট ডিউটি করে এসে ঘুমোন, বৌদি দরজা ভেজানো ঘরটার আশপাশ দিয়ে প্রায় পা টিপেটিপে চলাফেরা করে, ফিসফিস করে কথা বলে। সুমিত আর রানী দেখি মায়ের ওই ভয়ে ভয়ে থাকাটাই এক্সপ্লয়েট করে। মাখা আটার তাল থেকে খানিকটা দাও, সেটা রং করব বলে হলুদ গুঁড়োর প্যাকেটটা দাও, বাগানের বড় বড় গোলাপ তুলে এনে ছিঁড়ে কুটি কুটি করছে 'পুজো করছি' বলে—আর কোনটাতে বৌদি এতটুকু ধমক দেবার চেষ্টা করলেই ভয় দেখাচ্ছে, তাহলে কাঁদব কিন্তু, বাবা উঠে যাবো।

এমন মিষ্টি দেখতে ফুটফুটে দুটো বাচ্চা, কিন্তু মাকে ওরা ভালোবাসতেই শেখেনি।

কে জানে কেন? আমি যে দু-একদিন ওদের বাড়ি গিয়েছি সেটা ওই দশটা-এগারোটার সময়। বড় ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠিয়ে তখন বৌদি স্নান করে আসে। রান্নাঘরে ঢোকে। আমি বিচ্ছুদুটোর সঙ্গে গল্প করি। গল্প বললে চুপ করে শোনে বটে কিন্তু আমি তো এখনও খুব বেশিক্ষণ একটানা কথা বলতে পারি না। বৌদির সঙ্গে কথা বলবার সুবিধা হল আমাকে কম বলতে হয়, বৌদিই বলে। ওর বড় দুই ছেলেমেয়ে বাণী আর বাবাইকে দেখেছি কম। ওরা নটায় স্কুল চলে যায়, তিনটের সময় ফেরে। বাণী দু-একদিন এসেছে পড়া বুঝতে, বাবাইকে একদিন বললাম যাবার কথা, বলল, আমার প্রাইভেটের স্যার আছে। বোঝাই গেল মেয়েদের কাছে পড়া দেখতে যাওয়ার প্রস্তাবে তার পৌরুষে লেগেছে। এমনিতে ছেলেটা খারাপ নয়, বাচ্চাই তো। কতো আর বয়েস হবে। তবে দিব্যি ফ্যাশন দুরস্ত। সরু পা-অলা প্যান্ট ছুঁচলো মুখ জুতো পরেছে যখন কি না ওকে 'নটি বয়' পরলেই বেশি মানাবে।

কোজাগরী পুজোর দিন আরেক কাণ্ড। লুচি কি আমি ভেজেছি কোন দিন! মা ভাজত, দেখেছি—এই পর্যন্ত। মায়েরও কোজাগরী পুজো আজ, হয়তো বাঁ-হাতে চোখের জল মুছেমুছে কাজ করছে। বৌদির এখানে চুপচাপ রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে লুচি ভাজতে গিয়ে যেন কোথাও একটু মায়ের কাছাকাছি যাচ্ছি। মুস্কিল হল লুচিটা যতোবার কড়ায় ছাড়ছি আমার মাঝের আঙুলের মাথাটা প্রত্যেকবার একটু করে গরম ঘিয়ে ডুবে যাচ্ছে। খানিকটা জ্বালা করছে বটে কিন্তু লুচি ফুলছে এমন দারুণ যে দেখে আমি চমৎকৃত। বেলবার ফাঁকে ফাঁকে আঙুলটা একটু মাখা ময়দার মধ্যে গুঁজে রাখলেই ঠাণ্ডা লাগছে। রাণী মায়ের সঙ্গে পুজোর কাজ সামলাচ্ছিল, বাবাই বরং রান্নাঘর থেকে খাবারদাবার নিয়ে নিয়ে দিচ্ছিল মায়ের কাছে, ও কোন ফাঁকে দেখেছে আমাকে ময়দায় আঙুল চেপে রাখতে। ব্যস্, সব মিটে যাবার পর রান্নাঘরে এসে আঙুলের দশা দেখে বৌদির কান্না। যতো বোঝাই যে এমনকিছু বেশি লাগেনি আমার, দু-একদিনে সেরে যাবে—কেন কার কথা শোনে।

বাবাই আর রাণীকে একদিন মাদাম কুরীর ছোটবেলার গল্প বললাম। ওর মাকে ভালোবাসা, মা মরে যাওয়া, ওদের কষ্টের জীবন, মানিয়ার অসাধারণ কনসেনট্রেশান পড়াশোনায়, সোরবোনে একা মেয়েটির সাধনা, ফার্স্ট হওয়া। দুজনেরই খুব মনে লেগেছে।

বৌদির ভয় দেখে দেখে ভাবতাম কী করে কাটাবে সারা জীবনটা। কী করে যে কাটাবে জানি না। কোথাও তো একবার থেমে ওকে ভাবতে হবে যে কিসের ভয়!

আজ একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল। কাল ভোরে চলে যাব, আর কোনদিনই দেখা হবে না এই মহিলার সঙ্গে। উনি তো ওঁর নিজের মত করে আমাকে ভালোবেসেছেন, নিজের একটা মিথ্যে পরিচয়কেই স্থায়ী করে রেখে যেতে ইচ্ছে করছিল না। অনেকবার ভাবলাম, কী করি, যদি সত্যি কথাটা বলি উনি ভয়ে কোলাপ্স করে যেতে পারেন কিন্তু কাউকে বলে ফেলে পুলিস পর্যন্ত খবর দেবেন কি? আমি মনে

মনে জানি দেবেন না। আমার সম্পর্কে সব ভালোবাসা যদি এক নিমেষে উড়েও যায়, বোসদার নিরাপত্তার ব্যাপার আছে। তাছাড়া, নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে এত কাণ্ড বৌদি করতেও পারবেন না। বিকেলে বৌদি আসতে যখন বললাম কাল ভোরে চলে যাব আমি, বৌদির মুখটা যেন কিরকম হয়ে গেল। বিশ্বাসই করছেনা যেন। প্রথমে বলল,

—তোমার শরীর তো সারেনি এখনও, এই তো হাতের নখ কিরকম সাদা—

তারপর খানিকটা অসহায়ের মত,

—কালই চলে যাবে? আমায় তো বলোনি আগে—

তখন বললাম কেন বলতে পারিনা আগে থেকে। বললাম কে আমি, কিসের জন্য ঘরবাড়ি ছেড়ে এসেছি। অদ্ভুত! বৌদি ভয় পেল না। কেবল একবার জিজ্ঞেস করল,

—আর ঐ যাঁকে বলো তোমার স্বামী উনিও কি সত্যি স্বামী নন?

—না না ওটা সত্যি।

বৌদি আমাকে জড়িয়ে ধরে রইল শক্ত করে। অনেকক্ষণ পরে বলল,

—এমন সাংঘাতিক রাস্তায় পা দিয়েছ, ভয় করে না?

—যারা ঘরে লক্ষ্মী হয়ে থাকে তাদেরও তো ভয় করে বৌদি। বরং একবার ভয়ের সামনাসামনি হলে ভয় কেটে যায়।

—হ্যাঁ। মরার তো ভয় নেই, লোকে বলে—

বৌদি এতদিনে কখনো আমার এতখানি কাছে আসেনি। আস্তে আস্তে চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। পিঠে হাত বোলাচ্ছে। আলো কমে এসেছে ঘরের মধ্যে। হঠাৎ বলল,

—আগে কেন আমাকে বললে না? দু-একদিন যত্ন করে একটু রেঁধে খাওয়াতাম—

সেন্টুবৌদির চোখ দিয়ে জল পড়ছে। হঠাৎ পিঠ ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসে বলছে,

—কোন বিপদ হবেনা তোমাদের, দেখো তোমরা জিতবেই—

—বৌদি, অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে যে—

—হ্যাঁ যাই—

আবার আমার মুখে মাথায় খানিকটা হাত বুলিয়ে চলে গেল।

মিনিট পনের পরে ঘন অন্ধকারে বাগানের গেটে শব্দ পেয়ে ভাবি ঝরি এসেছে, রাত্রের রান্না করতে।

—বৌদি। এই অন্ধকারে একা!

—হ্যাঁ, ভাই। তোমার বৌদির তো আর কিছু নেই না হলে তোমাকে আমার কতো কিছু যে দিতে ইচ্ছে করছে—আঁচলের তলা থেকে একটা শাড়ি বার করে

বৌদি।

—বৌদি!

এটা তোমাকে নিতেই হবে, এটা আমার পুজোর শাড়ি—আমার বাপের বাড়ির দেওয়া

—কিন্তু এ আমি পরব কোথায়? আর আপনার এত শখের শাড়ি—

—তুমি কাল না হয় পরে যেও। আমার বড্ডো ভালো লাগবে যে আমি যেমন হতে পারিনি একজন তেমনটি হয়েছে। এই শাড়িটা তোমার কাছে থাকলে মনে হবে আমিও একটু একটু তোমার কাছে আছি।

আমারও গলা ধরে আসে এবার। বৌদির শীর্ণ চেহারাটা যেন হঠাৎ দপ্‌দপ করে,

—এবার থেকে যেখানে নকশালদের খবর শুনবো জানবো তোমারই আছো। দেখো তোমরা ঠিক জিতবে, তোমরা তো ভাই নিজেদের জন্য কিছু চাওনা—

এই একমাসে অনেক বার যাতায়াতে দুই বাড়ির মাঝের যে পায়ে চলা পথটা বেশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল সেটা দিয়ে সেন্টুবৌদিকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এক্ষুণি ফিরে এলাম। কাল প্রথম বাসটা ধরব। ঝরি বলেছে তুলে দেবে।

কালধ্বনি

সহযাত্রিণী

দোলার হলঘর থেকে বেরিয়ে আমরা কাছের সিঁড়িটা দিয়ে নামবার বদলে লম্বা বারান্দা ধরে এগিয়ে যাই। ওদিকে অনেকেরই দরকার ছিল তিনঘণ্টার মিটিংয়ের পর। এ ওর হাতে ব্যাগ ধরিয়ে দিয়ে, ঘুরে আসবার পরে এ পাশের সিঁড়ি দিয়ে নামি। বৈদেহী আর সারা দুজনেই রয়েছে দঙ্গলটায়। আজ এতক্ষণ ওদেরই কথা শুনলাম আমরা মুগ্ধ হলাম। কিভাবে লেখিকা হয়ে উঠল সেই কথা। বৈদেহীর লেখা আমি আগে পড়েছি। কি করে যেন আমার ধারণা হয়েছিল ও জনপ্রিয় লেখিকা শিবানীর মেয়ে। খুব ভালো গল্প লেখে—গ্রাম কি মফঃস্বলে মধ্যবিত্ত সংসারের আশপাশে যে মানুষগুলো থাকে তারাই ওর বিষয়। ছোটবেলা থেকে তাদের কাছাকাছি বড় হয়ে উঠে, নিজের সচেতনার জায়গা থেকে ও তাদের দেখেছে বুঝেছে। ফলে খুব অন্যরকম মাধুর্য আর জোর আছে বৈদেহীর লেখায়। কথা বলবার সময়ে দুজনেই বেশ লাজুক সারাও, বৈদেহীও। সারা আব্বুর তামিল মুসলিম মেয়ে, যদিও মালয়ালি ভাষাতেই বেশি লেখে। শান্ত, আস্তে আস্তে কথা বলে। কিন্তু মানুষের জীবনের ওপর ধর্মের নিষ্ঠুর মারকে বিষয় করে যেসব গল্প উপন্যাস ও লিখেছে, তারজন্য আশপাশে যে ঝড় তুফান সহ্য করেছে, সে সব কথা শুনে আমাদেরই যেন ভয় করছিল। ও গল্প পড়তে গিয়েছিল, সেই হল ঘিরে ফেলে আগুন লাগিয়ে দেয় ওর নিজেরই সমাজের পুরুষ মানুষরা, এত তাদের রাগ ছিল ওর ওপর। আর এমন মিটিমিটি হেসে আজ সারা বলছিল সেই ঘটনাটার কথা—একটু গোলমাল হল বলে গল্প পড়া হল না—পরে সেই একটু গোলমাল এর নিহিতার্থ শুনে সবাই থ। কিন্তু এখন এই দল বেঁধে সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময়ে আমরা সে সব জ্বালাপোড়ার কথা বলছিলাম না। নানা রকম হাসাহাসি হচ্ছিল। ইনস্টিট্যুটের একতলায় যে দু চারটি ছেলেমেয়ে তারা কে জানে কী ভাবছিল আমাদের দেখে। ওরা আমাদের ছেলেমেয়েদের বয়সী প্রায়। ওরা কি জানে কীরকম লাগছে আমাদের? ভারতের মহিলা লেখকরা তিনদিনের কনফারেন্স জড়ো হয়েছেন—খবর হিসেবে সেটা এই ছেলেমেয়েরা জানে, এই রিসার্চ স্কলারদের মধ্যে কেই কেই তো ভলান্টিয়ারের কাজও করছে দোতলায়। ঝড়ের বেগে নোট নিচ্ছে। রিসেপশান ডেস্কে বসে রেজিস্ট্রেশান করাচ্ছে। ফাইল পেন কাগজ এগিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু কতো কতো বছর নিজেদের ঘর সংসারের মধ্যে, ঘর সংসারের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে কোনমতে একটু জায়গা করে কলম চালানোর পর এভাবে জড়ো হওয়া, এত দূরে

দূরে থাকা অথচ এত বেশি একরকম আপনজনদের দেখা, তিনচারদিন এদের সঙ্গে বাস করা, এযে কী অদ্ভুত অনুভব তা কি ওই তরুণ ছেলেমেয়েরা বুঝতে পারবে!

আমাদের মধ্যেও কমবয়সিরা আছে। মানে এই এদের মত কমবয়সি নয়, হয়ত চল্লিশের আশপাশে বয়েস। আমাদের চেয়ে যাঁরা অনেকখানি বড়, যেমন কৃষ্ণা সোবতী, কুঁৎউলঐনা হায়দরা, মহাশ্বেতা দেবীতাঁরাও ছিলেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। কিন্তু সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি বোধ হয় আমরা, যারা পঞ্চাশের আশপাশে। নিজের কাজের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পেতে মেয়েদের প্রায়ই এতটাই সময় দরকার হয়, পুরুষ সাহিত্যিকদের মত পঁয়ত্রিশে বিখ্যাত হওয়া কেন আমাদের সম্ভব হয় না-এসব কথা এই কদিনের আলোচনার মধ্যে বারবার এসে পড়ছে।

কথা বলতে বলতে বাগান, রাস্তা পেরিয়ে খাবার হলের সামনে এসে পড়েছি সকলে। খাবার টেবিলে সাজানো রয়েছে, যে যার নিজের দরকার কি পছন্দমত তুলে নিচ্ছে। এপাশ ওপাশ চেয়ার বেঞ্চি খুঁজে অনেকেই বসেছে, কেউ কেউ আবার বসাজনের সঙ্গে কথা বলবার জন্য সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খাওয়া শেষ করছে। আমার ঠাকুমাকে আমি যখন মনে করতে পারি তখন ঠাকুমার বয়স চুয়ান্ন। তার আগেকার কিছু কিছু স্মৃতি হয়ত আছে, সেগুলো অসংলগ্ন ভাঙা ভাঙা। আমি ঘরের মধ্যে ছুটছি, ঠাকুমা আমার পেছন পেছন ঘুরে ধরবার চেষ্টা করছে। ঠাকুমা বলত 'এইটুকু খেয়ে নাও, বিকেলে টিয়াপাখি দেখাব।' সেই লোভে ভাত খেয়ে নিতাম। বিকেলে কোন কোন দিন ঠাকুমার কোলে করে পাড়ার খুকুমণিদের বাড়ি যেতাম, ওদের বাড়িতে খাঁচায় টিয়াপাখি ছিল। কেমন লাল টুকটুকে ঠোঁট, ঘাড় বাঁকিয়ে আমার দিকে তাকাত। এরকম কিছু টুকরো স্মৃতি । কিন্তু যখন থেকে স্পষ্টভাবে মনে পড়ে দিদুকে, আমি হিসেব করে দেখেছি তখন দিদুর বয়স ছিল চুয়ান্ন। হাতে কাচা থান পরা, শুকনো ছোট চেহারা, মাথার চুল খুব ছোট ছোট করে ছাঁটা রবারের চটি পায়ে একজন জড়োসড়ো বুড়ি মানুষ। মাত্র চুয়ান্ন!

লাঞ্চের পর ফাইলপত্র গুছিয়ে নিয়ে আমরা আবার হলের দিকে যাচ্ছি। আড়াইটে থেকে পাঁচটা আলোচনা হবে মেয়েরা নিজেরা নিজেদের লেখার ওপর কি ধরনের সেন্সার বসায় সেই বিষয়ে। লেখা এমনকি কাগজে পাতবারও আগে নিজেরাই নিজেদের ওপর কতোরকম নিষেধ জারি করে। একজনের পর একজন উঠে বলছেন নিজেদের সেইসব অজাত লেখাদের হত্যা করতে হাওয়ার বেদনার কথা। প্রেমের গল্প কবিতা লিখতে ভয়, বিবাহ বহির্ভূত প্রেমের কথা লেখা খুবই বিপজ্জনক। একজন লেখক যদি খুনির জবানিতে গোয়েন্দা গল্প লেখেন, কেউ তার নামে থানায় ডায়েরি করবার কথা ভাবে না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কি শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় পরকীয়া প্রেম এমনকি শয্যাবিলাসের গল্প লিখলেও তাঁদের নৈতিক চরিত্র বিষয়ে সাধারণ ভাবে কোন প্রশ্ন উঠবে না, লোকে মনে রাখবে— এসব কাহিনী। কিন্তু প্রেমের কবিতা লেখার দায়ে তরুণী কবি মন্দাক্রান্তাকে

জবাব দিতে হবে বাবার কোন বন্ধুটিকে ও 'শহিদমিনারের চুড়োয় দাঁড়িয়ে চুমু খেতে চায়। হিমাচল প্রদেশের উদয়ী দার্জিলিংয়ের নিমা মালয়ালীর চিরতাম্মা হিন্দির লেখিকারা একের পর একজন বলেছেন এক্সট্রাম্যারিটাল প্রেমের কথা নিয়ে গল্প উপন্যাস তাঁরা কেউ লেখেন না কেন না তাতে সবাই মনে করবে ওঁরা ওইসব সমর্থন করেন। দু-একজন মনে করেন অবৈধ প্রেম পরকীয়া প্রেম নিয়ে লেখা তাঁদের উচিতই নয়। শুধু যে প্রেম নিয়ে লেখার সমস্যা এমন নয়। মহারাষ্ট্রের চন্দ্রমা বললেন তিনি জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন আহমদাবাদে। একটি সুতো কারখানা ও তার শ্রমিকদের জীবন নিয়ে তিনি একটা বড় উপন্যাস লেখেন, তাতে ওই কারখানার আভ্যন্তরীণ সংকট, সেই প্রসঙ্গে রাজ্যের রাজনৈতিক সুতো টানাটানি, অর্থনৈতিক সমস্যা—সবই এসে পড়ছিল। চন্দ্রমা মারাঠী ভাষায় জনপ্রিয় লেখিকাদের একজন, তবু এই উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করবার সময়ে পত্রিকা সম্পাদক বলেছিলেন এরকম পুরুষালি বিষয় নিয়ে তাঁর লেখা পাঠক হয়ত পছন্দ করবে না, তারা মেয়েদের কাছ থেকে ঘর সংসারের গল্পই শুনতে চায়। অন্য অনেকের, এমনকি আমাদের বাঙালি লেখিকাদের কথাতেও আবার সেই ঘর সংসারের কথা বলবার সমস্যা। নিজস্ব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতার কথাই তো বলবে একজন গল্প কি উপন্যাস লেখক—কিন্তু মেয়েদের লেখায় তাদের নিজেদের কিংবা পরিজনদের জীবনের দুঃখ লাঞ্ছনা অসম্মানের কথা প্রকাশ পেলে স্বামী পরিবার সমাজ এমনকি ছেলে মেয়েরাও অসন্তুষ্ট, তাতে পারিবারিক সম্মান নষ্ট হয়। এতোসব বাঁধা-বাঁধনের কথা মাথায় রাখতে রাখতে ক্রমশ মেয়েদের লেখার ধার কমে যায়। সীমা গুটিয়ে আসে। তারপর ওই থাকাটাই অভ্যাস হয়ে যায়। দু একজন নিশ্চয়ই সে সীমা ভেঙে অগ্নিমূল্যে নিজেদের স্বাত্যন্ত্র পেয়েছেন, কিন্তু তারা দু একজনই। বাকিরা ধরেই নেন যে তাঁরা পারবেন না।

একবার আমার আর রণির একসঙ্গে টাইফয়েড হয়েছিল। ঠাকুমা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে আমাদের কপালে জলপট্টি দিত, না হলে হাতপাখা দিয়ে মাথায় বাতাস করতে থাকত। ঘরে পাখা না চললে করত, চললেও করত। মা দুজনকে স্পঞ্জ করাতে হাঁপিয়ে যেত। একদিন ঠাকুমা বলেছিল,

দাও ললিতা, পিউকে আমি করিয়ে দিই।

মা কোন উত্তর দেয়নি। দ্বিতীয়বার বলায় ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল,

আপনি কি এসব পারবেন নাকি? স্পঞ্জ করানোর নিয়ম আছে। কাজের মাঝখানে পঞ্চাশবার অকাজের ঘ্যানঘ্যান। আমি মরছি নিজের জ্বালায়।

মায়ের জ্বালা আমরা জানতাম। বাবা সংসারের দিকে কোন খেয়াল করতেন না। সকাল নটায় খেয়ে দেয়ে অফিস যেতেন, রাত্রি সাড়ে নটায় ফিরতেন। মা সংসারের যা কিছু দোকানবাজার করে আনতে বলত, আনতেন না। এমনকি আমাদের অসুখের

সময়ে ওষুধ, ফল—তাও হয় ভুলে যেতেন না হলে দেরিতে দোকান বন্ধ হয়ে যেত। মায়ের ঝামেলা বাড়ত। দুশ্চিন্তা বাড়ত।

রণি যখন খুব ছোট তখন দিদুই গামলায় জল নিয়ে ওকে স্নান করাতো। রণি কিরকম নড়বড় করত, দিদু এক হাতের ওপর ওকে রেখে তোয়ালেতে মোছাত। আমি যখন জন্মেছিলাম আমাকেও তো দিদুই স্নান করাত। স্পঞ্জ করানো কি তার চেয়ে কঠিন? আমি যে দিদুর গায়েগায়ে থাকতে বেশি ভালোবাসি সেটা মা একদম পছন্দ করত না। যখন প্রথম আমাদের টাইফয়েড ধরা পড়ল তখনও খুব চেঁচামিচি অশান্তি করেছিল,

নিশ্চয়ই ওঘর থেকে জল খেয়েছে। পিউ তো শিক্ষা পেয়ে পেয়ে এমন হয়েছে যে আমার কথা গ্রাহ্যই করে না। ওঘর মানে দিদুর ঘর। আমরা সবাই এ্যাকোয়াগার্ডের জল খাই, দিদু খায় না। দিদু বলত, বাসি কাপড় এঁটো কাপড়ে এঁটো হাতে ছোঁয়া। কিন্তু দিদু আমাদের জল না খেলে কি হবে আমি তো সত্যিই দিদুর ঘরের মাটির কলসি থেকে জল খেতাম। ছুঁতাম না, দিদুই ঢেলে দিত। আর আমি খাব বলে দিদু প্রত্যেক দিন জল ফুটিয়ে কাপড় দিয়ে ছেঁকে কলসিতে ভরে রাখত। জলে কর্পূর আর তুলসিপাতার গন্ধ। সে জল খেয়ে যদি আমার টাইফয়েড হয়ে থাকে রণির কেন হল? রণি তো দিদুর জল খেত না। আমরা দুজনেই স্কুলের কল থেকে জল খেতাম। মাঝে মাঝে কোনদিন। আসল জল খেতাম কম, কলের মুখটা বুড়ো আঙুলে টিপে ধরে চিঁ করে জল ছেটাতাম বেশি। মা বলেই যাচ্ছিল,

উনি তো চান পিউয়ের অসুখ হোক। স্কুলে না গিয়ে ওঁর চোখের সামনে ঘরে শুয়ে থাকুক। মা এরকম কথা সব সময়ই বলত। আর এইসব সময় দিদুর মুখটা এমন হয়ে যেত যে আমার কান্না পেত। তবু আমার সাহস হয়নি যে স্কুলে জল খাওয়ার কথাটা মাকে বলব। বড্ড ভয় করত, মা এমন রেগে রেগে কথা বলবে। আমি জানতাম খুব মনে কষ্ট হলে দিদু নিজের ঠাকুরের আসনের সামনে বসে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকবে, চোখ দিয়ে একটানা জল গড়িয়ে গাল বেয়ে থুতনি, কাপড়ের বুকের ওপর পড়বে। সরু কালো মালাটা আস্তে আস্তে গলার কাছে একটু একটু নড়ে উঠবে। কোন কোন দিন বিকেল অবধি অমনি করে বসে থাকবে। উঠবেও না খাবেও না।

আসমা অফসাদ এসেছেন কাশ্মীর থেকে। বয়স হয়েছে, একটু ভারী চেহারা। বলছিলেন লেখা কি কঠিন হয়ে উঠেছে স্বর্গ উপত্যকায় বসে। যতো বাড়ছে উগ্রপন্থী আর মিলিটারিদের অত্যাচার, আসমা বলছিলেন, আর মিলিটারিদের অত্যাচার, আসমা বলছিলেন, ইন্ডিয়ান মিলিটারি—তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মেয়েদের পরাধীনতা। মৌলবাদী ধর্মগুরুদের ধমক। এমনিতেই কমবয়সি মেয়ে বৌরা মিলিটারিদের ধর্ষণের আতঙ্কে থাকে তার মধ্যে আবার মাঝে মাঝে মৌলবাদীদের ফতোয়া মেয়েরা কপালে টিপ পরবেনা, লাল টিপ পরা চলবে না, ওটা হিন্দুরা পরে,

মেয়েরা বয়েজ কাট করে চুল ছাঁটবে না। এক সময়ে এতদূর হল যে বোরখা ছাড়া পথে বোরোলে মুখে এ্যাসিড ঢেলে দেবার ভয় দেখিয়ে ছিল এইসব ধর্মান্ধ উগ্রপন্থীরা। আসমার নাতনি শ্রীনগর গার্লস কলেজের পাণ্ডা। মেয়েরা দল বেঁধে বে-নকাব কলেজের রাস্তায় বোরোল আর জনা তিনেক উৎসাহী এ্যাসিডবাজ মোটরবাইক যুবককে রাস্তায় তাড়া করে প্রায় এক কিলোমিটার নিয়ে গেল। কিন্তু শেষ অবধি কলেজ ছেড়ে ঘরে বসে আছে সে ছাত্রী, কলেজ বন্ধ। এই অবস্থার মধ্যে সব পক্ষ বাঁচিয়ে গোলগোল প্রেমের কি প্রকৃতি প্রেমের গল্প লিখতে হবে তাঁদের। আসমার ছেলে-বৌ থাকে বম্বেতে, ব্যবসা আছে সেখানে। তারা মাঝে মাঝে আসে, দুচার দিনে ফিরেও যায়। শ্রীনগরে আসমা একা থাকেন নাতনিকে নিয়ে, সে ঠাকুরমাকে ছেড়ে থাকতে পারেনা। ওঁর গল্পে থাকে কাশ্মীরের মানুষদের সঙ্গে অ-কাশ্মীরের সম্পর্ক, প্রতিদিনকার যুদ্ধ পরিস্থিতির কথা। ওঁর একটা ছোটগল্পের অনুবাদ শুনে আজকের এই প্রোগ্রাম শেষ হল।

এরপর যারযার ইচ্ছেমত কিছুটা ঘোরাঘুরি, শহর কি চারমিনার দেখতে অথবা বাজারে সিল্ক আর মুক্তো কিনতে যাওয়া, ফাঁকা সময়। রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর কারো ঘরে বসে আড্ডা মারার ছলে কিছু কবিতা পড়া হবে, অনুবাদসুদ্ধ। যার যার ইচ্ছে আসবে। এরকম খোলাখুলি, কে কি ভাববে সেই ভার মনে রাখা ছাড়াই এমন ভাবে নিজেদের কথা বলতে পারার আনন্দ আমরা ভারি উপভোগ করছি, অনেকেই বহুদিন ধরে লিখলেও জীবনে এই প্রথমবার এসব কথা স্পষ্ট করে ভাবছে, এই প্রথম নিজেদের লেখা নিয়ে, লেখার সমস্যা বা আনন্দ নিয়ে, কথা বলছে এমন মানুষদের সঙ্গে যারা বুঝতে পারে। বারে বারে ভাবছি সুলেখা সান্যাল, সাবিত্রী রায়ের কথা। এমন করে কথা বলতে পারলে হয়ত আরও অনেকদিন বাঁচতেন ওঁরা, ধিকিধিকি পুড়ে মরতেন না।

হিসেব এখানেও আছে, জানাই কথা। কিন্তু সেই দিকে আমরা ইচ্ছে করেই লক্ষ করছি না। এমন মুক্তিতে এসেও যারা পচা পুরোন সিঁড়ি ওঠার অভ্যেস করে চলেছে তারা এমন কহি বা বেশি পাবে!

যে ইনস্টিট্যুটে আমরা আছি তার একটু বাইরে একটা পিপুল গাছের নিচে বিরাট পাথরের ওপরে বসে সূর্যাস্ত দেখছিলাম আমি আর অসমের মীরা বরগোহাই। আমার গলার মালাটায় আঙুল ছুঁইয়ে ও জিজ্ঞেস করে,

আপনি কি বৈষ্ণব?

না।

তবে যে এই তুলসী কাঠের মালা পরেছেন?

দেখতে সুন্দর লাগে। আমি তো কাঠের মাটির সুতোর গয়না পরতে ভালোবাসি।

আলো ডুবে যায়। আমরা আস্তে আস্তে হেঁটে ক্যাম্পাসের দিকে ফিরি। মীরা বলে ওর ঠাকুমা এরকম মালা পরেন। ওদের ওখানে বয়স্ক মানুষরা অনেকেই পরেন।

তাঁরা বৈষ্ণব। তুলসি গাছ তাঁদের দেবতা প্রিয় বলে তাঁরা সেই গাছের কাঠে তৈরি সরু সরু পুঁতির সেই মালা পরেন। আমি বলি আমাদের ওখানেও অনেকে পরতেন আগে। এখন বিশেষ দেখা যায় না।

দিদুর ওই ঠাকুরের কাজ করা, এটোকাটা ছোঁয়াছানি নিয়েও মা খুব বিরক্ত হত। আমাদের বাড়িটা ছড়ানো মত ছিল। অনেক বড় উঠোন বাগান কিন্তু ঘর মোটে তিনটে। তার একটা পুরো ঘর নিয়ে দিদু থাকতেন তা নিয়ে মায়ের গজগজানির শেষ ছিল না।

একটু নিজের ইচ্ছেমত করে একটা বসার ঘর সাজাব সে হবার উপায় নেই।—দিদুর হবার উপায় নেই।—দিদুর বাকি ছেলেরা ওঁকে নিয়ে কাছে রাখতেন না, কখনোসখনো এসে দেখা করে যেতেন। সবাই বলতেন—মায়ের যে বড্ডো আচার বিচার।

কিন্তু ছত্রিশ বছর বয়সে বিধবা দিদু যখন আচার বিচার শুরু করেছিলেন তখন কি ওঁকে কেউ বুঝিয়ে বলেছিল ওসব করলে কতো ঝামেলা? পাড়ায় অন্যরা বরং দিদুর খুব নাম করতেন খুব নিয়মনিষ্ঠে বলে। দিদুর বিধবা হবার সময়ে আবার বড়দিদু, মানে দাদুর মা-ও বেঁচেছিলেন। বড়দিদুকে আমারও মনে আছে একটু একটু। তো দিদু ওই শিখেছিল—উপোস আর ছোঁয়াছুঁয়ি আর ঠাকুর। কিন্তু দিদু তো কোনদিন কাউকে বকতো না, রাগ করত না, বরং সকলকে ভালোবাসত। ছুঁতো না, তবু। আমার যতোদিন শরীর খারাপ না হয়েছে ততোদিন পর্যন্ত তো রাত্রে ভালো করে হাত পা ধুয়ে, জামাকাপড় ছেড়ে আমি রাত্রে দিদুর কাছেই ঘুমোতাম। শীতে বর্ষায় বেলাশেষে দিদু নিরামিষ রান্নার বাসন মাজত বসে বসে। বাড়ির সকলের ডাল তরকারিই তো দিদুর ঘরে হত, মা করত কেবল ভাত আর মাছ। এমনকি একাদশীর দিনও দিদু রান্না বন্ধ করত না। বাবা-কাকা অফিস যাওয়ার আগে মা কেবল ভাত রেঁধে দিত। তাছাড়া আমি রণি মা। মা জোরে জোরে বলত,

উনি কারো ছোঁয়া বাসন নেবেন না। তাহলে নিজে না মেজে কি করবেন?

কথাটা সত্যি ছিল না। অনেক পরেও যখন বাইরে থেকে বাড়ি এসেছি আমি দিদুর কাছেই খেতাম। খেয়ে নিয়ে দিদুর বাসন ধুয়ে দিতাম। মা কেন বাবা কিংবা কাকা কোন একটা ছুটির দিনে কখনও ওইটুকু করেনি। করবার কথা ভাবেওনি কোনদিন। অনেক বয়েস হয়ে গিয়েছিল, চোখে দেখতে পেত না, সব দাঁত পড়ে গিয়েছিল—কারো কোনদিন মনে হয়নি একবার ডাক্তার দেখানোর কথা। আমারও হয়নি। অনেকদিন পরে পরে আসতাম, কাছে বসে গল্প করে আদরটুকু নিতাম। কেবল ভালোবাসা ছাড়া কোন যত্ন নেবার কথা ভাবিনি কখনও।

বড়কাকা কাকিমা একবার কনডাকটেড ট্যুরে প্রয়াগ কাশী মথুরা বৃন্দাবন আরও অনেক কী সব জায়গা ঘুরে এসেছিলেন। কাকিমা দিদুর জন্য 'মধু বৃন্দাবন' লেখা একটা এইটুকু পিতলের রেকাবি এনেছিলেন। সেইটে হাতে নিয়েও দিদুর চোখ দিয়ে

জল পড়েছিল,

লক্ষ্মী মা, তুমি মনে করে আমার জন্য আনলে? ওঁরা চলে যেতে মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিল,

সাতজন্মে খবর নেয় না, পাঁচসিকে দামের একটা জিনিস এনেছে তাইতো কতো আদিখ্যেতা। যে সারা বছর খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে তার জন্য মুখে একটা ভালোকথা কোনদিন কথা শুনিনা—

রাগ যেখানে হওয়ার কথা সেখানে মা কোনদিন জোর দিয়ে কিছু বলত না। নরম মাটি পাওয়া বেড়ালের মত দিদুকে আঁচড়ে ফালাফালা করত। মা কি নিজের রাগ বিরক্তিকে বুঝত না নাকি চিনতে চাইত না?

অনেক রাত পর্যন্ত কবিতা পড়া হল। শিলং থেকে আসা তেমসুলা আওয়ের কবিতাগুলো আমাদের স্তব্ধ করে দিয়েছিল। নাগা মহিলা। ওঁর জন্মস্থান, ওঁদের দেশ মোকক্‌চঙ বলে ছোট শহর ধ্বংস হয়ে গিয়েছে উগ্রপন্থী আর মিলিটারির বুটের নিচে। অসমের মনোরমা চাংক্রিতা। বৈদেহীও কবিতা পড়ল। প্রেমের কবিতাও পড়া হল। যে সব কবিতা এতকাল ধরে আমাদের উদ্দেশ্য করে লেখা হয়ে এসেছে তা থেকে শরীর বর্ণনা ছেঁকে নিলে কতোটা প্রেম অবশিষ্ট থাকে আর—কথা হল যেসব নিয়ে। প্রেম তো সব সময়ে পুরোন সব সময়ে নতুন। সেরকম কবিতাও—পুরোন আর নতুন। একসঙ্গে এতখানি সুন্দর সময় কাটানোর ফুর্তিতে আমরাও নিজেরা পান করেছি ঈষৎ । রাত্রি প্রায় একটার সময়ে ঘরে যাবার জন্য বাইরে বাগানে বেরোতে অদ্ভুত ফুলের গন্ধ ভরা অন্ধকার সব উচ্চারিত শব্দের শেষ। আজ আমাদের এখানে শেষরাত্রি। এই কুড়ি পঁচিশ গজ হেঁটে যেতে গাছের মাথায় মাথায় শিরশিরে বাতাসের কাঁপুনি।

ঘরের আলো নিভিয়ে পর্দা সরিয়ে দিতে বড়ো কাচের জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখা যায়। বেশি রাত্রে চাঁদ মাঝআকাশে উঠে এসেছে। সামনে ছড়ানো বাগান, তারপর রাস্তা, তার ওপারে বড়বড় গাছের জঙ্গলমত। আমি জানলার সামনে দাঁড়াই। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি। গলার তুলসিমালাটায় আস্তে আস্তে হাত বোলাই। গতবছর বইমেলায় অতিথি হয়ে গিয়ে নবদ্বীপ থেকে এটা কিনেছিলাম। আরও অনেকগুলো। কালো, হলুদ, সরু সরু কাঠির টুকরো গাঁথা। গঙ্গার ঘাটের কাছে পাশাপাশি অনেকগুলো দোকানে বিক্রি হচ্ছিল। আজ আমি নিজে গিয়ে ব্যাগ থেকে টাকা বার করে দিয়ে যতগুলো ইচ্ছে কিনতে পারি। তারপর নৌকো করে নবদ্বীপ থেকে গঙ্গার ওপর দিয়ে পারাপার করতে পারি। তবু দোকানদারের কাছে দাম জিজ্ঞেস করতে গিয়ে আমার গলা বুজে আসে, আঙুল দিয়ে দেখাতে হয়। আমার কাছে এই মালাটা দিদু, কিন্তু দিদুর কাছে এরকম একটা মালা যে কী সম্পদ ছিল তা কী আমি সত্যি বুঝতে পারব? বুঝতে হয়তো আমি চাইও না। একজন মানুষ নিজের সমস্ত ভালোবাসা সমস্ত কল্পনাশক্তি সব আবেগ নিয়ে কুড়ি পঁচিশ তিরিশ পঞ্চাশ বছর

কেবল একটা ঘরের মধ্যে কাটিয়ে যাবে, কয়েকটা কাচ বাঁধানো ছবি কটা কাঠের টুকরো পুঁতির মালা আর একগাদা অর্থহীন কৃচ্ছ্রসাধনের নিয়ম দিয়ে খরচ হবে একটা গোটা মানবজীবন—এর মানে আমাকে কেউ বোঝাতে পারবে না। শুধু সে কেন, যে সিঁদুর পরত আর সেই সিঁদুর পরার কারণে যে আঁশ নিরামিশ এঁটো কাটা মানতে পারত না সে কী নষ্ট হয়নি তার স্বামী ছেলেমেয়ের, নিজের ঘরের এইটুকুতে দম আটকে? এক এক ধাপ করে দাপট হারিয়ে অধিকারচ্যুত হয়ে তাকে নেমে আসতে হয়নি কুড়ি বছর পর তার নিজের সংসার থেকে? যে মা দিদুর সঙ্গে ওরকম রেগে কাঠকাঠ করে কথা বলত, সেই মাই আবার পরে দেখেছি রণির বৌ বুলার সামনে কীরকম থতমত হয়ে থাকত। ঠিক দিদুর মতই আস্তে আস্তে মা যেন সারা সংসারের কাজ করে রাখত, ওরা রণি বা বুলা কেবল নিজেদের সময়মত টেবিলে খেতে আসত, উঠে চলে যেত। এমনকী রণিও দিনের পর দিন মায়ের সঙ্গে বিনা দরকারে একটা কথাও বলত না। বরং মায়ের সঙ্গে দিদুর সম্পর্ক তার চেয়ে অনেক জ্যান্ত ছিল। রান্নাবাড়ি ছাড়াও সেই ঠাকুর আর বইপড়া, আমাদের সঙ্গে গান করে গল্প করে দিদুর একরকম নিজের জীবন ছিল। অথচ মা কেবল ওই রান্না-খাওয়া ঘর গোছানোকেই জীবনের সর্বস্ব বলে জানল। তার বাইরে মানুষের কতোরকম বেঁচে থাকা তাকে দেখতে চাইল না। ঠিক যেমন বুলবুল নিজের বাইরেটুকুকেও যেন একটা দেওয়াল দিয়ে শক্ত করে ঘিরে রেখেছে—সেই দরকারি পরিচিত ছকের বাইরে যা কিছু তাতে ওর কোন আগ্রহ নেই। অথচ বাইরে যাওয়া তো ছিল।

দিদু সকালে দুধ আনতে যেত। সন্ধ্যায় কোন কোনদিন পাড়ায় কীর্তন শুনতে যেত। খুব ছোটবেলায় আমার আঙুল ধরে নিয়ে যেত। একটু বড় হবার পর মা আর যেতে দিত না। তখন আমার পড়া। তখনও কীর্তন হত পাড়ায়। কুড়ি বছর পর মা মাসীমার বাড়ি যেত, পাড়ার অন্যান্য বাড়িও যেত। কিন্তু সে কি বাইরে যাওয়া? দিদু সেই অন্য বাইরের খবর জানত। অন্যদের কাছে শুনে এসে নিজে স্বপ্ন দেখত। আমাকেও দেখাত। দ্যাখো, পিউ, এই যে লাউগাছ ফুটল, এইটা কোথায় ছিল বল দেখি। মাটির মধ্যেও ছিল না, বীজের মধ্যেও না। তাহলে কি করে আসলো?

জানো পিউ, অমরনাথ তীর্থে যেতে হলে চারিদিকে শুধু বরফের পাহাড়। বরফের উপর দিয়েই হাঁটতে হয়, তারই মধ্যে নাকি ঘুমোতে হয়। কিংবা,

অনিমেষের ঠাকুমা রামেশ্বর দেখে এল। সেই যেখানে রাম সমুদ্রবন্ধন করেছিলেন। সেইখানে নাকি সমুদ্রের উপর দিয়ে ট্রেন যায়। সমুদ্র তো নীলাচলে আছে, তাতে নিমাই দেহ দেন—

পাহাড় দেখেনি বরফ দেখেনি সমুদ্র দেখেনি দিদু। কেবল স্বপ্ন দেখত। আমাকে দেখাত। এখন আমি আমার চোখের মধ্যে দিদুর চোখ ভরে নিই, আমার দেখায় দিদুর আকাঙ্ক্ষা যোগ করি।

হেলে পড়া চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলি, তুমি কোনোদিন খোলা জায়গা দ্যাখোনি।

শেষ বয়সে যখন আর কোমর সোজা করতে পারতো না, বসে বসে ঘষটে বারান্দা পর্যন্ত এসে উঠোনের রোদ্দুরের দিকে চেয়ে থাকতো লোভীর মত। যাদের তুমি জন্ম দিয়েছিলে আর যাদের সংসারে প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিলে তারা কেউ তোমার গুটিয়ে এতটুকু হয়ে যাওয়া শরীরকে আধঘণ্টার জন্যও ওই উষ্ণতায় পৌঁছে দিত না। তোমার হাড়ের ভিতর সময়ের শীত বসে যাচ্ছিল। কিন্তু তুমি জানতে না দাবি করতে হয়। তাই কারো সময় ছিল না। শতবার ছিঁড়ে যাওয়া তুলসি মালাটাকে গিঁট দিয়ে দিয়ে পরতে, চোখে দেখতে পেতে না বলে। একে ওকে সাধতে। দিদু, তোমাকে গলায় জড়িয়ে আমি এই মেয়েদের উৎসবে নিয়ে এসেছি তুমি দেখবে বলে। হাত বুলিয়ে আমি মালাটাকে আদর করি। বুকের মধ্যে থেকে গভীর কষ্টের মত, গভীর সুখের মত কী উঠে আসতে চায় আর অন্যান্য বারের মতই আমি আঙুলের নিচে আস্তে আস্তে পাই নারকেল তেলের গন্ধওলা পাতলা ছোটছোট চুলে টাকা মাথা। দিদু বিড়বিড় করে কী বলে আমি শুধু তার সুরটুকু বুঝতে পারি। আস্তে আস্তে আমার ভিতরে দিদু একটা পিলসুজ হয়ে যায়। তেলকালি মাখা একটা সুন্দর ভারী পিলসুজ। আমি প্রদীপটাকে আরও ঝকঝকে করে মাজবার চেষ্টা করতে থাকি।